প্রেমেন্দ্র মিত্রের

নানা রঙে বোনা

বিচিত্র
জীবন-কথা

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এম. ভট্টাচার্য, বি. কম্.
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৫৪

মুদ্রক :
মলয় ঘোষ
রঞ্জনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিন্যু
কলিকাতা-৭০০০৫৪

বীণা মিত্রের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

।। এক ।।

জীবনের প্রথম কান্না বুঝি কোনোদিন ভোলবার নয়। তার আলাদা বিশেষ দাম আছে, তাৎপর্যও।

না, প্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পৃথিবীর হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার জন্যে জৈব দেহের যে যান্ত্রিক আক্ষেপ, সে কান্নার কথা বলছি না।

সবে-জেগে-ওঠা চেতনায় জীবন ও সংসারের অতল বেদনা রহস্যের প্রথম স্বাদ পাওয়ার যে অসহায় কান্না তার কথা বলছি।

এ কান্না যখন কেঁদেছিলাম চার বছর বয়স তখন পূর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাস্তব জগতের কোনো ঘটনা কি মানুষও তার মূলে ছিল না।

আমার প্রথম কান্নার উৎস সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবনের সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে পরিচয়ের আগে কাল্পনিক একটি কাহিনীর হতাশ বেদনা আমার শিশু-বুক ভেঙে দিয়েছিল।

বয়স তখন বড় জোর হবে চার। গুরুজনের কাছে শুনেছি পড়াশুনাটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি শুরু করেছিলাম। তিন বছর না হতেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ। শুধু বাঙলাই নয়, হিন্দী আর ইংরেজিও পড়ানো হয়েছিল সাধারণ হিসেবে বেশ একটু অসময়ে। যার জন্যে বাঙলা, হিন্দী কি ইংরেজি তিনটে ভাষায়ই অক্ষর পরিচয়ের কথা আমার মনে নেই। লেখাপড়ার প্রথম স্মৃতি তিন ভাষাতেই টানা পড়ার বই নিয়ে। বাঙলায় বোধোদয়, হিন্দীতে বইটার নাম মনে না থাকলেও কাহিনীটা বাদশা আকবর সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণে আছে আর ইংরেজিতে মনে আছে প্যারিচরণের সে যুগের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ফার্স্ট বুকের গোড়ার পাতার 'ওয়ান মর্ন আই মেট অ্যা লেম ম্যান…' মুখস্থ বলার বাহাদুরী।

গুরুজনদের হুঁশিয়ারীর জন্যে এই ঈষৎ অকালপক্কতা অহঙ্কারের খোরাক না যোগালেও কিছু ক্ষতি করেছিল। বাঙলা দ্বিতীয় ভাগটা প্রায় অসাড়ে পড়ে শেষ করার দরুন বাঙলা বানান সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার দ্বিধা আমার বরাবর থেকে গেছে।

যথাসময়ের আগে পড়তে না শিখলে আমার জীবনের প্রথম দুঃখ হয়তো অত অকালে অমন নিষ্ঠুরভাবে পেতে হতো না।

পড়তে পারার উৎসাহে নির্বিচারে হাতের কাছে যা পাই তাই তখন পড়ি।

একটি বাঁধানো মোটা বই-এর প্রথম একটি লাইন পড়ে ফেলার পর বহুদিন পর্যন্ত মনে গাঁথা হয়েছিল। লাইনটি ছিল, কাহিনার প্রথমেই মুদ্রিত একটি আহ্বান—ও পি [illegible] ও প্রফুল্ল।

এ আহ্বান যে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনা দেবী চৌধুরাণীর তা বড় হয়ে অনেক মিলিয়ে দেখতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সুযোগ তার খুশি মতো পড়বার সব কিছুতেই এমনিভাবে কামড় দেবার মধ্যে সত্যিকারের ছোটদের জন্যে লেখা একটি বই আমার হাতে এসে গিয়েছিল। বইটির নাম অবশ্য তখন লক্ষ্য করে মনে রাখিনি। পরে খোঁজ নিয়ে যা জানবার জেনেছি।

গদ্যে পদ্যে বইটি দুভাগে ভাগ করা। গদ্যে সমুদ্রযাত্রায় জাহাজডুবি হওয়া এক পরিবারের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। বিদেশী গল্প থেকে নেওয়া। সেইটিই আগে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়েছি। আমার জীবনে সেই প্রথম বিশাল বিচিত্র পৃথিবীতে দুঃসাহসী অভিযানের উত্তেজনার স্বাদ পাওয়া।

এ কাহিনীটির নাম তখন থেকেই মনে গাঁথা হয়েছিল। পরে খুঁজে পেতে বার করতে হয়নি। নাম ছিল মাস্টারম্যান রেডি।

দ্বিতীয় লেখাটির নাম মনে ছিল না। যদি বা সে সময়ে লক্ষ্য করে থাকি চোখের জলেই সে স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যেতে দেরি হয়নি।

হ্যাঁ, এইটিই আমায় প্রথম আকুল কান্নায় কাঁদাবার লেখা। গদ্যে নয়, পদ্যে দুটি ছোট্ট ভাই আর বোনের কাহিনা। ভাইটি বড়। যে ছোট বোনটিকে সে নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করত একদিন মৃত্যু এসে তাকে কেড়ে নিয়ে যাবার পর কী নিদারুণ দুঃখ আর অনুশোচনায় বোনটির মূল্য সে বুঝল তাই হলো লেখাটির বিষয়।

ভাইটির দুঃখ তো লেখকই পদ্যে সাজিয়ে লিখে রেখেছেন! কিন্তু আমার দুঃখ বুঝি ভাষায় লিখেও কুলোবার নয়। দুঃখ তো শুধু নয়, সেই প্রথম অসীম হতাশার সঙ্গে পরিচয়। যার অদল বদল কিছুতে হবার নয়, সব প্রতিকারের চেষ্টার যা বাইরে, এমন পরিণাম যে জীবনে থাকতে পারে এইটুকু জানার বিহ্বল-করা হতাশাতেই আমার বুক তখন খালি হয়ে গেছে।

হতাশ কান্না আর অতল দুঃখের কী নিদারুণ যে একটা আকর্ষণ আছে তখনকার কথা ভাবলে বুঝতে পারি। ওই লেখাটি পড়তে পড়তে মা-ই বুঝি আমায় কাঁদতে দেখেছিলেন একদিন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে ও বই পড়তেই বারণ করে দিয়েছিলেন তারপর।

কিন্তু ও লেখা যে আমার না পড়লেই নয়।

সামনে দেখলে সবাই ব'কে বুঝিয়ে বইটাই হাত থেকে নিয়ে নেয় বলে কারুর সামনে আর তা পড়তাম না।

বইটি লুকিয়ে নিয়ে আমাদের কোয়ার্টারের বাইরে কিছু দূরের হাসপাতালের কাছে চলে যেতাম।

সেখানে সকলের চোখের আড়ালে লেখাটি পড়তাম আর গোপনে কাঁদতাম।

একদিন সেখানেও আমাদের বাড়ির চাকর লালজিয়াই বোধ হয় অশ্রুসিক্ত অবস্থায় আমায় দেখে ফেলল।

মা শুনে বইটি আমার হাত থেকে নিয়ে কোথায় যে রাখলেন জানি না। সে বই আর খুঁজে পাইনি। বই পড়ে লুকিয়ে কান্নার পালা আমায় ওইখানেই শেষ।

কিন্তু শেষ কি ঠিক?

বইটি আর হাতে পাইনি, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে একটু একলা হলেই দাদার একটু স্নেহ আদরের জন্যে কাতর ও তারই নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যে অবহেলায় ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাওয়া সেই ছোট্ট মেয়েটি এসে মনটা জুড়ে থাকত। আগেকার মতো হাপুস নয়নে হয়তো কাঁদতাম না কিন্তু বুকটা একেবারে যেন খালি হয়ে মনটা উদাস হয়ে যেত।

একলা হলেই এই অবস্থাটা বেশি হতো বলে সাবধান হবার কথা ভাবার বয়স তখনও হয়নি। আর সাবধান হবারও বুঝি উপায় ছিল না। সে একলা থাকারই দেশ।

শহরের নাম মির্জাপুর। তারই মধ্যে চারিদিকে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বহুবিস্তৃত রেলওয়ে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে দু তিনটি মাত্র ডাক্তার কম্পাউণ্ডারদের কোয়ার্টার। একটি আমার দাদামশাই ডা° রাধারমণ ঘোষের। তিনিই সে হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার।

তারের বেড়ায় ঘেরা সে বিরাট হসপিট্যাল কম্পাউণ্ড একটা আলাদা জগৎ। একদিকে তার শহরের প্রান্ত আর একদিকে রেল স্টেশনের এলাকা। শহরের সঙ্গে এ জগতের সম্পর্কটুকু আমার কাছে প্রায় অজানা। আমি শুধু জানতাম আমাদের বাড়ির চাকর লালজিয়া মাঝে মাঝে সেখানে তার বাসায় যায়। আমাদের বুড়ো দাই ভগন্তীর মা ও সেই তারের বেড়ার সীমানার বাইরের রাজ্য থেকে আমাদের বাড়ি এটা-সেটা নিতে আসে।

আমার কাছে শহর মানে মাঝে মাঝে দূরের রাস্তায় ছুটে-যাওয়া এক আধটা এক্কার চাকায় ওড়ানো ধুলোর মেঘ। আর কখনো কখনো দূর থেকে শোনা গোলাবি রেউড়ি-ওয়ালার ডাক।

অন্য দিকের স্টেশনের এলাকার আকর্ষণই আমার কাছে ছিল বেশি। সেখানে প্রায় ঘড়ি ধরে যাওয়া দিন রাত্রির কটি ট্রেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ মালগাড়ির সারির মন্থর একঘেয়েমি, দূর সিগন্যালের ওঠানামা। এইসব মিলে একটা দুর্বোধ অজানা রহস্যের রাজ্যের ইঙ্গিত আনতো আমার মনে।

দু-দিকের এই দু-রকম জগতের মাঝখানে তারের বেড়া ঘেরা আমাদের বিস্তৃত হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের নির্জনতায় আমি বেশ কিছুদিন একা একাই কাটিয়েছি।

তারের বেড়ার বাইরে যাওয়ার হুকুম ছিল না। সে হুকুম অমান্য করবার দরকারও কোনোদিন বোধ করিনি। নিরাপদ হলে বেড়া দেওয়া এলাকার মধ্যে যেমন খুশি ঘোরবার স্বাধীনতা যে ছিল তাই আমার যথেষ্ট।

সেই একা একা ঘোরার মধ্যে একটি ছোট্ট মানমুখী মেয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বহুবার আমার সাথী হয়েছে। তাকে ভুলতে পারিনি ভুলতে চাইওনি।

কিন্তু তবু একদিন সে স্মৃতির ওপর একটা আবরণ পড়ল। হাসপাতালের নতুন একজন কম্পাউণ্ডার বদলিতে এলেন। আর ওই তারের বেড়া ঘেরা আমার নিঃসঙ্গতার জগতে আমি দুজন বন্ধু পেলাম।

কত কিছুই তো মন থেকে মুছে গেছে, কত নাম, কত মুখ, কত মূল্যবান কথা। বিশেষ করে নামের ব্যাপারে আমার স্মৃতি বড় দুর্বল। চেহারা চরিত্র সবকিছু স্পষ্ট মনে করতে পারলেও অনেক বেশ কাছাকাছি আসা মানুষের নাম স্মৃতি থেকে একেবারে হারিয়ে যায়।

জীবনের প্রথম দুটি বন্ধুর নাম কিন্তু তা যায়নি। নাম দুটি ঠিক সাধারণ নয় বলেই হয়তো স্মৃতির এই ক্ষয়হীনতা। নাম দুটি হলো লজ্জ্ আর মুরাদ। দুজনে আমার দাদামশাই-এর কম্পাউণ্ডারের ছেলে মেয়ে। মুরাদ আমার চেয়ে কিছু ছোট, আর তার দিদি লজ্জ্ আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়।

জীবনে সামান্য কিছুও যে শেখায় তাকে নাকি গুরু মানতে হয়। সেদিক দিয়ে লজ্জ্কে আমার গুরু মানা উচিত। লজ্জই আমার প্রথম কল্পনার ব্যবহার আর মূল্য শিখিয়েছিল, দরদী দৃষ্টিতে না দেখলে যা মিথ্যে বলতে শেখানো বলে ভুল হতে পারে।

রাত্রের ঘুম আর পড়াশুনা খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু বাদে সারাক্ষণ আমরা তিনজন একসঙ্গেই কাটাতাম। মেয়ে হলেও লজ্জর ঘরকন্নার খেলায় রুচি ছিল না। তার মাথায় বুদ্ধিও আসত অদ্ভুত অদ্ভুত।

হাসপাতালের গায়েই ছিল আরেক দফা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান। উত্তরপ্রদেশের রুক্ষ শুখনো মাটির দেশে অনেক কষ্টে তাতে কুয়োর জল নালা করে

চালিয়ে ফলের আর ফুলের চাষ করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি। যতদূর মনে পড়ে দু-একটি প্রায় নিষ্ফলা ফলের গাছ ছাড়া কিছু জংলী গাছের ঝোপই সেখানে বেড়েছিল।

টেপারি খাবার লোভ দেখিয়ে একদিন লজ্জু ওই বাগানের ভেতর ঢোকার পরিকল্পনা করলে। এ জংলা বাগানে ঢোকা সম্বন্ধে আমাদের কোনো বাধা নিষেধ ছিল না; এ রকম একটা কুমতলব আমাদের মতো ওইটুকু বাচ্চাদের মাথায় যে আসতে পারে তা ভাবতে না পারার দরুনই সেরকম কোনো নিষেধ করবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেনি।

নিষেধ না থাকলেও টেপারির খোঁজে সে জংলা বাগানে যাবার বিশেষ উৎসাহ আমার ছিল না। আসল কারণ টেপারি নামক ফলটারই আমি ভক্ত নই, তাছাড়া ওই কাঁটা ঝোপের বাগানে টেপারি পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল।

লজ্জুর জেদে সে জংলা বাগানে কিন্তু ঢুকতে হয়েছিল। টেপারি পাওয়া যায়নি। তার বদলে বুনো ঝোপের কাঁটায় হাত পা একটু আধটু ছড়েছিল আর লজ্জুর পরনের প্রায় নতুন পাজামাটা বেড়ার তারের কাঁটায় বেশ খানিকটা গিয়েছিল ছিঁড়ে।

লজ্জুর চেয়ে আমিই ভয় পেয়েছিলাম বেশি তার বকুনি খাবার কথা ভেবে। কিন্তু প্রথমটা মুখটা একটু কাঁদো কাঁদো করার পরই লজ্জু একেবারে বেপরোয়া।

কি হবে কি!—সে তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল, আমি বলব একটা বাঁদর এসে ছিঁড়ে দিয়েছে।

বাঁদর ছিঁড়ে দিয়েছে!—আমি বোধহয় হতভম্ব হয়ে সমস্ত কম্পাউণ্ডটাই মুখ ঘুরিয়ে দেখেছিলাম। বাঁদর প্রাণীটি তখন আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে কোনোদিন তা দেখিনি।

বাঁদরের কথা বলার পর আরও জমকালো কৈফিয়ত লজ্জুর মাথায় এসেছিল। সে চোখ মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে উৎসাহভরে জানিয়েছিল যে সে এক দুষমন ডাকুর কথা বলবে যে তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। সে ডাকুকে আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে আসতে গিয়েই তো লজ্জুর পাজামা ছিঁড়ে গিয়েছে।

বাঁদর নয়, দুষমন ডাকু! সে ডাকু আবার ঘোড়ায় চড়ে লজ্জুকে চুরি করতে আসে! আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল নিশ্চয়।

তখনও বোম্বাই ফিল্মের যুগ শুরু হতে অনেক দেরি। লজ্জু কোথা থেকে এমন অদ্ভুত ভাবনার মসলা যে পেয়েছিল জানি না। সে প্রশ্নও মনে জাগেনি। আমি এক নতুন চোখে গভীর ভয় ভক্তি নিয়ে লজ্জুকে দেখেছিলাম এইটুকু স্পষ্ট করেই মনে আছে।

বিবরণটা ঠিক যে ভাবে যে ভাষায় দিলাম তা হয়তো পুরোপুরি যথাযথ নয়। ঘটনাটা ওই হলেও লজ্জ হয়তো একটু ভিন্নভাবে তার কাল্পনিক কৈফিয়ত সাজিয়েছিল। কিন্তু বাদর আর তার পরে ঘোড়সওয়ার দুষমন ডাকুর কথা যে তার মধ্যে ছিল এ বিষয়ে ভুল নেই। আমার ছেলেবেলার এক বিহ্বল বিস্ময়ই সে স্মৃতিকে এখনও অস্পষ্ট হতে দেয়নি।

স্মৃতি কী যে ধরে রাখে আর কী যে ফেলে দেয় তার রহস্য কিন্তু দুর্বোধ।

যে লজ্জ ও মুরাদের নাম ও তাদের সঙ্গে জড়ানো কটি ঘটনা মনের মধ্যে এমন আশ্চর্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাদের বিষয়ে স্মৃতির পরের সব পাতা কিন্তু একেবারে সাদা। কবে যে তারা আমার ভাবের বেড়ায় ঘেরা জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, কতদিন যে তারা আমার সঙ্গী ছিল কিছুই মনে করতে পারি না।

সাধারণ দুঃখ ব্যথা নয়, পদ্যে লেখা যে কাহিনী থেকে জীবনের প্রথম শোক পেয়েছিলাম, তীব্রতা অনেক ফিকে হয়ে এলেও মন থেকে তা মুছে যায়নি। বহুদিন বাদে প্রায় মধ্য যৌবনেও সেই কাহিনীর উৎসটি ঠিক মতো সন্ধান করবার আগ্রহ ছিল। তাতেই জেনেছিলাম যে মাস্টারমশাই-এর বেড়ীর সঙ্গে যুক্ত পদ্য গাথাটির নাম ছিল যতীন্দ্র যামিনী আর বইটির লেখক ছিলেন অমৃতলাল গুপ্ত।

লজ্জ মুরাদ কিন্তু শৈশব স্মৃতির একটা ঝিলিক মাত্র। আর কোনোদিন তাদের খোঁজ পাইনি।

আমার ভাবের বেড়া দেওয়া জগৎ আগেকার মতো অতি নির্জন আর থাকেনি চোখ কান ভালো সজাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিচিত্র স্মৃতি সেখানে জমা হতে শুরু করেছে। তার মধ্যে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা হাসপাতালের চত্বর থেকে আশপাশ ভোর না হতেই অসংখ্য মুমূর্ষু মৃতকে বয়ে আনা খাটিয়ার ভিড় একটি। শহর বা কাছাকাছি গ্রাম থেকে শুধু নয় পুরো দু-তিন দিনের রাস্তা ভেঙে এমন বহু মরা আধমরাকেই সেখানে আনা হতো।

এরা সবাই সর্পাঘাতের রোগী। উত্তরপ্রদেশের ও-অঞ্চলে সর্বত্র গ্রীষ্ম আর বর্ষায় গোখরো সাপের উপদ্রব চিরকালই অত্যন্ত বেশি। অসহ্য গরমে বাইরে খোলা মাঠে শুতে বাধ্য হওয়ার জন্যে এ দুর্ঘটনাটা অত বেশি ঘটে।

মিউ পুরের এই রেলওয়ে হাসপাতালে সাপে-কাটা রোগীর অত ভিড় হওয়ার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। কেমন করে জানিনা লোকের মুখে মুখে এই খবরটা ছড়িয়েছিল যে রেল হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের সাপের বিষের অব্যর্থ দাওয়াই আছে।

এ রকম একটা রটনা একেবারে অমূলক অবশ্য ছিল না। বৈজ্ঞানিক সত্য-মিথ্যার বিচার বাদ দিয়ে দেখা ও শোনায় মিলে স্মৃতিতে যা আছে তাই শুধু জানাতে পারি। বাবু (দাদামশাইকে আমি বাবুই বলতাম) সত্যিই সাপের বিষ দূর করবার জন্যে একটি বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করতেন। ওষুধটি একটি অজানা উদ্ভিদের শিকড়। এই শিকড় ঘষা একটু আলজিভে ঠেকিয়ে আর ক্ষতস্থানে দিয়ে বহু রোগীরই চিকিৎসা বাবু করেছেন। স্বাভাবিক কারণে, বা আনুষঙ্গিক চিকিৎসার দরুনই হোক তাদের মধ্যে যারা সেরে উঠত তারা এবং তাদের আত্মীয় পরিজনেরা কিন্তু গুণগান করত শুধু বাবুর আশ্চর্য চিকিৎসার আর সেই অলৌকিক শিকড়ের। এমনি করেই মুখে মুখে কথাটা অন্ধ বিশ্বাসের বাহনে এত বেশি ছড়িয়েছিল যে দু চার দিনের পচনশীল বাসিমড়াও অনেকে শেষ আশায় দূর দূরান্তর থেকে বয়ে নিয়ে আসত। এক একদিন হাসপাতালের আশপাশ তাই ভরে যেত গলিত শবের দুর্গন্ধে।

সেরে অনেকে উঠলেও এই শিকড়ের যথার্থ গুণ সম্বন্ধে বাবুর মনে বৈজ্ঞানিক সংশয় যে যায়নি তার প্রমাণ একটি ছোট নোটবই এর পাতায় আমি পেয়েছিলাম। বাবুর মৃত্যুর পর এ নোটবইটি আমার হাতে আসে। সেই ছোট বয়সে কিছু না বুঝলেও একটু বড় হয়ে সে নোট-বই এর পাতা উল্টে বেশ অবাকই হয়েছিলাম। সেখানে বাবুর হাতে শিকড়টির একটা পেন্সিলে আঁকা ছবির সঙ্গে বহু গাছ-গাছড়ার নাম আর কিছু কিছু তুলনা করা বিবরণ লেখা। শিকড় ঘষা জল খাওয়াবার ও লাগাবার পর ভিন্ন ভিন্ন রোগীর প্রতিক্রিয়ার সময় ও বর্ণনা যেন লেখা ছিল। কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত সংকেতে লেখা ভালো বুঝিনি।

সে খাতাটি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে এই আমার সবচেয়ে বড় আফশোস।

এ সব দৈব ওষুধের সঙ্গে একটা করে গল্প জড়ানো থাকে। এই শিকড়টির বেলাতেও ছিল। গল্পটা কিন্তু বানানো আজগুবী কিছু নয় এটুকু শুধু বিনা দ্বিধায় আমি বলতে পারি। কারণ বাবুর জীবনকালেই এ গল্প আমি শুনেছিলাম। পরে আমার মা দিদিমার মুখে অনেকবার।

মির্জাপুর শহরের গঙ্গার ওপারে কাশী নরেশের একটি বিশ্রাম প্রাসাদ ছিল। এখনও বোধহয় আছে। তখনকার মহারাজা মাঝে মাঝে ওপারের সেই প্রাসাদে এসে থাকতেন। সেখানে একবার তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে আসেন আর আহূত হয়ে বেশ দীর্ঘ চিকিৎসায় বাবু তাকে সারিয়ে তোলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় মহারাজ পারিশ্রমিকের উপরি কিছু বাবুকে দিতে চেয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন ছুরি নিয়ে দুভাগ করে একটি শিকড়ের অর্ধেক। এই শিকড়টি কোনো এক সন্ন্যাসী নাকি তাঁকে সাপের

বিষের মহৌষধ বলে দান করেছিলেন। জানিয়েছিলেন যে শিকড়টি হিমালয়ের কোনো গাছগাছড়ার।

শিকড়টির প্রয়োগের যথার্থ ফলাফল যাই হোক সেটি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আমার চোখের ওপরই ঘটেছে বলতে পারি।

ভগন্তীর মা আমাদের বাড়ির পুরনো বুড়ি দাই। তার ছেলে মহাদেও গোঁফটুকু বাদ দিলে প্রায় সাক্ষাৎ ভীমসেন। মির্জাপুরের পালোয়ানরা গায়ের জোরের জন্যে বিখ্যাত বলে শুনেছি। মহাদেওকে তাদের সর্দার বলা যায়।

আমাদের হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের বাইরে শহরের রাস্তার কিছু দূরেই মহাদেওদের খাপরায় ছাওয়া কুটির। সেখান থেকে একদিন সন্ধেবেলা ভগন্তীর মা আমাদের বাড়িতে এসে আছড়ে পড়ল। তার ছেলে মহাদেও ঘরের দেয়ালের মাথায় একটা তাক থেকে একটা দড়ির বাণ্ডিল না কি পাড়তে গিয়েছিল। তাকে হাত বাড়াতেই সেখান থেকে সাপে ছোবল দিয়েছে। হাতে নয় কপালে। যাকে বলে শিরে সর্পাঘাত। সাপটাকে তারপর মারা হয়েছে। সাপটা জাত গোখরো।

মহাদেওকে খাটিয়া করে বয়ে নিয়ে এসেছে আত্মীয় বন্ধুরা। তারপর সারারাত ধরে শিকড় ঘষে খাওয়ানো আর লাগানো চলেছে আনুষঙ্গিক চিকিৎসার সঙ্গে।

এ ব্যাপারের কিছু শোনা কিছু স্বচক্ষে দেখা দুই এ মিলে মনের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে অবশ্য।

শিকড় বাটার চিকিৎসা তার পরদিনও চলেছে। এর আগে হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসায় সেটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে খুব ছোটই হয়ে এসেছিল। মহাদেওর জন্যে সেটি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

মহাদেও কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। সুস্থ হয়েছিল ওই শিকড়ের গুণে না কপালে ছোবল দেওয়ার দরুন সাপের যথেষ্ট বিষ ঢালার সুযোগের অভাবে তা নির্ণয় করবার উপায় নেই।

বাবুও তা করতে পারেননি। তার নোট বইএ প্রথম কটা পাতার পর আর এ বিষয়ে কিছু লেখা পাইনি। ওই শিকড়টির হদিস পাওয়ার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন বলে জানি। হাসপাতালের জমাদার চাপরাশি থেকে বাইরের অনেককে নানা জংলী গাছ গাছড়ার শিকড় এনে তাঁকে দিয়ে যেতে দেখেছি। সেগুলি পরীক্ষার পর জঞ্জাল হিসেবেই ঝেঁটিয়ে ফেলা হতো। বাবু বোধহয় হতাশ হয়েই শেষ পর্যন্ত এ শিকড়ের সন্ধান ছেড়েছিলেন।

সন্ন্যাসীর দেওয়া দৈব শিকড়ে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ও সেই শিকড় খুঁজে

লাব করবার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে একটু রোমাঞ্চের ছোঁয়া হয়তো আছে। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই ব্যাপারটা অত বেশি করে আমার মনে গাঁথা হয়ে যায়নি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কাকে বলে সে বিষয়ে তখন কোনো ধারণা হবারই কথা নয়, কিন্তু ভালো করে না বুঝলেও এই শিকড় খোঁজায় আর তা ব্যবহারের ব্যাপারে বাবুর যে ঐকান্তিক তন্ময়তা দেখেছিলাম তা আমার মনকে একটু অন্যভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল।

নিজের দাদামশাই বলেই হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত দুর্বলতায় বাবুকে এখনও আমার সাধারণ মাপের একটু বাইরে বলে মনে হয়। তখনকার অনেক উদ্যোগী দৃঢ়সঙ্কল্প পুরুষ সম্বন্ধে যেমন শোনা যায় অনেকটা অবশ্য সেই মতোই অবস্থা-পড়ে আসা একটি দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের ছেলে হয়ে শুধু নিজের জেদে আর চেষ্টায় ডাক্তার হয়ে তিনি প্রথম সুদূর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পেশোয়ারের কাছাকাছি কোনো জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে যান। সেখানে ঘোড়ায় চড়েই তাঁকে অনেক সময়ে চিকিৎসার টহলে যেতে হতো। একবার ঘোড়ার জিনের রেকাব ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে পাথুরে জমিতে মাথায় খুব বেশি রকম আঘাত পান। দেশে ফিরে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর অনেক দিন লেগেছিল শুনেছি। সারবার পর আত্মীয় স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও সেই চাকরিতেই ফিরে যাবার জন্যে যখন প্রস্তুত তখন সে যুগের ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি থেকে কাজের ডাক পান। বাকি জীবন তিনি এই রেলের ডাক্তার হয়েই কাটিয়েছেন।

প্রথম জীবনে ডাক্তারি পড়বার জন্যে যে দুঃখ কষ্ট তাকে পেতে হয়েছিল তখনকার দিনে তা খুব বিরল ছিল না। আরও অনেক সফল কীর্তিমান মানুষের জীবনেও সেরকম দৃষ্টান্ত আমরা পাই। জানবাজারে কলকাতার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে সামান্য একটু আশ্রয় পেয়ে সত্যি সত্যিই গলির গ্যাসের আলোয় পাঠ্য বই-এর টুকে-আনা কপি পড়েই তিনি ডাক্তারি পাশ করেছেন। ছাত্র পড়িয়ে পড়ার খরচ সংগ্রহ করতে হতো বলে বাসায় ফিরতে তার প্রতিদিন অনেক রাত হয়ে যেত। বাড়ির রাঁধুনির সামান্য একজন আশ্রিতের জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকবার কথা নয়। শুনেছি রান্নাঘরের অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পেতে-খাবার কলাপাতাটা শুধু চাপা দিয়ে একটা কাঁসার পাত্রে তাঁর ভাত ডাল রাখা থাকত। একটা কুপি পর্যন্ত সেখানে জ্বালা থাকত না। সাপ ব্যাঙ কিছু না থাকে শুধু সেইটুকু দেখে নেবার জন্যেই একটি দেশলাই-এর কাঠি একবার খরচ করে অন্ধকারেই তিনি তাঁর খাওয়া শেষ করতেন।

এ ধরনের দুঃখের পরীক্ষা খুব নতুন কিছু নয়। দাদামশাইর অসাধারণত্ব যদি কিছু থাকে তা তাঁর নিজের পেশাকে নেশা করার তন্ময়তায়। নাম যশ পসার তাঁর

যা হযেছিল তা অতুলনীয। রেলের ডাক্তার হিসেবে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের যেখানে তিনি কাজ করেছেন সেখানে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি হিসেবে তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। অর্থের লোভ থাক বা না থাক ধনীরা তাঁর পায়ে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ঢেলে দিয়েছে, কৃতজ্ঞতায দরিদ্রেরা দিয়েছে আন্তরিক ভক্তি ভালোবাসা। মির্জাপুর তখন লাক্ষার ব্যবসাযে সত্যিকার লাল হয়ে উঠেছিল। গল্প কথার মতো শোনালেও সত্যের খাতিরে বলতে হবে যে কৃতজ্ঞতায প্রণামী হিসেবে ওখানকার শেঠেদের বাড়ি থেকে অনেক কিছু ডালির সঙ্গে এক পরাত ভর্তি সত্যিকার মোহরের ভেট দেখবার কথা মনে আছে।

দিদিমার মুখে শুনেছি পযসাকড়ির ব্যাপারে উদাসীন না হবার চেষ্টা করেও বাবু কি রকম একটু বিব্রত হতেন। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে যা পারতেন সবই কোম্পানির কাগজ কিনে দায চুকোবার চেষ্টা করতেন তাই। টাকাকড়ির ব্যাপারে ঠকতেন যে প্রচুর তা বলাই বাহুল্য। কাশীতে চোখে না দেখে শুধু বিশ্বাসের ওপরে তিনি যে বাড়ি কিনেছিলেন তাঁর দেওয়া তার বায়নার টাকাই নাকি সে বাড়ির তখনকার বাজারদরের অনেক বেশি ছিল।

এ-সব কিছুই ছিল বাহ্য। তার আসল ধ্যানজ্ঞান ছিল শুধু চিকিৎসাবিদ্যা। সেই শেষ বযসেও সারাদিনের খাটুনির পর কলকাতা থেকে আনানো মোটা মোটা ডাক্তারি বই তাকে পড়তে দেখেছি। তখন না বুঝলেও এখন জানি নিজের শোবার ঘরের একটি টেবিলের বিচিত্র কিছু শিশি বোতল যন্ত্রপাতি তাঁর নিজস্ব পরীক্ষাগার ছিল।

প্রথমে অস্ত্রচিকিৎসক হিসেবেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধল। আঙুলহাড়া হয়ে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটিই কেটে বাদ দিতে হয়। ভাগ্যের কাছে হার তবু তিনি মানেননি। অস্ত্রোপচারের দিকটা বন্ধ হবার পর সাধারণ চিকিৎসক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি আগের তুলনায আরও বেড়েই গিয়েছিল।

দাদামশাই-এর কথা একটু বেশি করেই যদি লিখে থাকি সেটা অন্যায় অশোভন বলে মনে করতে পারছি না। নিজের স্মৃতিকথা লিখতে বসে জীবনে গোনাগুণতি যে কযজনের প্রভাব সব চেয়ে বেশি করে পড়েছে তাঁদের কথা কি বাদ দেওয়া যায়? দাদামশাই এঁদেরই একজন। একান্ত আপনজন বলে তাঁর কথা লিখতে যদি সঙ্কোচ করি তাহলে আমার তো মনে হয সেটাও একরকম ভীরুতা আর মিথ্যাচরণ।

মির্জাপুরে এক হিসেবে বাবুর যেন নিজের রাজত্ব ছিল। অবশ্য সেবা সহানুভূতি দিয়ে জয় করা। তাঁর জনপ্রিয়তা যে কতখানি ছিল তা বোঝাতে একটি ব্যাপারের কথা বলা যায়। মির্জাপুরে তখন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রেল কর্মীদের একটি আলাদা

পাড়া ছিল। তারা সেখানে নিজেদের ভারতীয় মনে করত না। শ্রেষ্ঠতর রাজার জাতি বলেই ভাবত। অসুখ বিসুখে নেটিভ ডাক্তার ডাকলে তাদের নিজেদের মান খোয়াবারই ভয় ছিল। দাদামশাই-এর ওপরের রেলওয়ের যে সাহেব ডাক্তার ছিলেন তাঁকেই তারা চিকিৎসার জন্যে ডাকত। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়। ক্রমশঃ দেখা গেল কঠিন অসুখে বিসুখে তো বটেই সাধারণ রোগবালাই এর বেলাতেও নেটিভ ডাক্তার ঘোষকে না ডাকলে তাদের চলে না। এই অ্যাংলো পাড়ায় বাবার সঙ্গে বড়দিনের নিমন্ত্রণে গিয়ে কেক, বিস্কুট খাওয়ার সঙ্গে আমি প্রথম সে যুগের পাঁচ দশ মিনিটের বায়স্কোপ দেখেছিলাম মনে আছে। সে বায়স্কোপে অবশ্য গল্প টল্প কিছু নয় খানিকটা নদীতে নৌকা বাওয়া কি মাঠে ঘোড়ায় চড়ার চলন্ত ছবি। সালটা উনিশ শ সাত আট মনে রাখলে সে বায়স্কোপ প্রথম দেখার মূল্যটা হয়তো বোঝা যাবে।

এরপর লজ্জ মুরাদ কখন কোথায় হারিয়ে গেছে, দৈব শিকড়টা ঘষতে ঘষতে ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাপে কাটা রোগীর ভিড় আর চিকিৎসার উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে আমার জগৎ কিন্তু শূন্য হয়ে যায়নি মোটেই। আমি নতুন সব জগৎ তখন আবিষ্কার করতে শুরু করেছি।

এক জগৎ হলো মার কাছে শোনা আশ্চর্য সব গল্পের। মা ওই বয়সেই মুখে মুখে ছোটরা যা বুঝতে পারে সেই রকম করে গোটা রামায়ণ মহাভারতের গল্প আমায় শুনিয়েছেন। শুনে শুনে সব প্রায় আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এত মুখস্থ যে বেশ কিছুকাল বাদে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটদের রামায়ণ ও মহাভারত যখন হাতে পড়েছে তখন পড়ে মনে হয়েছে যেন আগাগোড়াই পুরনো পড়া পড়ছি।

শুধু রামায়ণ মহাভারতের গল্পই নয়, মার কাছে সেই সুদূর মির্জাপুরের তারের বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ডের একটি কোয়ার্টারে বাংলাদেশের সেই আশ্চর্য তরুণদের কথা শুনেছি দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা প্রথম আত্মবলি দিয়েছে। শুনেছি ক্ষুদিরামের কথা, শুনেছি বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ সেই প্রথম বিপ্লবীদের আর তাদের মন্ত্রদাতা শ্রীঅরবিন্দের কথা।

আর একটি যে নতুন জগতের সন্ধান তখন পেয়েছিলাম তা এক মুদ্রিত পত্রিকায়। বাড়িতে অনেক বাঙলা পত্রপত্রিকা আসত, তার মধ্যে প্রথম যে পত্রিকাটি আমায় মুগ্ধ করে তার নাম ভারত মহিলা। সেটি কলকাতার কাগজও নয়। সে কাগজের প্রকাশ স্থান বলে যে দুটি শব্দ ছাপা থাকত আমার মনেও আপনা থেকেই তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। শব্দ দুটি হলো উয়ারি, ঢাকা। বহুকাল বাদে ঢাকায় গিয়ে এই উয়ারি নামটি স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে পেয়ে একটা রোমাঞ্চই যেন অনুভব করেছিলাম। সুদূর

উত্তরপ্রদেশের একটি শহর থেকে অখণ্ড বাঙলার সঙ্গে মনে মনে প্রথম যে ভৌগোলিক পরিচয় হয় তার মধ্যে কলকাতা বাদে ওই উয়ারি ঢাকাই প্রধান।

কাগজটি মনের ওপর বেশ একটু ছাপ যে রেখেছিল আর একটি নাম থেকেও তা বুঝতে পারি। সেই শিশু বয়সের স্মৃতিতে নামটা কোথায় যে লুকিয়েছিল জানি না। পরিণত বয়সে ফরাসী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পর্যটক লেখক জুলিয়েন ভিয়োর ছদ্মনাম হিসেবে নামটা পেয়ে চমকে উঠতে হয়েছিল। পিয়ের লোতি নামটা আমার চেনা। সেই শিশুকালে ভারত মহিলার পাতায় তাঁর লেখা যা পড়েছি তাও একেবারে ভুলে যাইনি।

মির্জাপুর সম্বন্ধে আরও অনেক স্মৃতিই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটা কথাই শুধু ভাবছি। জীবনের প্রান্তরে বিকেলের ছায়া পেছনে এখন দীর্ঘ। সেই ছায়ার দিকে মুখ ফেরানো দৃষ্টিতে দূরের সব কিছু সমান উজ্জ্বল নয়। যা দেখছি তার মধ্যে সংলগ্নতাও ঠিক মতো পাওয়া যাবে না। কোন্‌টা তুচ্ছ আর কোন্‌টা নয় সে বিষয়ে স্মৃতির বিচারও আমাদের তথাকথিত যুক্তিবাঁধা ধারণা থেকে যথেষ্ট আলাদা।

স্মৃতির এ বিচারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল জোর না খাটিয়ে পুরনো দিনের কথা কিছুটা বলার চেষ্টা করলাম।

॥ দুই ॥

শৈশবের প্রথম সজাগ চোখ মেলে চেয়েছি মির্জাপুরে—উত্তরপ্রদেশের শুষ্ক রুক্ষ ধুলিধূসর এক শহর। যেখানে থাকতাম সেখানকার পরিবেশ অবশ্য একটু আলাদা। শহরের প্রান্তে রেলওয়ে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা—চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

সে কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা জগতের অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আছে, অনেক গেছে সম্পূর্ণভাবে মুছে। কিন্তু কয়েকটি ছবি একেবারে অক্ষয় ভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের পর্দায়।

আমার জীবনের সেই প্রথম বন্ধু লজ্জু আর মুরাদ। চারিধারে অতি প্রশস্ত চত্বরে ঘেরা একতলা হাসপাতাল বাড়ি। তারের বেড়ার ওপারে অজানা শহরের রাস্তার মাঝে মাঝে ধুলো উড়িয়ে-যাওয়া এক্কা—এ সব কিছুর ছবি নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হলে যেন এখনো একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাই।

কাটাতারের বেড়ায় ঘেরা সেই বিস্তীর্ণ এলাকা একদিকে যেন রূপকথার আর একদিকে অতি বাস্তব জগৎ। লজ্জু আর মুরাদ সেই রূপকথার রাজ্যের সঙ্গী। হাসপাতালের ডাক্তার আমার দাদামশাই স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষ। তাঁরই কম্পাউণ্ডারের ছেলেমেয়ে লজ্জু আর মুরাদ।

কিন্তু এ পরিচয়টা যেন বাহ্য। তাদের আসল পরিচয় আমার মনে যা গাথা হয়ে আছে তা প্রথম চেয়ে দেখা পৃথিবীর রহস্যময়তার সঙ্গে জড়ানো।

লজ্জু আমায় প্রথমে বানিয়ে গল্প বলা শিখিয়েছে। তাদের সঙ্গে ওই বেড়ায় ঘেরা জগতের মধ্যেই অজানার হাতছানির উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের স্বাদ জেনেছি।

বানিয়ে গল্প বলতে শেখা মানে আসলে মিথ্যে কথা বলার হাতেখড়ি এ বিচার যদি কেউ করতে চান তো করুন, আমার মন কিন্তু কল্পনার রাজ্যের দরজা ওইখানেই প্রথম খুলেছে।

আর রোমাঞ্চ উত্তেজনার ব্যাপারে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডেরই নাতিবৃহৎ একটি বেড়া দেওয়া বাগানই আমাদের কাছে অজানার রাজ্য হয়ে উঠলেও মনকে দুর্গম দুঃসাধ্যের জন্যে উৎসুক করার খোরাক তাতে কিছু কম মেলেনি। ছেলেবেলার মন একদিক দিয়ে যেমন কোমল আরেক দিক দিয়ে তেমনি বুঝি উদাসীন।

যে লজ্জ্ মুরাদরা একদিন সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল তারা কখন কবে যে আমার জগৎ থেকে সরে গেছে তা মনেও করতে পারি না। মনে করতে পারি না অমনি অনেক কিছুই। স্মৃতির গভীর অন্ধকার অতলতা থেকে সে সব যেন ক্ষণেকের জন্যে চেতনার আলোয় ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। সাময়িক স্পষ্টতা আর উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও তাদের সামনের পিছনের কোন ইতিহাস যেন নেই।

এইসব ক্ষণস্থায়ী উদ্ভাসনের মধ্যে দু-একটা স্মৃতি কিন্তু একেবারে অক্ষয়। তারা জীবনের ধারার সঙ্গেই মিশে আছে।

এমনি স্মৃতি সেই রতন যামিনীর বানানো গল্প পড়ে জীবনের প্রথম কান্নার। এমনি স্মৃতি আমার মাতামহ ডাঃ রাধারমণ ঘোষের, বিজ্ঞান তপস্যা কাকে বলে তার আভাস নিজের অগোচরে যার দৃষ্টান্ত থেকে মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

মির্জাপুরের আরো কিছু স্মৃতি আছে, সাময়িক ও অসংলগ্ন হলেও যা আমার চেতনার দিগন্তকে প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে।

সে রকম একটি স্মৃতি হল সুদূর বাংলাদেশের একটি নগণ্য গ্রাম থেকে আমার চেয়ে বছর আষ্টেক বড় একজনের মির্জাপুরে আমাদের বাড়িতে এসে কিছুদিন থাকার।

যিনি এসেছিলেন তিনি সম্পর্কে আমার মাতুল ও বয়সে তখন এগার বারো বছরের বালক মাত্র আমার এই তুলসীমামা কলকাতা শহরের চালু চৌখস ছেলেও নয়। একেবারে অজ না হোক অতি সাধারণ এমন একটি গ্রামের ছেলে, যে গ্রাম থেকে বড় স্কুলে পড়বার জন্যে তাকে ওই বয়সেই প্রতিদিন চার মাইল করে যাতায়াতে আট মাইল হাঁটতে হত।

কিন্তু আমার এই পাড়াগেঁয়ে তুলসীমামার মির্জাপুরে আসাই আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। স্মরণীয় কোন অদ্ভুত চমৎকৃত করবার মত ঘটনার জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে যে মাসখানেক তুলসীমামা মির্জাপুরে আমাদের বাসায় ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ করবার মত সামান্য একটা ঘটনাও ঘটেনি।

যা ঘটেছিল তার দাম চমক দেওয়া ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি।

তুলসীমামা যেন একটা আশ্চর্য বিশাল বইয়ের জগৎ তার সঙ্গে বয়ে এনেছিলেন, আর হঠাৎ তার সামান্য ছোঁয়া পেয়েই আমি বেশ একটু বড় হয়ে গিয়েছিলাম।

সাধারণ গাঁইয়া ছেলে অবশ্য তুলসীমামা ছিলেন না। একদিন পরম দুঃসাহসে শিক্ষকতার বৃত্তি ছেড়ে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যের মহলে সম্পদে না হলেও সম্মানে নিজস্ব একটি মর্যাদার অধিকারী হওয়ার অঙ্কুর তখনই তাঁর মধ্যে হয়তো ছিল। থাকলেও তা আমার বোঝবার কথা নয়।

বুঝিওনি কিছু। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর কাছ থেকে এমন একটা কিছুর সংক্রমণ আমার মনে লেগেছিল যাকে বিস্তৃতির চেতনা ছাড়া আর কিছু বলে বোঝাতে পারছি না। একটু অন্যভাবে অবশ্য বলা যায় যে, ওই বয়সেই তুলসীমামার মধ্যে বড় করে দেখা আর বড় করে ভাবার মত একটা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যার ছোঁয়াচে নিজের অগোচরে আমার মনের একটা পরিবর্তন ঘটে গেছল।

সে পরিবর্তন তখন কি আর কিছু বুঝেছি? বুঝতে পারি আজ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই পিছনের দিকে তাকিয়ে।

তুলসীমামারা একমাস বাদেই চলে গিয়েছিলেন মির্জাপুর থেকে। যাবার সময় খুব একটা কষ্ট পেয়েছিলাম বলেও স্মরণ হয় না।

শুধু মির্জাপুরটা যেন একটু অন্যরকম লাগতে শুরু করেছিল। যে ট্রেনে চড়ে তুলসীমামা তার সেই সুদূর গাঁয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন সে ট্রেনটাকে অন্য চোখে দেখতে পেয়েছিলাম এবার। শুধু মির্জাপুর ছাড়ালেই মনের ভেতর থেকে সে ট্রেন হারিয়ে যায় না, সে দূর থেকে আরো দূরে যায় পৃথিবীটাকে বাড়াতে বাড়াতে নতুন থেকে নতুন কিছু দেখাতে দেখাতে।

মনে আছে সেই সময়েই যোগীন সরকারের সেই ছোটদের বইয়ের কবিতাটা মনটাকে একেবারে উধাও উদাস করে দিয়েছিল, সেই—

'ছোট্ট মানুষটি ?

কোথা থেকে আসছ তুমি গল্প যদি বলতে পারো বলতো একটি।'

আমার মনের ভেতর থেকে ওই ছড়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিচিত্র পৃথিবীর অগণন সব মানুষের অজানা কাহিনী শোনবার জন্যে একটা অস্পষ্ট আকুতি তখনই জেগেছিল। ঘটনা হিসেবে বলার মত ব্যাপার এটা নয়। কিন্তু আমার তো মনে হয় যথার্থ স্মৃতিকথার দিক থেকে মনের এই অপ্রত্যাশিত উন্মেষের খবরের দাম জমকালো চমকপ্রদ ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি। সব কিছু একেবারে ওলট-পালট করে দেবার মত ঘটনা ওই মির্জাপুরেই তারপর অবশ্য ঘটল।

ছেলেবেলায় জীবন কখনো কারুর কাছে বিস্বাদ বোধহয় হয় না! আমার কাছেও হয়নি। শিশু মনকে উৎসুক চঞ্চল করে রাখবার জন্যে খুব বেশি কিছুর তো দরকার হয় না। উত্তরপ্রদেশের প্রচণ্ড শীতে গটুর পোশাক পরে 'বাবু' যাকে বলতাম সেই দাদুর সঙ্গে গেলাস হাতে কাঁচা ছাগলের দুধ খেতে যাওয়া কি কম্পাউণ্ডের মাঠে রেলওয়ে কর্মচারীদেরই একদল ছেলের বড় একটা বল নিয়ে ছোটাছুটি দেখা (ফুটবল নামটা তখনও অজানা) তাতেই উল্লাস উত্তেজনা বিস্ময়ের যথেষ্ট উপাদান মিলেছে।

তবু সব শুদ্ধ জড়িয়ে আমাদের মির্জাপুরের জীবন এক রকম নিস্তরঙ্গই ছিল বলা চলে। সেই নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ যেন প্রলয় তুফান উঠল। এক পলকে সব কিছু গেল বদলে।

বাবু হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। হবার কারণটা আমাদের মনে অতি করুণভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেবারে উত্তরপ্রদেশের ওই অঞ্চলে বসন্ত মহামারী রূপ দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে যতজনকে সম্ভব টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবের সংখ্যা কিন্তু আশানুরূপ নয়। প্রথমত টিকা নেওয়ার বিরুদ্ধে তখনও একটা অন্ধ কুসংস্কার ও অঞ্চলে প্রবল, দ্বিতীয়ত যতজনকে স্বেচ্ছায় টিকা নিতে রাজী করা যায়, তাদের প্রয়োজনমত টিকার বীজেরই অভাব। বাবু অনেক লেখালেখি করে যতখানি টিকার বীজ আনতে পেয়েছিলেন হাসপাতালের প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

এই অবস্থায় অন্যদের প্রয়োজন আগে মিটিয়ে বাবু নিজের টিকা নেওয়াটাই স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু মারী গুটিকার কাছে মহত্ত্বের কোন ছাড়পত্র নেই। অতি কঠিন ধরনের বসন্তরোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। তাঁর এই সাংঘাতিক রোগের বিপদের ওপর আরেক দারুণ সমস্যা দেখা দিল—থাকবার জায়গা নেই।

শুধু দেশীয়দের মধ্যেই নয়, তখনকার ফিরিঙ্গি ও শ্বেতাঙ্গ সমাজেও তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্যে 'বাবু'র ওপর তাঁর আঞ্চলিক ওপরওয়ালা ডাক্তার অত্যন্ত ঈর্ষাতুর ও বিদ্বিষ্ট ছিলেন। নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে শ্বেতাঙ্গ-সমাজের কাছ থেকেও আশানুরূপ ডাক পান না বলে তাঁর রাগটা ছিল আরো বেশী। গায়ের জ্বালায় অনেকবার অকারণে বাবুকে মির্জাপুর থেকে সরাবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু ঘাড়ের ওপরেও মাথা আছে। ওপরওয়ালার ওপরেও আরো কেউ। তখনকার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেই ওপরওয়ালাও ছিলেন ইওরোপীয়, কিন্তু স্বজাত্যের টানে সুবিচার তিনি বর্জন করেননি। বাবুকে অন্যায়ভাবে মির্জাপুর থেকে সরানোর চেষ্টা তাই বিফল হয়েছে।

মির্জাপুরকে কেন্দ্র করা রেলওয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় আঞ্চলিক প্রধান 'বাবু'র এই অসুখে তাঁর আগের ব্যর্থতার আক্রোশ মেটাবার সুযোগ নিয়েছেন। বাবু যখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে রোগশয্যায় শায়িত তখন তাঁকে গুরুতর ছোঁয়াচে রোগের রোগী হিসাবে অবিলম্বে কোয়ার্টার ছাড়বার নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

একেবারে অকূলে পড়ে চোখে অন্ধকার দেখেছেন আমার দিদিমা। কোথায় নিয়ে যাবেন এই মরণাপন্ন সংক্রামক ব্যাধির রুগীকে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আশ্রয়ই বা জুটবে কোথায় এই প্রবাসের শহরে?

আশ্চর্য সমাধান হয়ে গেল সমস্যার চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই। হল শুধু ডাক্তার হিসেবে 'বাবু'র প্রতি মীর্জাপুরের আপামর সাধারণের অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি আর ভালবাসায়। ডাক্তার হিসেবে তাঁকে যে ওখানকার মানুষ কি চোখে দেখত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে। ধনী দরিদ্র অনেকেই সে দুর্দিনে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে সংক্রামক রোগের দায়িত্ব ও অন্য সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে একটি আশ্রয়ই দিদিমা বেছে নিয়েছিলেন।

মীর্জাপুর তখন গালার ব্যবসায়ে সম্পদ সৌভাগ্যের একেবারে শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে। ওখানকার শেঠেরা তখন ওখানকার রাস্তা বুঝি ইচ্ছে করলে সোনায় মুড়ে দিতে পারে। 'বাবু'র কাছে চিকিৎসার জন্যে কৃতজ্ঞ তেমনি একজন শেঠই এগিয়ে এলেন। তাঁর বিস্তীর্ণ নিভৃত বাগানবাড়ি তিনি বাবুর জন্যে ছেড়ে দিলেন। বাড়িঘর তো বটেই তাঁর লোকজন সবও বাবুর সেবায় নিযুক্ত থাকবে। বাবুর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তো বটেই যতদিন খুশি আমরা সেখানে থাকতে পারি।

সুস্থ আর বাবু হননি। তবু তাঁর মৃত্যুর পরও বেশ কিছুদিন আমাদের সেখানে থাকতে হয়েছিল। থাকতে হয়েছিল যাঁকে 'ঠাটু' বলতাম আমার সেই দিদিমার অসুখের জন্যে। বাবুকে টেনে নেবার পরই এ করাল রোগ ঠাটুকে আক্রমণ করেছিল। বাবুর চেয়ে আরও সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েও ঠাটু কিন্তু এ রোগ থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলেন।

বাবুর বেলায় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করা হয়েছিল। ঠাটুর বেলায় চিকিৎসা করেছিল এক বৃদ্ধা ধাই সেকেলে দেশীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু তাতেই অসাধ্য সাধন হয়ে গেল।

সঠিক হিসাব দিতে পারব না কিন্তু বাবু আর তারপরে দিদিমার অসুখের জন্যে শেঠের সেই বাগানবাড়িতে সবশুদ্ধ বোধ হয় মাস দুয়েক থাকতে হয়েছিল।

জীবনের সে একটা নতুন অধ্যায়, একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সবটা সমান স্পষ্ট না হলেও আমার শিশু মনে সেই দিনগুলি একটা বিশেষ ছাপ রেখে গেছে।

এর আগে মীর্জাপুরের সেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হাসপাতাল কম্পাউণ্ড থেকে বাইরে যাবার মধ্যে শুধু বাবুর এক বন্ধু শিববাবু বলে ওখানকার স্থানীয় একজন বাঙালী ব্যবসায়ীর শহরের বাসাতেই বারকয়েক গেছি। খাস শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় ওদেশী ধরনের চক মেলানো মোকানের ওপরতলা থেকে নিচের তলার কামরা ঘেরা বাঁধানো উঠোনের জীবন দেখার কিছু ছবি এখনো মনের মধ্যে আছে। শিববাবুরা থাকতেন ওপরের দুটি তলায়। নিচের উঠোনের চারিধারের

(কামরায় ছিল নিম্নবিত্ত দোকানী পশারী আর খেটে খাওয়া মানুষের বাস। তাদের আনন্দ বিষাদ হৈহল্লা। আর সে ঝগড়ার সামান্য যেটুকু আমার চোখে পড়েছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু হিসাবে তাই আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।)

শেঠের বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারে আলাদা। এত অগাধ ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য এর আগে কখনও দেখবার সুযোগই হয়নি। শিশুমন দিয়ে আর কিছু না হোক এইটুকু তখন বুঝেছি যে এ একটা আলাদা জগৎ যার সঙ্গে আমাদের সত্যি করে কোন সম্পর্ক নেই।

ঠিক বাগানবাড়িও নয়, সেটা একটা আধা খামার বাড়ি আর আধা বিলাসভবন। বিশাল প্রাসাদ গোছের বিলাস-উপকরণে ভরা সুসজ্জিত বাড়ি যেমন আছে তেমনি আছে ক্ষেতিবাড়িতে চাষের ব্যবস্থা।

শুকনো খরার দেশ। পুকুর দীঘি সে বাগানবাড়িতে ছিল না। তার বদলে ছিল চতুর্দিক পাথরে বাঁধানো সুগভীর ও প্রশস্ত ইঁদারা। জোড়া বলদ বা মোষ দিয়ে এক একটি ইঁদারা থেকে চাষের জমিতে দেবার জন্যে জল টানিয়ে তোলা হত। বেশ উঁচু ইঁদারার চারিদিক ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। একটি ধারের ঢালু রাস্তা থাকত বলদ বা মোষেদের ওঠানামার জন্য। তাদের কাঁধে লাগানো জোয়ালের সঙ্গে মোটা রশির এক প্রান্ত বাঁধা থাকত আর এক প্রান্তে বাঁধা প্রকাণ্ড হাণ্ডা থাকত ইঁদারার মধ্যে নামানো। জোড়া বলদ বা মোষ ইঁদারার ওপর থেকে ঢালের রাস্তা বেয়ে নিচে নামবার সময় ইঁদারা থেকে জলভরা হাণ্ডা কপিকলে ওপরে উঠে আসত বেশ সহজে। সেখানে দুজন জোয়ান থাকত ইঁদারার গায়ে কাটা খাঁজে হাণ্ডা লাগিয়ে কাত করে সব জল বাইরে ঢেলে দেওয়ার জন্যে। সে জল ওপর থেকে বাঁধানো নালা বেয়ে নিচের সমতল জমিতে গিয়ে পৌঁছোত। জল ঢালা শেষ হবার পর ভারমুক্ত বাহক পশুরা সহজেই আবার উঠে যেত ইঁদারার ওপারে। ইঁদারা থেকে জল তোলার এ ব্যবস্থাটা অদ্ভুত আজগুবী কিছু নয়। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয় আছে জোড়া বলদ বা মোষ দিয়ে টানা লাঠায় এ রকম জল তোলা তাঁরা সবাই দেখেছেন।

আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারাটা যত বিস্ময়কর ও অভিনব লেগেছিল বোধহয় তা দেখার মধ্যে স্বাধীন আবিষ্কারের একটা উত্তেজনা ছিল বলে। সুবিশাল সে বাগান বাড়িতে সত্যিই আমি তখন একটা অপ্রত্যাশিত স্বাধীনতা পেয়েছি।

বাড়ির সবাই প্রথমে বাবু তারপরে ঠাটুকে নিয়ে ব্যস্ত। যথাসম্ভব সময়মত নেহাত আমাকে একটু খাওয়ানো শোয়ানো ছাড়া আমার দিকে নজর দেবার কারুর অবসর নেই। নিজের খুশিমত যেখানে যেমন ইচ্ছে তাই আমি ঘুরে বেড়াতাম।

বাগানবাড়ি এলাকায় আমাদের তারের বেড়া হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের চেয়েও বেশ বিস্তৃত। বৈচিত্র্যও সেখানে অনেক বেশী।

কারুর তদারকী কি সাহচর্যে নয় নিজে নিজে অবাধে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন, অজানা সেই পরিবেশে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা সেদিন আমার মনের গড়নটা বেশ কিছু প্রভাবিত করেছে বলে আমার মনে হয়।

এই স্বেচ্ছা বিচরণের আনন্দ কিছুদিনের মধ্যেই আরো তীব্র করে তুলেছিল তখনকার ছোটদের পক্ষে অভাবনীয় একটি বস্তু। বস্তুটি হল একটি এয়ার গান, বাবুর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁকে দেখতে এসে বাগানের মালিক শেঠজি আমায় সেটি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাবু মারা গিয়েছিলেন সকালে। বাড়িময় সেই কান্নাকাটির মধ্যে ওই এয়ার গানটা নিয়ে কখন এক সময়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি অনেক খোঁজা-খুঁজির পর এয়ার গানটি পাশে নিয়ে বাগিচার এক সুদূর প্রান্তে আমায় ঘুমন্ত পাওয়া গিয়েছিল।

॥ তিন ॥

মীর্জাপুরের জীবন শেষ হয়ে গেল।

তারপর কোথায়?

শুনলাম এবার আমরা নলহাটি বলে এক জায়গায় যাচ্ছি। সে নলহাটি নাকি বাংলারই একটি জায়গা ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েরই লুপ লাইনে একটি ছোট স্টেশন।

এত কথা এমন স্পষ্ট সঠিক ভাবে কি আর শুনেছি? কেউ আমাকে আলাদা করে শোনায়ওনি। কিন্তু ছেলেবেলার কান নিজের অজান্তেই কেমন যেন সজাগ থাকে, আপনা থেকেই চারিদিকের ছড়ানো উড়ো কথা কুড়িয়ে নেয়।

নলহাটি যাবার কথাও তেমনি করে জেনেছি। একটা উত্তেজনাও অনুভব করেছি। ওই বয়সে নতুন কিছুর সম্ভাবনা মাত্রেই তো মনকে উতলা করে। যেখানে কাটিয়েছি সেই জানাশোনা জগৎ ছেড়ে নতুন আর এক জায়গায় যাওয়ার কথায় চঞ্চল হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। সেই সঙ্গে দুঃখও কি কিছু বোধ করিনি! তাও করেছি, কিন্তু সে দুঃখ স্পষ্ট সোচ্চার কিছু নয়, তা যেন মনের তলায় একটা অস্ফুট ব্যথার কম্পন। অন্য কোন কিছু নিয়ে মেতে থাকবার সময় টেরই পাওয়া যায় না, শুধু কখনো-সখনো একলা অন্যমনস্ক হলে তা জেগে ওঠে আর মনের তলা থেকে অনেক ছবিও পর পর ভাসিয়ে তোলে।

বেশির ভাগ ছবিই বাবুর সঙ্গে জড়ানো। বাবুর আমাকে নিয়ে রেল কলোনির ফিরিঙ্গিপাড়ায় বড়দিনের নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া, সেখানে সেই সেকালে, একটা টাঙানো ছোট সাদা পর্দায় প্রথম বায়োস্কোপের চলন্ত ছবি দেখে অবাক হওয়া, দেওয়ালীর দিন হাসপাতালের বিরাট চাতালে বাবুর ব্যবস্থায় সার দিয়ে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি তুবড়ি সাজিয়ে পর পর তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া, মীর্জাপুরের দারুণ শীতের সকালে কোট প্যাণ্ট ওভারকোটে ছোটখাটো একটা ভাল্লুক সেজে বাবুর সঙ্গে কাদের এক জমাদারের বাসায় গিয়ে সদ্য বাঁট থেকে দোওয়া টাটকা ঈষৎ গরম ছাগলের দুধ খাওয়া, হাসপাতালের ওপারের সেই কাঁটাতারে ঘেরা রহস্যের বাগানে বাবুর আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গাছ থেকে তাজা কচি কড়াইশুটি ছিঁড়ে খাওয়ানো—এমন অনেক স্মৃতিই এলোমেলো ভাবে মনটাকে মাঝে মাঝে কেমন বিহ্বল করে দিয়েছে। মৃত্যু যে

কি তা স্পষ্ট করে বোঝা তো নয়ই তা নিয়ে ভাববার বয়সই তখন নয়, কিন্তু সেটা যে হঠাৎ জীবনের মস্ত বড একটা দুর্বোধ ফাঁক এই অনুভূতিটা বেশ একটু ভাল ভাবেই তখন হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। অন্তত মীর্জাপুর থেকে নলহাটির জন্যে রওনা হওয়ার যে স্মৃতিটুকু এখনো আছে তাতে ট্রেনে চড়ে অজানা নতুন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনার সঙ্গে একটা কি যেন হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ মেশানো ছিল বলে এখনো মনে পড়ে।

মির্জাপুর থেকে একদিন নলহাটিতে এসে পৌছলাম। সকাল না সন্ধ্যা কখন নেমেছি কি ভাবে কোন্ কোন্ ট্রেনে কি রকম গাড়িতে সেখানে আসতে হয়েছে কিছুই মনে নেই। শুধু আমাদের সঙ্গে অসংখ্য মালপত্র ছাড়া আলাদা ওয়াগনে আনা ও নামানো একটা বিরাট পাথরের চাঁই-এর কথা মনের মধ্যে এখনো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

উজ্জ্বল হয়ে আছে বোধহয় ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বলেই। মাঝারি একটি তক্তপোষের আকারের বিরাট একটা পাথরের চাঁই রেলের ওয়াগনে করে বয়ে আনা একরকম আজগুবী ব্যাপার।

এ আজগুবী ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির উদারতায়। বাবুর প্রতি কোম্পানির ওপরওয়ালাদের যে বিশেষ প্রীতি শ্রদ্ধা ছিল তা আমাদের পরিবারের সকলের তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার পাস দেওয়াতেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে মালপত্র নেওয়ার জন্যে দু-দুটি ওয়াগনের ব্যবস্থা করাতেই বোঝা যায়।

সেই পাস ও ওয়াগনের ব্যবস্থা শুধু নলহাটিতে যাবার জন্যেই নয়, তার প্রায় দেড় বছর বাদে নলহাটি থেকে কলকাতায় আসার জন্যেও কোম্পানির পক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে অন্য সব কিছু তো বটেই সেই বিরাট পাথরের চাঁইটি শেষ পর্যন্ত আমাদের কলকাতা পর্যন্তও পৌছায় এবং এখনো আমার এই বাসস্থান থেকে রাস্তায় যাবার আসবার পথের তলায় অতীতের সাক্ষী হিসেবে প্রোথিত হয়ে আছে।

এই পাথরের চাঁইটার কথা যে স্মরণ করছি তা একেবারে অকারণে নয়। জীবনে জড পদার্থেরও একটা মূল্যবান ভূমিকা অনেক সময়ে থাকে। অন্য সব দিক দিয়ে নিরর্থক অনাবশ্যক এই পাথরটাও আমার বেলায় তাই একটু ছিল। সে কথা পরে বলছি।

আমার পরিবারের লোকেরা কি হিসেবে যে পাথরটাকে ওয়াগনে অত কষ্ট ও হাঙ্গামা করে বয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন তা ঠিক জানি না। শুধু দু-দুটো ওয়াগনের সুযোগ পাওয়া গেছিল বলেই ওই জগদ্দল পাথরটিকে ফেলে আসা হয়নি এ যুক্তিতে মন সায় দেয় না। এমনও হতে পারে যে বাবু সম্বন্ধে ওই পাথরটিকে

জড়িয়ে কোন বিশেষ স্মৃতি আমার দিদিমার মনে ছিল যার জন্যে ওটিকে নিয়ে আসবার সুযোগ তিনি ছাড়েননি।

নলহাটির রেলওয়ে কলোনি। তারই মধ্যে একটি সাধারণ রেলওয়ে কোয়ার্টারে আমরা থাকি।

আমার দিদিমার ভাই কালিপদ সেন নলহাটির হেড সিগন্যালার। মীর্জাপুর থেকে তিনিই আমাদের নলহাটিতে নিয়ে এসেছেন। বড়দের কথাবার্তায় শুনতে পাই যে কলকাতায় আমাদের জন্যে একটি বাড়ি কেনবার চেষ্টা হচ্ছে। বাড়িটি যতদিন না কেনা হয় ততদিন আমরা নলহাটিতেই থাকব।

কলকাতা সম্বন্ধে একটা মৃদু কৌতূহল থাকলেও নলহাটির ওপর বেশ একটু টানই তখন মনের মধ্যে অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। মীর্জাপুরের মতই রেল কলোনি। কিন্তু জায়গাটার অন্য আকর্ষণ আছে। মীর্জাপুরের কলোনির চারিদিক সমতল কিন্তু নলহাটি রাঙামাটি আর মাকড় পাথরের দেশ। বড় পাহাড় না থাক দিগন্তে চাইলে এখানে যে একটু রুক্ষ মাটির ঢেউ দেখা যায় তাতেই মনটা কেমন অকারণে খুশি হয়ে যায়।

মির্জাপুরের কাঁটাতারে ঘেরা কলোনির তুলনায় নলহাটির কলোনির ভেতরটা অনেক অগোছালো এলোমেলো। সেটাও আমার কাছে একটা আকর্ষণ। বিস্তৃত এলাকার মাঝখানে এক জায়গায় দুটি বিরাট প্রায় গায়ে গায়ে বেড়ে ওঠা পাকুড় গাছ, তার পাশে অযত্নে অবহেলায় প্রায় শুকিয়ে আসা একটা দীঘি, এখানে সেখানে কাঁটা-গাছের ঝোপ আর উইঢিবি, এই পরিবেশ মীর্জাপুরের হাসপাতাল কম্পাউণ্ড আর শেঠদের বাগানবাড়ির পর আমায় যেন আরেক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে।

সময় সুযোগ পেলেই বেশীর ভাগ একা একা, কখনো বা আমার প্রায় সমবয়সী বীরুমামার সঙ্গে দূরের রেলস্টেশন থেকে এই সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো আমার একটা নেশা ছিল।

বীরুমামার পরিচয়টা এখানে দেওয়া দরকার। আমার ছেলেবেলার স্মৃতিতে বীরুমামার একটা খুব বড় জায়গা আছে। তখনকার জীবনে একটা বড় ভূমিকাও।

ঠিক আপন মামা নয়, ঠাট্টা মানে আমার দিদিমার সেই সিগন্যালার ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ মার মামাতো ভাই। বয়সে আমার চেয়ে মাত্র বছরখানেকের বড়। মামাটুকু ঝরে পড়ে তাই তার সঙ্গী ও বন্ধু হিসেবে শুধু বীরু হয়ে উঠতে দেরী হয়নি সেই সঙ্গে তার বিশেষ ভূমিকাটিতে আত্মপ্রকাশ করতেও।

ভূমিকাটি নেহাত নিরীহ অনুগত কোন সঙ্গীর কিন্তু নয়, বরং কিছুটা জবরদস্ত

সর্দারেরই বলা যেতে পারে। চেহারায় আমি যেমন পাতলা রোগা একটু ক্ষীণজীবী, বীরু তেমনি বিশাল ও বিপুল। ছ'বছর আন্দাজ তখন তার বয়স, কিন্তু অনায়াসে আট নয় বছরের বলে চালানো যেতে পারে।

শরীরের যেমন তার পরিধি মনের উৎসাহ সেই অনুপাতেই তার মাত্রা ছাড়া। অনেক কিছু খেয়াল তার মাথায় আসে আর যা আসে তা যেমন করে হোক মেটাবার জেদ সে সহজে ছাড়ে না। বাপের অত্যন্ত আদরের মা-মরা ছেলে হবার দরুনই খেয়াল মেটাবার এ জেদ তার অবশ্য খাটে।

এই বীরুমামার সঙ্গে নলহাটিতে আসবার আগেই অবশ্য পরিচয় হয়েছিল। মীর্জাপুরে থাকতে একবার সে তার বাবার সঙ্গে ক'দিনের জন্যে সেখানে বেড়াতে যায়, এবং যে ক'দিন থাকে, তারই মধ্যে দম দেওয়া রেলইঞ্জিন থেকে বাজাবার ড্রাম ইত্যাদি আমার বহু খেলনারই ভেতরের কলকব্জার রহস্য বোঝাবার সাধু উদ্দেশ্যে অম্লানবদনে ভেঙেচুরে রেখে আসে।

নলহাটিতে আসবার পর তার আরেক জেদ আমাদের মানতে হয়। মা-মরা আদুরে ছেলে হবার দরুন তার পড়াশুনার দিকটায় ঠিকমত নজর দেওয়া হয়নি। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হলেও পড়ার দিক দিয়ে সে তাই একটু পিছিয়েই ছিল। নলহাটিতে এসে আমাদের প্রথম স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা হল। স্কুল বলতে একটি সেখানকার তখন যাকে মাইনর স্কুল বলা হত তাই। সে স্কুলে ভর্তির সময় পড়াশুনার অনুপাতে বীরুমামার জন্যে আমার নীচের ক্লাস নির্দিষ্ট হতেই সে বেঁকে দাঁড়াল। আমার ওপর ক্লাসে পড়া সে মানবে না। অনেক বোঝানো-সোঝানোর পরও তাকে শান্ত করতে না পারায় আমাকেই শেষ পর্যন্ত তার ক্লাসেই ভর্তি হতে হল।

যে দৃষ্টান্ত দুটির কথা লিখলাম তা দিয়ে বীরুমামা সম্বন্ধে একটু বিরূপ ধারণা হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেইটিই হবে নিতান্ত ভুল। ছেলেবেলার ওই খামখেয়ালী জেদটুকু বাদ দিলে বীরুমামা এক আশ্চর্য সৃষ্টিছাড়া এবং সেই সঙ্গে এক হিসেবে অত্যন্ত মধুর চরিত্র। আমার সঙ্গে প্রায় আগাগোড়া একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক রেখে জীবনের অনেক কিছুতে সে অল্পবিস্তর ছায়া ফেলে গেছে।

ছেলেবেলাতেই ওই একটু অতিরিক্ত সুপুষ্ট দেহে তার প্রাণশক্তি যেমন ছিল অত্যন্ত বেশি, তেমনি ছিল তার নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।

আমার চেয়ে শুধু বয়সেই সে একটু বড় নয়। অভিজ্ঞতাতেও অনেক অগ্রসর। সে এরই মধ্যে তখন কলকাতা দেখেছে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে সেখানকার ট্রামগাড়ি, যাদুঘর আর চিড়িয়াখানা।

আমাদের খেলাধুলা ইত্যাদি তার সেই অভিজ্ঞতার জোরে বেশ একটু নতুন রাস্তা যে নিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন আমাদের চিড়িয়াখানা বানানো। চিড়িয়াখানা তখনো আমি স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু বীরুমামার কাছে শুনেই সে বিষয়ে রীতিমত উৎসাহী হয়ে উঠেছি। মূল কল্পনাটা বীরুর কাছ থেকে এলেও সেটার রূপ দেওয়ার ব্যাপারে আমার ভূমিকা তার চেয়ে একটু বুঝি বেশিই ছিল। নিজের মনে রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের এলাকায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা থেকেই আমাদের চিড়িয়াখানা বানানোর ব্যাপারে বড় ভূমিকা নেবার কিছু সুবিধে অবশ্য আমার হয়েছিল।

আমাদের চিড়িয়াখানা নেহাত একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। খাঁচার জায়গায় সেখানে ছিল শিশি, বোতল, কাঁচের বোয়েম। সে সব কিন্তু রকমারি জীবে ভর্তি। কোনটিতে ছিল ফড়িং, কোনটিতে বীরুমামার অনেক কৌশলে ধরা বোলতা, কোনটিতে বেশ একটু গা-শিউরে-তোলা শুঁয়োপোকা, আর কয়েকটিতে ছিল নানা জাতের ছোট বড় পিঁপড়ে।

এই পিঁপড়ে সংগ্রহের ব্যাপারেই আমি কিছু বেশী কেরামতি দেখিয়েছি। এখানে সেখানে মাঠে ঘাটে ঘোরার সময় পিঁপড়েদের লক্ষ্য করা আমার কাছে তখন একটা মজা ছিল। ও অঞ্চলের পাথুরে জমির ঘাসের দানা সংগ্রহ করে বাইরে তার তুষ যারা ফেলে যায়, আর গাছের পাতা জুড়ে যারা বাসা বানায় এমন সব পিঁপড়ের সঙ্গে অন্য জাতের ছোট বড় পিঁপড়ের তফাত আমি তখন মন দিয়ে দেখতে শিখেছি।

এ সব পিঁপড়ে দেখার বিবরণ বাড়ির লোকজনের কাছে বলতে গিয়ে খুব উৎসাহ না পেলেও বাধা তেমন পাইনি। তবে ঠিক বাধা না হলেও একটি বিষয়ে একটু উপহাস পেয়ে সকলের কাছে আমার পিঁপড়ে পর্যবেক্ষণের বিষয় বলা আমায় বন্ধ করতে হয়েছিল। নানা জায়গায় নানা রকমের পিঁপড়ে দেখতে দেখতে কোন কোন পিঁপড়ের সারিতে অন্য এক ধরনের দু-একটি পোকা আমি দেখেছিলাম। পিঁপড়েদের সঙ্গেই লাইন দিয়ে একই গর্ত থেকে তাদের যাওয়া আসা দেখে অবাক হয়েছিলাম খুব।

এই বিবরণ বড়দের কাছে দিতে গিয়ে কিন্তু শুধু হাসি ঠাট্টাই শুনতে হয়েছিল। বড় হয়ে বিশেষজ্ঞদের লেখায় আমার দেখার সমর্থন যে পাব তা কি তখন আর জানি! বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে অভিমানে আমার টহলদারির বিবরণ বড়দের কাছে আর দিইনি।

বড়দের কাছে পাত্তা না পাই বীরুমামার উৎসাহ পুরোপুরিই পেয়েছিলাম।

আমাদের চিড়িয়াখানার পিঁপড়ে বিভাগের আমিই ছিলাম কর্তা। অন্য সব বিভাগে সে-ই অবশ্য সর্বেসর্বা। সে যোগ্যতাও অবশ্য তার ছিল। চিড়িয়াখানায় বাঘ সিংহের মত একটা জবরদস্ত প্রাণীর বদলি হিসেবে একটা বেড়াল বেঁধে রাখবার পরিকল্পনাটা তারই। প্রধানত কীটপতঙ্গ ছাড়া একটা জ্যান্ত টিকটিকি ধরে রাখবার বুদ্ধিটা তার মাথাতেই এসেছিল। টিকটিকি ধরার ভারটা নিজেই নিয়ে আমায় সে বাড়ির ভাঁড়ার থেকে একটা কাঁচের বোয়েম সকলের অগোচরে সরিয়ে আনবার হুকুম দিয়েছিল। সে হুকুম তামিল করতে গিয়ে ধরা পড়ে বেশ একটু কেলেঙ্কারিই হতে যাচ্ছিল। চিড়িয়াখানার পরিকল্পনাটাই প্রায় ভেস্তে যাবার উপক্রম। যার কাছে ধরা পড়েছিলাম আমাদের বাড়ির পরিচারক সেই লালজিয়ার উদারতাতেই তা আর হয়নি। শেষ পর্যন্ত কি ভাবে জানি না সত্যিকার একটা জ্যান্ত টিকটিকি সে নিজেই ধরে দিয়ে আমাদের একেবারে কিনে নিয়েছিল বলা যেতে পারে।

চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা হলেই তো শুধু হবে না তা সাজিয়ে বসাবার একটা উপযুক্ত জায়গাও যে একান্ত দরকার। সেই জায়গাটা আমিই আবিষ্কার করলাম মির্জাপুর থেকে বয়ে আনা সেই পাথরের চাঁইটায়। আমার বাছাইটা যে চমৎকার বীরুকেও তা স্বীকার করতে হল।

পাথরের চাঁইটা তখন আমাদের রেল কলোনির বাসার কিছু দূরে মাঠের মধ্যে চারকোণে ক'টা ছোট পাথরের ওপর বসানো ছিল। সময়ে অসময়ে এটা সেটা শুকোতে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে তা লাগত না। বেপোট জায়গায় অত্যন্ত নিচু করে পাতা বলে বড়দের বসার পক্ষেও সেটা ছিল অনুপযোগী।

তার চারধারে বেঁকারির খুঁটি পুঁতে আর বাড়ি থেকে কটা কাপড় কোনরকমে বাগিয়ে এনে তা দিয়ে খুঁটিগুলোর চারপাশ থেকে পাথরটা ঘিরে একটা তাঁবু গোছের বানাবার পরিকল্পনা তখনই বীরু করে ফেলল।

চিড়িয়াখানা তাঁবুর মধ্যে হতে পারে কিনা সে বিষয়ে কোন জ্ঞান তখন আমার নেই। বাড়ি থেকে দরকার মত কাপড় বাগিয়ে আনাটাও কার্যক্ষেত্রে বেশ একটু দুরূহ হল। তবু কান্নাকাটি করে জবরদস্ত বীরুমামা সামান্য যে দু একটা ছেঁড়া কাপড় চাদর শেষ পর্যন্ত যোগাড় করলে তা দিয়ে তাঁবু বানানো হবার পর আমাদের খুশি আর ধরে না। নিজেরা তো মুগ্ধ হলামই আর পাঁচজনকে দেখাবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

আর পাঁচজন মানে যে-স্কুলে তখন ভর্তি হয়েছি তারই আমাদের ক্লাসের সহ-

পাঠীদের। একে এই রকম অপরূপ চিড়িয়াখানা তার ওপর ও রকম একটা বিরাট পাথরের চাঁই, এর ওপর সত্যিকার কাপড় চাদরে তৈরি অমন একটা তাঁবু। এ সপ্তমাশ্চর্য কীর্তি তাদের ডেকে না দেখালে চলে?

ঠিক মনে নেই তবে কোন একটা ছুটির মধ্যেই আমাদের আজব চিড়িয়াখানা আর তাঁবু তৈরি করেছিলাম বলে মনে আছে। ছুটির পর স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের সগর্বে নিজেদের কীর্তি দেখতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলাম।

নিমন্ত্রণ তারা রাখবে কিনা সে বিষয়ে মনে একটু ভাবনা বোধহয় ছিল।

কিন্তু দেখা গেল সেটা অমূলক! নিমন্ত্রণ রাখতে তারা এল। এল সদলবলেই, স্কুল থেকে বাড়ি গিয়ে বইগুলো পর্যন্ত রাখবার জন্যে সময় নষ্ট না করে।

তারপর যা হল তা প্রায় লঙ্কাকাণ্ডেরই সামিল। আমাদের কীর্তিতে যাদের অবাক করে দেব ভেবেছিলাম তারাই আমাদের দিলে একেবারে হতভম্ব করে।

আমাদের সাধের চিড়িয়াখানা দেখে কি হাসির ধুম!

অত যত্নে সংগ্রহ করা আমাদের এক একটি দ্রষ্টব্যের শিশি বোতল তারা তুলে ধরে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে।

এই এর নাম চিড়িয়াখানা।

এই এটা কি রে। গঙ্গাফড়িং?

না রে না কুমীর।

আর এটা ডেয়ো পিঁপড়ে?

এটা তো মক্ষী আছে

শুধু এই ধরনের হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারট শেষ হলেও কোনরকমে সইতে বোধহয় পারতাম। কিন্তু হাসি মস্করা করতে করতে তাদের কেউ কেউ একেবারে লণ্ডভণ্ডের নেশায় মেতে উঠল। দেখতে দেখতে শিশি বোতল ভেঙে চুরে আমাদের অত কষ্টে যোগাড় করা সব নিদর্শন ছেড়ে বা উড়িয়ে দিয়ে কখনো বা থেঁৎলে মেরে সে এক কুৎসিত কাণ্ড।

এর মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতা কিটু বলে একটি সহপাঠীর।

॥ চার ॥

একটু করে বড় হওয়ার সঙ্গে ক্রমশই পৃথিবীতে অনেক নতুন কিছুর সঙ্গে পরিচয় হয়। ভালও যেমন তেমনি মন্দও।

নলহাটিতে জীবনের বিশ্রী কটা দিক প্রথম মনের ওপর একটা ব্যথা বিহ্বলতার ছাপ রেখে গেল। অকারণ নিষ্ঠুরতা, অবিচার, অবজ্ঞা, অত্যাচারের সঙ্গে সেইখানেই প্রথম পরিচয়।

ছেলেমানুষী চিড়িয়াখানা বানিয়ে সহপাঠীদের উৎসাহভরে দেখাতে গিয়ে তাদের উপহাসে, আর সব কিছু ভেঙে চুরে মজা করার দুরন্তপনায় ব্যথা পেয়েছিলাম খুব। কিন্তু শুধু দুঃখ পাওয়ার ওপরে একেবারে কেমন বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম কিটু বলে একটি ছেলের নিষ্ঠুরতায়।

আমাদের সঙ্গে ক্লাসে যারা পড়ত তারা সবাই বাঙালী নয়। মাতৃভাষা যাদের বাংলা নয় তেমন কয়েকজনের মধ্যে কিটু আর দোয়ারকার নাম দুটো মনে আছে। আমি তো ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে ছোটই ছিলাম। কিটু আর দোয়ারকা অন্য সকলের তুলনাতে বয়সে অনেক বড় ছিল। দোয়ারকা লম্বায় চওড়ায় আমাদের দু-একজন শিক্ষকেরই সমান ছিল বলে মনে পড়ছে। দেহটার তুলনায় বুদ্ধিটা একটু কম ছিল কিন্তু স্বভাবটা অত্যন্ত সরল বলে ঠাট্টা মস্করা যেমন তাকে নিয়ে করত তেমনি তাকে ভালও বাসত সবাই।

কিটু চেহারায় দোয়ারকার সমান না হলেও বয়সে তার চেয়েও বড় ছিল আর তার চালচলনও ছিল বেশ পাকা মাতব্বর ধরনের। ভালবাসা না থাক তাকে অল্পবিস্তর ভয় করত সবাই। আমাদের শিক্ষকরাও তার সম্বন্ধে হতাশ হয়েই বোধহয় তাকে পারতপক্ষে ঘাটাতেন না।

শুনেছিলাম কিটুরা খুব বড়লোক। সেই বয়সেই তার পোশাক পরিচ্ছদের তফাতটা লক্ষ্য না করে পারিনি। বাজারে তার বাবার মস্ত বড় কাপড়-চোপড়ের দোকানও একদিন সে-ই বোধহয় দেখিয়েছিল।

কিটু নিজের খেয়ালে ক্লাসের পিছন দিকের একটি বেঞ্চিতে এসে বসত। পড়াশোনায় মন না দিলেও গোলমাল কিছু করত না। তবে যখন খুশি জল খাবার কি বাইরে যাবার নাম করে ক্লাস ছেড়ে চলে যেত। সে এ ধরনের আর্জি নিয়ে

উঠে দাঁড়ালে মাস্টাররা কেউ কখনও আপত্তি করতেন না, তা ঘণ্টায় সে তিনবার বাইরে যেতে চাইলেও সে যে অনুমতি চাওয়ার শিষ্টাচারটুকু পালন করে এতেই শিক্ষকেরা বোধহয় সন্তুষ্ট ছিলেন।

পড়াশুনায় তো নয়ই খেলাধুলোতেও কিট্টুর বিশেষ আগ্রহ কখনও দেখিনি। কোন কিছুতে কৃতিত্ব না থাকলেও মাতব্বরীটা তার কিন্তু পুরোমাত্রাতেই থাকত সব বিষয়ে, আর সেটা সে মানিয়েও ছাড়ত সকলকে।

কিট্টুর প্রতি অনুরাগ না থাক তার সম্বন্ধে কৌতূহলটা কিন্তু নানা কারণে আমাদের বেশ তীব্র ছিল।

কিট্টু অনেক বিষয়ে অসাধারণ। ওই বয়সে সে সত্যিকার সিগারেট খায়, এমন সব বিশ্রী গালাগাল দেয় যে এক এক সময়ে আমরা একেবারে থ হয়ে যাই। শুধু তাই নয় তার পকেটে সব সময়ে এত পয়সা থাকে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মন মেজাজ খোলা থাকলে আর কারুর ওপর সদয় হলে সে এক এক দিন দরাজ হয়ে লাড্ডু মিঠাই খাইয়েও দেয়।

কিট্টুকে এই সব দিক থেকে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে যাই ধারণা হয়ে থাক তার ভেতরে অমন একটা নিষ্ঠুর প্রকৃতি লুকোনো আছে তা ভাবতেই পারিনি।

সে নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ অহেতুক আর মাত্রাছাড়া বলে ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় আর রাগে একেবারে নির্বাক বিহ্বল করে দিয়েছিল।

মজা করবার দুরন্তপনায় অন্য অনেকেই আমাদের চিড়িয়াখানার জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে তছনছ করেছিল ঠিকই, আমাদের সাধের সব সংগ্রহ তাতে নষ্ট হয়ে শিশি বোতল কয়েকটা ভেঙে চুরেও গিয়েছিল কিন্তু কিট্টু যা করলে তা এই সব সাধারণ ছেলেমানুষী দৌরাত্ম্যের বাইরে।

অন্য সবাই শুধু শিশি বোতলগুলো খুলে বা ছড়িয়ে ফেলেই খুশি ছিল, কিন্তু কিট্টুর প্রথম থেকেই উৎসাহ শিশি বোতলে ভরা পোকামাকড় সব কিছুকে নির্মম ভাবে মারার।

ছিপি খুলে দেবার পর বেরিয়ে আসা আমার অত কষ্টে যোগাড় করা পিঁপড়ে-গুলোকে সে জুতো দিয়ে পিষে পিষে মারলে। বোলতাটাকে কায়দা করতে না পারলেও দুটো পা দিলে ছিঁড়ে, আর সবচেয়ে নিষ্ঠুরতা দেখালে লালজিয়ার ধরে দেওয়া আমাদের সেই অমূল্য টিকটিকিটার ওপর।

স্কুলের বন্ধুদের বেয়াড়াপনা শুরু হতেই বীরুমামা টিকটিকির বড় বোয়েমটা তুলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে সযত্নে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। পিঁপড়ে ফড়িং ইত্যাদির

শ্রাদ্ধ শেষ করবার পর কিট্টুর নজর পড়ল সেই বোয়েমটার ওপর—আরে টিকটিকিটা তো দেখিনি এতক্ষণ !

বীরুমামার বোয়েম নিয়ে পালাবার চেষ্টা আর সফল হল না। কিট্টু হিংস্র উল্লাসে তাকে গিয়ে ধরে ফেললে। তারপর দুজনের ধস্তাধস্তিতে বোয়েমটাই আছড়ে পড়ে চুরমার।

কিট্টুর ভেতরকার ভয়ঙ্কর চেহারাটা এবার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

টিকটিকিটা বোয়েম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের চাঁইটার ওপর আছড়ে পড়ে খানিকক্ষণের জন্যে কেমন একটু অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

কিট্টু সেই অবস্থায় তাকে মারবার জন্যে আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে একটা ভাঙা বোতলের মাথাই তখন তুলে নিয়েছে টিকটিকিটা মারবার জন্যে।

এ আর নীরবে সহ্য করবার নয়। ব্যাকুলভাবে চেচামেচি করেও তাকে থামাতে না পেরে মরিয়া হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

চেহারাটা বিরাট হলেও সাত চড়ে যার রা ওঠে না, কিট্টুরই একান্ত বশংবদ হুকুমবরদার সেই নেহাত নিরীহ ভালমানুষ দোয়ারকা হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে কিট্টুর হাত থেকে বোতলের মাথাটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কি যেন বললে ঠিক বোঝা গেল না। স্বরটা অবশ্য তীব্র প্রতিবাদের।

অন্য সকলের দৌরাত্ম্যের মাঝে দোয়ারকা যে একদিকে একা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সেটা এতক্ষণ তেমন লক্ষ্য করিনি। এবার সেটা খেয়াল করার সঙ্গে তার এই অপ্রত্যাশিত ক্রুদ্ধমূর্তি দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম।

আমরা শুধু অবাকই হয়েছিলাম কিন্তু কিট্টু প্রথমটা একেবারে হতভম্ব। তার আঙুল নাড়ায় যে ওঠে বসে, সারাক্ষণ পোষা জানোয়ারের মত যে তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, আর চাকরবাকরের মত যাকে সে ফাই-ফরমাশ খাটায়, সেই দোয়ারকার এত বড় স্পর্ধা যে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় !

খানিক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর কিট্টু একেবারে হিংস্র ক্ষ্যাপা নেকড়ের মত দোয়ারকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর এলোপাথাড়ি লাথি চড় ঘুষির সঙ্গে সে কি অশ্রাব্য কুৎসিত গালাগালি।

ইচ্ছে করলে দোয়ারকা একটু হাত নেড়েই কিট্টুকে মাটিতে ছিটকে ফেলে দিতে পারত ; কিন্তু তার সব তেজ ওই একবার একটুখানি রুখে দাঁড়ানোতেই বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছিল। কেমন একটা অসহায় কাতর চোখে কিছুক্ষণ কিট্টুর অত্যাচার নীরবে সয়ে সে সেখান থেকে যেন ভয়ে ভয়েই ছুটে পালাল।

তার উদ্দেশে কুৎসিত একটা গালাগাল ছুড়ে কিট্টু আবার টিকটিকিটার দিকে মন দিলে। কিন্তু তাকে তখন আর পাবে কোথায়? খানিক মরার মত পড়ে থাকার পর টিকটিকিটা সাড় ফিরে পেয়ে আমাদের গোলমালের মধ্যেই সরে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

গা ঢাকা দিয়েছে অবশ্য পাথরটারই তলায়। জায়গাটা ঠিকমত অনুমান করলেও সেখান থেকে তাকে বার করা কিট্টুর কর্ম নয়। তবুও চেষ্টার ত্রুটি সে করলে না। চিড়িয়াখানা বানাতে পাথরটার চারিধারে কাপড়ের ঘেরা দেবার জন্যে যা পোঁতা হয়েছিল সেই বাকারীর খুঁটি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তলাটা বৃথাই খুঁচিয়ে কিট্টু শেষ পর্যন্ত খুঁটিটার ওপরই রাগ ফলিয়ে সেটা ভেঙে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে দোয়ারকা আর আমাদের যে ভাল করে দেখে নেবে তাও জানিয়ে গেল গালাগাল আর ঝাঁঝানো ভাষায় শাসিয়ে।

আমাদের বেলা তার শাসানি কিছু ফলেছিল বলে মনে করতে পারছি না, কিন্তু দোয়ারকার ওপর আক্রোশ কিট্টু কোনরকমে মিটিয়েছিল বলেই সন্দেহ হয়। কারণ মাসখানেক যেতে না যেতেই দোয়ারকার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। দোয়ারকার নাকি পড়াশুনা যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাই সে এখন থেকে তার বাবার সঙ্গে কাজ করবে। দোয়ারকার কাছেই একসময়ে জেনেছিলাম যে তার বাবা কিট্টুদের বাজার সরকার গোছের কি কাজ করতেন। খবরটা জেনেছিলাম অবশ্য এ ঘটনার অনেক পরে। কিট্টুও তখন আমাদের স্কুলে আর পড়ে না। এ স্কুল ছেড়ে পাটনা না গয়ায় তাদের অন্য এক আড়তের জায়গায় অনেক বড় স্কুলে সে তখন নাকি পড়তে গেছে।

দোয়ারকার সঙ্গে আবার দেখা ও কথাবার্তা হয়েছিল বেশ কিছুকাল পরে আমাদের আরেক খেয়ালের ব্যাপারে।

নলহাটি শহরে তখন কিছুদিনের জন্যে এক রামলীলার দল এসে ছেলে বুড়ো সকলকে মাতিয়ে দিয়ে গেছে। রাম লক্ষ্মণ রাবণ হনুমান সীতার গল্প ভাল করেই জানতাম কিন্তু তাদের কীর্তিকলাপ অমন চাক্ষুষ করা যায় তা কল্পনাও করিনি।

শুধু প্রতি সন্ধ্যায় বাজারের কাছের বড় মাঠেই নয়, প্রতিদিন সকালে শহরের সব বড় রাস্তাতেও রামলীলার প্রধান নায়কদের দেখার সৌভাগ্য সকলের হত। কখনো ঝলমলে পোশাকে বিরাট বলদ-টানা গাড়িতে সাজানো মঞ্চের ওপর পাতা সিংহাসনে বসিয়ে, কখনো ঘোড়ায় চড়িয়ে রাম-সীতা বা রাম-লক্ষ্মণকে শহরের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত ঘুরিয়ে। রাম-সীতা বা রাম-লক্ষ্মণের সাথে হনুমানজি অবশ্য সব

সময়ে উপস্থিত থাকতেন। দু একবার দশানন রাবণকেও এই জলুসে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় লোকেদের গালমন্দ আর ঢিল-টিল একটু বেশী হওয়ায় সে চেষ্টা ছেড়ে দিতে হয়।

রাবণের ওপর যেমন রাগ, রাম-লক্ষ্মণ আর হনুমানজির ওপর তেমনি গভীর ভক্তি। সাক্ষাৎ দেবতাদের দেখার জন্যে কী ভিড়ই না হত রাস্তার দুধারে! রাম-লক্ষ্মণ হনুমানজির নামে পেতে রাখা প্রণামীর থালাও ভরে উঠত টাকা পয়সা আর নানা রকম জিনিসে।

রামলীলার দল সাতদিন ধরে নলহাটি আর তার চারধারের গ্রামের মানুষকে মোহিত করে বেশ কিছু পয়সা কামিয়ে চলে যাবার পর খেয়ালটা আমাদের মাথায় এল। রামলীলার দল চলে গেলেও রাম-লক্ষ্মণের পালা বন্ধ হবে না।

পালা চালাবে কে? আমরাই চালাব আবার কে?

খেয়ালটা অবশ্য বীরুমামার মাথাতেই প্রথম উদয় হয়। আমি শুধু তার সহকারী হলেও দায়িত্ব তার চেয়ে আমার একটু বেশীই ছিল। দায়ে পড়ে আমিই চিত্রকর আর নাট্যকার হয়ে উঠেছি। বড় বড় কাগজে রঙ দিয়ে রাক্ষস বাঁদর ইত্যাদির যেমন তেমন মুখোস আমাকেই আঁকতে হয়েছে, রামলীলা নাটকের কথাগুলোও বাংলা হিন্দীর খিচুড়িতে আমিই যাহোক করে বানিয়ে তুলেছি।

পালাটা রামলীলার হলেও আমাদের বেলা চরিত্র তার গোনাগুণতি। রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান আর রাবণ এই পাঁচজনই সব।

এই পাঁচটি ভূমিকা পূরণ করাই কি সোজা!

বীরুমামা নিজে থেকে রাবণের ভূমিকাটা বেছে নিয়ে একটা সমস্যা মিটিয়েছে। মাথায় কাপড়ের পাড় দিয়ে বাঁধা লম্বা বাঁখারিতে আটায় এটে ঝোলানো জমকালো দশটা গুঁফো মুখের ছবিই তার মনকে টলিয়েছে নিশ্চয়। রামের পার্টটা সে আমাকেই দিয়েছে সেই সঙ্গে সীতারও। আপত্তি আমি যা করেছি তা সে খণ্ডন করে দিয়েছে এই বলে যে পালাটা যখন লঙ্কার যুদ্ধ নিয়ে তখন রামসীতার তো দেখাই হচ্ছে না রাবণ বধের আগে পর্যন্ত। আর রাবণ বধেই আমাদের পালা যখন শেষ তখন যে রাম সে-ই সীতা হতে বাধাটা কোথায়?

রাম সীতা রাবণের পর লক্ষ্মণও যোগাড় হল আমাদের রেল কলোনি থেকে। বীরুমামার বাবারই এক সহকারী তখন নতুন বদলি হয়ে নলহাটি এসেছেন। তাঁর ছ'সাত বছরের মেয়ে রমা না উমা—নামটা ঠিক মনে নেই—হল আমাদের লক্ষ্মণ। মধুর অভাবে যে গুড় দেওয়া চলে ও 'আতুরে নিয়মো নাস্তি' এ শাস্ত্রবাক্য তখন জানা

ছিল না, কিন্তু লক্ষ্মণের অভাবে রামলীলাই বাতিল হবার ভয়ে কোন মেয়ের লক্ষ্মণ হওয়া সম্ভব কি না সে প্রশ্ন আর তুলিনি। মেয়ে লক্ষ্মণের অভিনবত্ব বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিলাম।

সবচেয়ে বড সমস্যা এর পর হনুমানকে নিয়ে। হনুমান সাজবে কে? তা সাজবার যোগ্যতাই বা আছে কার?

স্কুলের কাউকে নিতে চাইলে শুধু হনুমান কেন লক্ষ্মণ সীতা এমন কি রাক্ষস ও বানর সাজবার সমস্যাও অনায়াসে মিটে যেত। কিন্তু চিডিয়াখানা নিয়ে আগের অভিজ্ঞতার পর সেদিক আর মাডাইনি। আমাদের রামলীলার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছি স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে।

এরই মধ্যে দোয়ারকা হঠাৎ একদিন আমাদের রেল কলোনির বাসায় এসে দেখা দিতে হনুমানের সমস্যাটা মিটে যাবার আশা হল।

দোয়ারকা কলোনিতে কি জন্যে এসেছিল তখনো জানি না। আমি তখন সেই পাথরের চাঁইয়ের ওপর আমাদের স্কুলের খাতা থেকে ছেঁডা সব পাতায় রঙের বাটি নিয়ে রাক্ষস বা বাঁদরের মুখোস আঁকছি। বীরুমামা কাছে দাঁডিয়ে ছবিতে দাঁত গোঁফ কান চুল ইত্যাদি কোন্‌টার কি রকম হওয়া উচিত তার নির্দেশ দিচ্ছে। হঠাৎ বীরুমামার মুখে দোয়ারকার নাম শুনে মুখ তুলে তাকে দেখে কি খুশিই যে হলাম।

আরে দোয়ারকা যে। কোথায় ছিলি এতদিন। এই রকম কিছু বলে তাকে রঙের তুলি সমেত জডিযেই ধরেছিলাম আনন্দে।

দোয়ারকার জামায় একটু রঙ লেগে গিয়েছিল কিন্তু সে তাতে কিছু মনে করেনি।

তার কেমন একটু যেন জডোসডো ভাব। বেশ একটু দ্বিধা ভরে আমরা কি করছি জিজ্ঞাসা করেছিল।

রামলীলা! রামলীলা!

আমরা উত্তেজিত তাকে আমাদের নতুন খেলাটা বুঝিযে দিয়েছিলাম। বোঝাতে বোঝাতেই হনুমানের ভূমিকাটার কথা মনে হয়েছিল। দোয়ারকাকে রাজী করাতে কোন কষ্টই হয়নি। হনুমানের সমস্যা মেটাতে তার জন্যে আঁকা মুখোশটা তখনই বার করে এনে তার মুখে বেঁধে পরীক্ষাও করা হযে গিযেছিল।

দোয়ারকার উৎসাহ আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। তখন তাকে ফিরে যেতে হবে। তাই সে কথা দিলে যে বিকেলে একটু ছুটি করে নিয়ে নিশ্চয়ই সে আমাদের রামলীলায় হনুমান সাজতে আসবে।

বিকেলে সে ছুটি করে আসবে বলায় এতক্ষণে দোয়ারকার নিজের খবর নেবার

কথা মনে হয়েছিল। সে এখন কি করে। কেন সে আর স্কুলে আসে না জিজ্ঞাসা করাতে সে কেমন একটু করুণ ভাবে হেসে তার বদ্‌নসীবের জন্মে দায়ী হিসেবে বিছমতিয়া গোছেব কি একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল।

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিছমতিয়া আবার কি?

এবার বিছমতিয়ার মানেটা সে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বিছমতিয়া হল টিকটিকি। আমাদের নকল চিড়িয়াখানার সেই টিকটিকি থেকেই দোয়ারকার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। কিট্টুকে সেটা মারতে না দেওয়ার শোধ সে ভাল ভাবেই নিয়েছে। দোয়ারকাকে তো দোকানে তার বাবার কাছে বকুনি মারধর খাইয়েছেই, তার ছেলের অপরাধে দোয়ারকার বাবার চাকরিটাও গেছে। দোয়ারকার বাবা এখন ছোটখাটো একটা মুদির দোকান করেছেন। দোয়ারকাকে স্কুলে দেবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই। দোয়ারকা তার বাবার দোকানেই তাঁকে সাহায্য করে। এক বাসায় মুদিখানার সওদা পৌঁছে দেবার জন্যেই সে কলোনিতে এসেছিল।

দোয়ারকার বদ্‌নসীব কিন্তু ওকে ছাড়েনি। সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এক এক জনের দুর্ভাগ্য অমনি নাছোড়বান্দাই বুঝি হয়।

বিকেলবেলা ওর জন্মে হাপিত্যেশ করে বসে আছি। মুখোসটাতে দু এক পোঁচ বেশী রঙ তো লাগিয়েছিই, বাড়ির কুয়োর পুরোন একটা দড়ি কেটে এনে বীরুমামা একেবারে পয়লা নম্বর একটা লেজও বানিয়ে রেখেছে।

দোয়ারকার তবু দেখা নেই। প্রায় সন্ধ্যে যখন হয় হয়, আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে লালজিয়ার-ই আমাদের খোঁজে যখন আসবার কথা, তখন দোয়ারকা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে শহর থেকে আসবার সোজা রাস্তায় নয়, উল্টো দিক থেকে চোরের মত এসে দাঁড়াল।

দেরী করার জন্মে তাকে বকুনি দেব কি, তার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখেই অবাক। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করার পর যা জানলাম তাতে জীবনের আরেকটা অহেতুক অন্যায় অত্যাচারের দিকের প্রথম পরিচয় পেয়ে নিরুপায় মনের জ্বালায় শুধু হতাশ দিশাহারাই হতে হল।

দোয়ারকার রেলকলোনিতে এসে আমাদের রামলীলায় হনুমান সাজা হবে না। হবে না সিপাইজির জন্যে, সেই কথাই সে দুঃখের সঙ্গে আমাদের জানিয়ে যেতে লুকিয়ে অন্য দিক দিয়ে এসেছে।

সিপাইজি যার নাম সে বা আমাদের অচেনা নয়। নামটা সিপাইজি হলেও সে মিলিটারী সিপাই নয়, এই রেলকলোনির একজন পাহারাদার। কলোনিতে স্টেশন-

মাস্টার মশাইয়ের বাসাতেই দারোয়ান হিসেবে থাকে আর রেলকলোনিতে কোম্পানির সম্পত্তির তদারকী করে।

বেঁটেখাটো কিন্তু বেশ জবরদস্ত মজবুত চেহারা। স্টেশনমাস্টারের বাসার বাইরে তার ডনবৈঠক দেওয়া আর মুগুরভাঁজা দেখতে আমরা কখনো কখনো গেছি, কিন্তু তার যে এত গুণ তা ভাবতে পারিনি।

দোয়ারকার কাছে শুনে এইটুকু বুঝেছিলাম যে নামে যে যা ই হোক রেলকলোনির আসল হর্তাকর্তা সিপাইজি। তাকে খুশি না করে ফেরিওয়ালা ব্যাপারী থেকে ভিখিরী পর্যন্ত কেউ এ এলাকায় স্বচ্ছন্দে যেতে আসতে পারে না। তাকে খুশি করা আবার সোজা নয়। কলোনিতে আসতে যেতে নজরানা তো দিতেই হয়, এর ওপর সে যখন তখন শহরে গিয়েও জুলুম করে। দোয়ারকাদের দোকানে গিয়ে সে বিনা পয়সায় তার সেবার আটা আর ঘি দাবি করে। দোয়ারকার বাবা এ দাবি মানেননি বলেই সিপাইজি তাদের ওপর খাপ্পা।

দোয়ারকা সেদিন সকালে কলোনির এক বাসায় ফরমাশী সওদা বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিতে এসেছিল। সকালে ও বিকেলে অন্তত তাই ছিল দস্তুর।

আসবার সময় সিপাইজির সামনে না পড়ার জন্যেই নির্বিঘ্নেই আসতে পেরেছে। সিপাইজি বাজারের অনেক দোকানেই অমন জুলুম করে। তাদের মত সামান্য দোকানের কথা হয়তো ভুলেই গেছে আশা করেছে দোয়ারকা।

ভুল ভেঙেছে ফেরবার সময়। সিপাইজির দৃষ্টি তখন এড়ানো যায়নি। লাঞ্ছনা যা করবার সিপাইজি তা তো করেইছে ছেড়ে দেবার সময় তার ওপর শাসিয়ে বলে দিয়েছে যে যা সে চেয়ে এসেছিল তার সেবায় সেই ঘিউ আর আটা না নিয়ে কখনো এ এলাকায় ঢুকলে সে দোয়ারকার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে।

কিন্তু দোয়ারকাদের দোকান এমনিতেই অচল হয়ে এসেছে। এ ঘুষ সে যোগাবে কোথা থেকে! রামলালায় হনুমান সাজা তাই আর তার হবে না। আমরা যেন অন্য কাউকে খুঁজে নিই।

অন্য কাউকে আর আমরা খুঁজিনি। খোঁজার ইচ্ছেই হয়নি। রামলীলাই আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

মনের মধ্যে তখন একটা অক্ষম রাগের জ্বালা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। স্টেশন-মাস্টার মশাইয়ের বাসার কাছ দিয়ে যেতে সিপাইজিকে কোথাও দেখতে পেলে মনে হত পারলে তাকে যেন মেরেই দিতাম। বীরুমামাই একবার তাকে ঢিল মারবার কথাও বলেছিল।

কিন্তু সে তো শুধু ভুয়ো কল্পনা। সিপাইজির সত্যিকার শাস্তিও তাতে হবে না। বড়দের কাউকে মানে বীরুমামার বাবাকে বলে দিলে কিছু হয় কি না তাও ভেবেছি। কিন্তু সে বলা যে কতখানি নিষ্ফল কিছুদিন বাদেই আরো একটি ব্যাপারে তা গভীর লজ্জা ও ক্ষোভের সঙ্গে জানতে হল।

নলহাটিতে থাকতে আমার প্রথম জীবনের সেই আর এক সমস্ত মন-বিষিয়ে-দেওয়া অভিজ্ঞতা।

॥ পাঁচ ॥

অতীতের স্মৃতির সঙ্গে যা জড়ানো সে রকম সব জায়গা আবার দেখতে ইচ্ছা করে বোধ হয় সকলেরই। দেখলে কিন্তু অনেক সময়ে হতাশ হতে হয়। হতাশ না হলেও বেশ একটু বিস্মিত আর বিষণ্ণ।

সময়ে সব কিছুর স্বাভাবিক পরিবর্তন আছেই। তা ছাড়াও অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের বাস্তব যেন মিলতে চায় না। ছোটবেলার দেখা সব কিছুই যেন আরো বড় ছিল মনে হয়, আরো উজ্জ্বল আর রহস্যময়।

বড় হয়ে বয়স্ক চোখে দেখলে সেগুলো ছোট হয়ে গেছে মনে হয়, ছোট আর কেমন ম্লান।

অতীতের ক'টা জায়গাই বা আবার নতুন করে দেখার সুযোগ হয়। নিত্যকার যার সঙ্গে সম্বন্ধ সে রকম জায়গা হলে সেকাল আর একাল কখন কোথায় কিভাবে মিশ খেয়ে যায় তা টের পাওয়া যায় না। বড় বড় পরিবর্তনগুলো মনে করতে পারা যায় বটে, কিন্তু আর বিশেষ কিছু নয়। আয়নায় নিজের চেহারা দেখার মত। কৈশোর কি কি ধাপে যৌবনে পৌঁছেছে, আর যৌবন গিয়ে মিশেছে বার্ধক্যে তা স্পষ্ট করে কি মনে করা সম্ভব?

হঠাৎ পুরনো দিনের কোথাও অপ্রত্যাশিত ভাবে গিয়ে পড়লে কিন্তু পৃথিবীটা গুটিয়ে ছোট হয়ে যাবার একটা অনুভূতি হয়। মির্জাপুরে ঘটনাচক্রে একবার গিয়ে পড়ে সেই রেলওয়ে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডটা দেখবার সুযোগ হওয়ায় তাই বেশ অবাক আর হতাশ হয়েছিলাম। যে কম্পাউণ্ডটা আমার কাছে একটা অসীম তেপান্তরের সামিল ছিল সেটা কেমন করে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। ছোট আর ময়লা ও ম্লান নোংরা। নোংরা হওয়াটা হয়তো সময়ের যথার্থ হস্তাবলেপে কিন্তু ছোট হওয়াটা তো তা নয়। ওটার মধ্যে আছে দু'বয়সের চোখের দেখার ভিন্ন আলো।

মির্জাপুরের হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মত নলহাটির চেনা সব পরিবেশে আবার গিয়ে পৌঁছলে কি হত তাই ভাবি।

নলহাটিতে যাবার সুযোগ আর হয়নি। সেখানেও সময়ের হাতে অনেক কিছুর অদল বদল হয়ে গেছে নিশ্চয়। সে মস্ত জোড়া পাকুড় গাছের নিশানা দেওয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের কি দশা হয়েছে কে জানে! রেল স্টেশনটাও বদলে গেছে নিশ্চয়। মাত্র

একটি প্ল্যাটফর্মের নগণ্য স্টেশনটি প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বাড়িয়ে 'ওভারব্রীজ তুলে গণ্যমান্য কিছু যে হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু নলহাটি স্টেশনের যত পরিবর্তনই হয়ে থাক সেখানে গেলে হতাশা বিস্ময়ের চেয়ে একটি অনুভূতিই আমার মনে তীব্র হয়ে উঠবে জানি। সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানেও সেদিনকার সমস্ত মন বিষিয়ে দেওয়া একটি স্মৃতির ছাপ আজও মন থেকে মোছেনি।

যতদূর মনে পড়ছে তখন নলহাটি স্টেশনের একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম, আর তার একদিকেই মাত্র যাওয়া আসার গাড়ি থামে।

স্টেশনের পিছনে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে একটা উপরি লাইন পাতা ছিল বটে, কিন্তু সেটাতে বেশীর ভাগ সময় দু-চারটে ঢাকা মালগাড়ি বা খোলা ওয়াগন কখনো কখনো রাখা হত। যাত্রী ট্রেন নেহাত আপদ-বিপদের জরুরী অবস্থায় সে লাইনে চালান করা হত বোধহয়, কিন্তু আমার চোখে তেমন ঘটনা কখনো পড়েনি।

হেলাফেলায় ভুলে থাকা এই লাইনটাই ছিল আমাদের একটা খেলবার জায়গা। বিশেষ করে আমার কাছে ওই লাইন আর তাতে মাঝে মাঝে ফেলে রাখা ওয়াগন কি মালগাড়ির একটা অদম্য আকর্ষণ ছিল। কাউকে সঙ্গী না পেলে আমি একা একাই কখনো মালগাড়ি বা ওয়াগনের ভেতর উঠে, কখনো রেলের ওপর সার্কাসের দড়ির খেলায় ধরনে হেঁটে আমার নানারকম কল্পনার রাশ ছাড়তাম। রেলের লাইনের ওপর দিয়ে যতদূর সম্ভব নিচে পা না ফেলে হেঁটে যাওয়া ছিল সবচেয়ে পছন্দসই খেলা।

এই খেলা থেকেই ছেলেবেলায় সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম।

রমা না উমা, নামটা যার ঠিক মনে নেই, সেই মেয়েটি আর আমি এক ছুটির বিকেলে স্টেশনের পিছন দিকের সেই উপরি লাইনের ওপর সার্কাসের মত হাঁটার খেলা খেলছিলাম। হঠাৎ দেখি মেয়েটি তার লাইন থেকে নেমে আমার কাছে চলে আসছে।

লাইনের ওপর হাঁটার পাল্লায় হেরে গেছে বলে তাকে দুয়ো দিতে গিয়ে তার নেমে আসবার কারণটা বুঝতে পারলাম। ওদিকের লাইনে আমাদের উল্টো দিক থেকে একটি অ্যাংলো ছেলে আর তাদের বাড়ির ছোকরা এক চাকর আমাদের মতই রেলের ওপর দিয়ে হাঁটার খেলায় মেতে আসছে।

ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও সে আমার অজানা নয়। রেলওয়েরই এক অ্যাংলো গার্ডের ছেলে। আমাদের রেলকম্পাউণ্ডের উল্টো দিকে স্টেশনের অন্য পারে তাদের ও আরো দু-একটি অ্যাংলো রেল-কর্মচারীর বাসা।

ছেলেটি প্রায় আমারই বয়সী ; তাকে তাদের ওই ছোকরা চাকরের সঙ্গে স্টেশনে ও তার আশেপাশে অনেকবারই দেখেছি। ওই চোখের দেখাই হয়েছে শুধু। তার বেশী কিছু হবার নয়। অ্যাংলোরা তখন নিজেদের দেশী লোকদের থেকে আলাদা করে রাখে। ছোটদের ভাবটাও সেই রকম। আমি তাকে দেখলেও ছেলেটি হয়তো আমাকে ভাল করে লক্ষ্যই করেনি।

এর আগে পর্যন্ত দেখা হলেও যে যার নিজের পথ নিয়েছি। সেদিন কিন্তু ছেলেটার কি এক বদখেয়াল হল। হঠাৎ নিজের লাইন ছেড়ে সে আমার লাইনটাতেই এল হাঁটতে। সেইসঙ্গে ছোকরা চাকরটাও তার পিছনে।

তখনও তারা বেশ একটু দূরেই আছে। আমার সঙ্গী মেয়েটি তখন তাদের দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে আমায় নেমে আসবার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে আরম্ভ করেছে।

এমনিতে নিজে থেকে লাইনটা ছেড়ে সরে যেতাম কিনা জানি না। কিন্তু মেয়েটির ওই সভয় অনুনয় বিনয়েই মনটা কেমন যেন বিগড়ে গেল। এই অকারণ জুলুমটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

লাইন না ছেড়ে সেখানেই গ্যাঁট হয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

ওদিকের অ্যাংলো ছেলেটি আর তার সঙ্গী চাকর তখন সমানে এগিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গিনী কিছুতে আমায় নামাতে না পেরে এবার ছুটে পালিয়েই গেল।

মনের ভেতর দ্বিধা হয়তো হয়েছিল কিন্তু ভেতরের তীব্র একটা অপমান-বোধে কিছুতেই নিজের লাইনটা ছাড়তে পারিনি।

অ্যাংলো ছেলেটি আমায় যেন দেখতে পায়নি এই ভাবে আমার কাছাকাছি পর্যন্ত এসে হঠাৎ মুখ তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, এই হটো!

যতদূর মনে পড়ছে উত্তর না দিয়ে শক্ত হয়েই দাড়িয়ে ছিলাম।

ছেলেটি আর একবার অবজ্ঞার স্বরে হুকুম করেও আমায় নামাতে না পেরে এগিয়ে এসে আমায় ধাক্কা দিলে। তৈরিই ছিলাম বলে সে ধাক্কায় পড়ে যাইনি। তার বদলে তাকেই সজোরে একটা পাল্টা ধাক্কা দিলাম।

ঠিক মত শক্তি পরীক্ষা হলে ছেলেটির সঙ্গে আমি পারতাম বলে মনে হয় না।

মাথায় প্রায় আমার সমান হলেও অনেক মজবুত হৃষ্টপুষ্ট তার চেহারা।

কিন্তু আমি তখন অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে আর অপমানের জ্বালায় মরিয়া হয়ে গেছি। ছেলেটি তার ওপর আমার মত একটা দেশী ছেলের কাছ থেকে ওরকম পাল্টা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতও ছিল না।

আমার প্রাণপণে দেওয়া অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় তাই সে লাইনের ওপরেই উল্টে পড়ে গেল। বেকায়দায় পড়ার দরুন তার পায়ের একটা জায়গা তখন দু'লাইনের ভেতরে ও বাইরে ফেলা পাথরকুচিতে কেটে একটু রক্তপাতও হয়েছে।

এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। নিজেই একটু হতভম্ব হয়ে যখন আমি কি করব বুঝতে পারছি না আর অ্যাংলো ছেলেটি যখন আমার ধাক্কার শোধ নেবার জন্যে লাইনের ওপর থেকে রাগে রাঙা হয়ে ওঠা মুখে উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন তার ছোকরা চাকরটা ছুটে এসে সমস্ত ব্যাপারটার রঙ বদলে দিলে। একবার তার ক্ষুদে মনিবের পায়ের কাটাটা দেখে সে তার নিজস্ব কদর্য ভাষায় আমায় গাল দিতে দিতে স্টেশনের অন্য দিকে ছুটল।

অ্যাংলো ছেলেটি আমায় পাল্টা আঘাত দেবার জন্যেই তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আক্রমণ করা আর তার হল না। তার বদলে চাকরটার পিছনেই তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাকে ছুটতে দেখলাম।

ঘটনাটার এ পরিণতিতে একটু অবাক হলেও মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলে আমার সঙ্গিনী মেয়েটির খোঁজ করলাম এবার। খোঁজা অবশ্য বৃথাই। সে তখন এ তল্লাটেই নেই।

এই বিশ্রী ব্যাপারটার পর একলা লাইনের ওপর হাঁটার আর উৎসাহ না পেয়ে যখন বাড়ি ফিরে যেতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম দূর থেকে সেই ছোকরা চাকরটার গলা শুনে। তারপর সেদিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে বুকটা সত্যিই কেঁপে উঠল।

ছোকরা চাকরটির সঙ্গে এবার আর সেই অ্যাংলো ছেলেটি নয়, তার বাবা রেলওয়ে গার্ডই প্রায় দৌড়ে আসছে।

ছোকরা চাকরটা দূর থেকেই আমায় হাত তুলে দেখিয়ে চেঁচাচ্ছিল।

চেষ্টা করলে পালাতে পারতাম কিনা জানি না, কিন্তু পালাইনি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম।

অ্যাংলো ছেলেটির বাবা রেলওয়ে গার্ড প্রথমে এসেই কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে আমার কান ধরে টেনে একটা চড় মারলে। তারপর হিন্দী আর ইংরেজিতে গালাগালি দিতে আর কিছু বাকি রাখলে না। শুনলেও তা পুরোপুরি বোঝার মত অবস্থা তখন আর আমার নয়। সমস্ত কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

চড় খেয়ে লাইনের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। অ্যাংলো ছেলেটির মতই হাত পা পাথরকুচিতে কেটে গিয়েছিল। বেশ একটু কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়েও কিন্তু কাঁদিনি।

এই অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহায় নিষ্ফল রাগে আর ক্ষোভে ভেতর থেকে একটা আগুনের হল্কাই তখন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

জলের বদলে আমার চোখে সেই রকম কিছু জ্বালার আভাস দেখেই গার্ড সাহেবের রাগ বোধহয় আরো চড়ে গিয়েছিল। তার আরো বেশ কয়েকটা চড়-চাপড় খেয়েও চোখের জল কিন্তু বার হয়নি। গার্ডসাহেবের চলে যাবার পরও গুম হয়ে সেখানেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। গার্ডসাহেবের মারের চেয়েও মনিবের সঙ্গে চলে যাবার সময় ছোকরা চাকরটার উল্লাস আর মুখ ভেংচিই অসহ্য লেগেছিল আরো বেশী।

সত্যি কথা বলতে গেলে যার সঙ্গে ঠেলাঠেলি হয়েছিল সেই অ্যাংলো ছেলেটির ওপর তখন কোন রাগ বা আক্রোশ আর ছিল না। তখন না ভাবলেও পরে অনেক বারই মনে হয়েছে যে সে ছেলেটির মন বোধহয় খুব ছোট ছিল না। মারামারির কথা নিয়ে সে সম্ভবত তার বাবার কাছে নালিশ করতেই চায়নি আর সেইজন্যেই ছোকরা চাকরটাকে বাড়ির দিকে যেতে দেখে আমার ধাক্কার শোধ না নিয়েই চাকরকে ডাকতে তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ স্টেশনের বাইরে এদিকে ওদিকে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সেদিন বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। প্রথমটা কেউ পাছে কিছু জেনে ফেলে এইটিই ছিল ভয়। সকলের কাছে ঘটনাটা গোপন করতে চেয়েছিলাম।

সেটা কিন্তু আর সম্ভব হয়নি। সঙ্গিনী মেয়েটি আগেই বাসায় এসে সব কথা জানিয়ে দিয়েছে। আমার গালে মুখে চাপড়ের দাগ ও শরীরের কাটাকুটিও লুকোবার নয়। আর সবার আগে বীরুমামাই তা লক্ষ্য করে হৈচৈ করেছে।

আগে থেকেই ব্যাপারটার একটা বিবরণ পেয়ে বাড়ির আবহাওয়া বেশ একটু ভারী মনে হয়েছে। তিরস্কার পাইনি কিন্তু সুবিচার সহানুভূতি নয়।

অভিমানে ক্ষোভে সত্য ঘটনাটা তখন জানাবার চেষ্টা করেছি। প্রতিকারের আশায় ক্ষুব্ধ নালিশটা বিশেষ করে বীরুর বাবাকেই জানিয়েছি। মনের মধ্যে ওই বয়সের নির্বুদ্ধিতার যুক্তিটা বোধহয় এই ছিল যে উনি যখন রেলেই কাজ করেন গার্ডসাহেবের অন্যায় অত্যাচারের একটা বিহিত নিশ্চয় করতে পারবেন। নালিশটা নিষ্ফলই হয়েছে। সুবিচারের বদলে সাহেবের ছেলেদের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার জন্যে ভর্ৎসনাই পেয়েছি এবার। আমাকেই স্টেশনেই খেলতে যেতে মানা করা হয়েছে।

সে নিষেধ অবশ্য কয়েকদিন মাত্র মেনেছিলাম। তারপর খেয়াল খুশিমত স্টেশনে খেলা করতে গিয়েছি। কিন্তু একটা অক্ষম রাগে আর হতাশায় সেই প্রথম আমার

শিশুমনের আকাশ কেমন কালো হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভেতর যে জ্বলন্ত দাগটা পড়েছিল সারা জীবনে তা মোছেনি।

অ্যাংলো গার্ডের ছেলেটির গায়ের রঙ যে আমাদের থেকে আলাদা সেটা কাউকে বলে দেবার দরকার ছিল না, কিন্তু তারই জোরে সাহেবের ছেলে হিসেবে তার বেলা ন্যায় অন্যায়ের বিচারও যে আলাদা এই নতুন তিক্ত শিক্ষাটা জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধে প্রথম অস্পষ্ট সন্দেহ জাগিয়েছিল।

সাহেব বাঙালী, উচিত অনুচিত, ভীরুতা সাহস, এসব কথাগুলো নতুন মানে নিয়ে মনটা শুধু বিষাক্তই নয় বিভ্রান্তও করে দিয়েছিল।

এই ঘটনার পর নলহাটিতে খুব বেশী দিন আর ছিলাম না। কলকাতায় আমাদের জন্যে বাড়িটা তখন কেনা হয়ে গেছে। বড়দের আলোচনা শুনে বুঝেছি আমাদের নলহাটি ছেড়ে কলকাতা যেতে আর খুব দেরী নেই।

শুনে স্বাভাবিক উত্তেজনা একটা বোধ করলেও খুব কি খুশি হয়েছিলাম? নলহাটির মত তিক্ত স্মৃতির জায়গা ছেড়ে যাবার কথায় যতটা হবার তা বোধহয় হইনি। তার কারণ নলহাটির সবই তো তিক্ত নয়, মধুর স্মৃতিও ছিল যথেষ্ট। জীবনের অন্ধকার কালো কিছু দিক সম্বন্ধে প্রথম যেমন সেখানে সচেতন হয়েছি তেমনি সানন্দে ও সকৌতুকে স্মরণ করে রাখবার মত কিছু অভিজ্ঞতাও আছে।

সকৌতুকে স্মরণ করবার ঘটনা বীরুমামার আমাকে বই লিখতে শেখানো। বই মানে অবশ্য উপন্যাস, তখন যা নভেল নামেই চলত।

বীরুমামা অনেক বিষয়েই আমার নেতা। চিড়িয়াখানা পরিকল্পনার ব্যাপারে যেমন, তেমনি ভাঙা থার্মোমিটারের খাপ জোগাড় করে তার মুখে সুকৌশলে কর্ক আর নিব গুঁজে ফাউন্টেন পেন বানিয়ে সে আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

তার নতুন কীর্তিতে কিন্তু আগেকার সব বাহাদুরী ম্লান হয়ে গেল।

একদিন খাতা কলম নিয়ে আমায় ডেকে সে বললে, আয়। আমরা বই লিখব।

বই! বই লিখব আমরা! আমি তো হতভম্ব। বই যে লেখা যায়, আর মানুষেই লেখে এই ভাবনাটাই কখনো মাথায় আসেনি।

বীরুমামা আমার অজ্ঞান তিমির দূর করে বই কেমন করে লিখতে হবে সব আমায় বুঝিয়ে দিলে।

তার কাছে জানলাম বই মানে নভেল, বাড়ির গুরুজনেরা অবসর পেলে যা পড়ে; আর সে বই লিখতে হলে প্রায় এইরকম ভাবে শুরু করতে হয়;—কলিকাতা নগরীর নির্জন স্বল্পালোকিত একটি গলির জরাজীর্ণ একটি অট্টালিকার অন্ধকার একটি প্রকোষ্ঠে

গ্রীষ্মের এক নিশীথে এই উপাখ্যানের প্রধান দুই পাত্রপাত্রীর মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ কথোপকথন হইতেছিল,—

ভাষণটা হুবহু অক্ষরে অক্ষরে হয়তো মিলবে না, কিন্তু মোটামুটি কথাগুলো মনের মধ্যে গাঁথা আছে বলে আদলটা ওই থেকেই পাওয়া যাবে।

প্রাচীন কোন বটবৃক্ষের ছায়ায় রচিত ও প্রকাশিত কোন একটা বই থেকে বীরুমামা বই লেখা শুরু করবার এ বাঁধা গৎটি পেয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু এমন একটা সুবিধে ও সাহায্য পেয়েও সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তন তখনও হয়নি বীরুমামার সঙ্গে আরেক খেয়ালে তখন আমরা মেতে উঠেছি। কাগজের ওপর কিছু লেখার নয়, খেয়ালটা কাগজ ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জমাবার।

চিরকালের মত নলহাটি ছেড়ে যাওয়ার বছর খানেক আগে কলকাতায় একবার ঘুরে আসবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সঙ্গী বীরুমামা অবশ্য। নিয়ে গিয়েছিলেন তারই বাবা।

সেই যাওয়ার উত্তেজনাতেই আমাদের ওই নতুন হুজুকের তোড়জোড়। হুজুকটা হল এই যে নলহাটি থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাওয়ার সমস্ত রাস্তার ট্রেনের লাইনে জানালা থেকে আমরা কাগজ কুচি ছড়িয়ে যাব।

কিছুদিন আগে রামপুরহাটের কাছের একটি ছাউনির একদল গোরা সওয়ার আমাদের নলহাটির ওপর দিয়ে 'পেপার চেজ'-এর খেলা খেলে গিয়েছিল। দুজন সওয়ার প্রথমে নলহাটির মাঠ বন পাথুরে ডাঙার ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে থলে থেকে কাগজ কুচি ছড়াতে ছড়াতে কোথায় চলে গিয়েছিল। তার ঘণ্টা কয়েক বাদে আর এক দল সওয়ার এসেছিল সেই ছড়ানো কাগজকুচির চিহ্ন ধরে পথ চিনে আগের দুজনকে খুঁজতে।

খেলাটা আমাদের খুবই উত্তেজিত করেছিল। কাগজকুচি ছড়াবার মতলবটা তাই থেকেই পেয়েছিলাম। বাহন শুধু ঘোড়ার বদলে ট্রেন। দুজনে কল্পনা করেছিলাম যে নলহাটি থেকে কলকাতা পর্যন্ত সারা রাস্তা আমাদের কাগজকুচিতে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অনুনয়, বিনয়, কান্নাকাটি করে দু-দুটি বড় বড় থলে কাগজ কুচিতে ভর্তি করে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

কাগজ কুচির চিহ্ন তো নয়ই, সে থলে দুটিও রামপুরহাটের পর বেশী দূর পৌঁছয়নি। সাধু সঙ্কল্পের অত বিঘ্ন থাকে তখন কি জানি! জানালা দিয়ে আমাদের কাগজকুচি ছড়াতে দেখে কামরার ভেতরের যাত্রীরা প্রথমে সবাই মজা পেয়ে দুটি খেয়ালী শিশুকে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু বাইরের হাওয়ার ঝাপটায় সে কাগজকুচির

ঝাঁক ভেতরে এসে চোখে মুখে পড়ে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করার পর তাঁদের সে উদার প্রসন্নতা আর দেখা যায়নি। তাঁদের অল্পবিস্তর অনুযোগের পর ভেতরে উড়ে আস। বন্ধ করবার জন্যে আমরা জানালা দিয়ে বাইরে হাত ঝুলিয়ে কাগজকুচির মুঠো ছাড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অবাধ্য বেয়াড়া কাগজ কুচিগুলো যেন আমাদের জব্দ করবার জন্যেই আবার ভেতরেই উড়ে এসেছে।

কামরার অন্য যাত্রীরা সত্যি সত্যি খুব বিরক্ত হয়তো হননি, কিন্তু দাদা মানে বীরুমামার বাবা আর আমাদের প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত মনে করেননি, রামপুরহাট পার হবার পর আমরা দুজনে যখন সঙ্গে-আনা খাবার খেতে ব্যস্ত তখন আমাদের অন্য-মনস্কতা সুযোগে বসবার বেঞ্চের ওপর রাখা দুটি থলিই নিশ্চয় বাইরে ফেলে দিয়েছেন।

খাওয়া শেষ করার পর হাত মুখ ধুয়ে এসে থলি দুটি না পেয়ে আমাদের কলকাতা যাবার উৎসাহই চলে গেছে। থলি দুটি অদৃশ্য হবার রহস্য সম্বন্ধে কামরার বয়স্করা নানারকম যেসব কৈফিয়ত দিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছে তাতে আরো বেশী রাগ ও দুঃখ পেয়েছে। ছেলেমানুষ বলে আমাদের ঠকাতে চাওয়াতেই অপমানবোধটা তীব্র হয়েছে।

কাগজকুচির থলে হারাবার শোকটা ভেতরে থাকলেও কলকাতায় সেই প্রথম পা দেওয়ার বিস্ময়ে উত্তেজনায় তা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

না, ঘোড়ার ট্রামের কলকাতা নয়, কিন্তু উনিশশ' নয় কি দশ সালের সে কলকাতার চেহারাই আলাদা। আজকের দিনের ওই বয়সের শিশুর পক্ষে সেটা কল্পনা করাই শক্ত।

ইলেকট্রিক ট্রাম আছে ঠিকই কিন্তু রাস্তায় মোটর কি লরি ট্রাকের চিহ্ন নেই, নেই ভিড় ঠেলাঠেলি। বিজলী নয়, রাস্তার রাস্তায় শুধু গ্যাসের আলো। অন্যের মুখে শুনে বা বই পড়ে এ কলকাতার বাইরের ছবি ও বিবরণ যতটাই পাওয়া যাক, সেকালে সেখানে বাস করবার অনুভূতিটা সহজে আয়ত্ত করবার নয়। মাত্র তেষট্টি-চৌষট্টি বছর নয়, মাঝখানে যেন অপার সময়ের ব্যবধান।

॥ ছয় ॥

চিরকালের মত নলহাটি ছেড়ে আসবার পর সেখানকার আরো একটি স্মৃতি, মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে টের পাই।

সে স্মৃতি প্রথম যাত্রা দেখার।

আগে ছিলাম তখনকার পশ্চিমের এক শুকনো রসকষহীন শহরে। সেখানে রেলওয়ের ফিরিঙ্গি কলোনিতে প্রথম একদিন বায়োস্কোপ দেখা ছাড়া আমার জীবনে ওই ধরনের আমোদ-প্রমোদের সুযোগ আর আসেনি।

নলহাটিতে এসে রামলীলা দেখেছি ঠিকই কিন্তু যাত্রার সঙ্গে তার বেশ কিছুটা তফাত। রামলীলা ভক্তির রসে এমন করে মাখানো, তার দর্শকদের মধ্যে পূজারীর ভাব ও ভঙ্গি এতটা প্রধান যে তাতে কল্পনার জগৎটা ঠিক মত খুলতে পারেনি।

যাত্রা কিন্তু সেই ছোটবেলার মনে একেবারে অভাবিত রহস্য বিস্ময় রোমাঞ্চের শিহরণ এনেছে। একটা শামিয়ানার তলায় শুধু একরাশ মানুষের জটলা নয়, অবাক রূপকথার স্বপ্নে সাজানো রাজ্য।

যাত্রার আসর হয়েছিল রেলকলোনি ছাড়িয়ে বাজারের ভেতরকার একটা ঘেরা মাঠে। সেটা আমাদের কাছে প্রায় নিষিদ্ধ জায়গা, বিশেষত রাত্রে।

কিন্তু যাত্রা যে রাত্রেই হয়।

রেলকলোনির বাসা থেকে তার বাজনা শুনতে পাই। বাঁশি আর বেহালা, মৃদঙ্গ আর ক্ল্যারিওনেটের মেলানো ঐকতান যেন পরীদের গলার ঝঙ্কারের মত রাত্রের বাতাসে নেশা ধরিয়ে, বাজারের চৌহদ্দির বেড়া, কাঁটা ঝোপে ভরা উদোম একটা মাঠ, তারপর তখনকার দিনের কুলি-কামিনদের ঝোপড়ির জটলা ছাড়িয়ে, জোড়া পাকুড় গাছের মাথায় জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে একটু যেন কাঁপিয়ে আমাদের কলোনির বাসার জানালায় এসে ডাক দেয়।

সে ডাকে উতলা হয়ে প্রাণটা ছটফট করে উঠলেও উপায় কিছু নেই।

শীরুমামা ভাল থাকলে অবশ্য ভাবনার কিছু ছিল না।

যত দূর আর যত রাতই হোক জেদ ধরে যাবার ব্যবস্থা সে করতই।

কিন্তু ভাগ্য দোষে যাত্রা আরম্ভ হবার সময়টাতেই সে দারুণ জ্বরে পড়েছে।

বিছানা ছেড়ে ওঠা তার বারণ। সে বারণ সে অগ্রাহ্য করবে এমন ক্ষমতাই তার নেই।

বীরুমামা সঙ্গে না হলে কে-ই বা একলা আমায় যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবে। দাদা মানে বীরুমামার বাবার ওসব ব্যাপারে কোন উৎসাহই নেই। তাঁকে সেজন্যে ধরাধরি করবার কথাও আমার মনে হয়নি।

যাত্রা দেখার আশা তাই আর আমার ছিল না।

শহরে যাত্রা আসার আয়োজনের পর থেকেই দিনের বেলা বাজারের মাঠে এক-আধবার সুবিধে মত ঘুরে এসেছি। আয়োজন যা দেখেছি তাতে অবশ্য খুব উৎসাহিত হবার মত কিছু না পাবারই কথা। মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় অনেকগুলো তক্তপোষ যোগাড় করে একটা উঁচু মাচার মত বানানো হয়েছে। তার চারধারে বাঁশের খুঁটিতে রঙীন ন্যাকড়া জড়ানো দড়ি বেঁধে একটা ঘের দেওয়া। মাচার কাছাকাছি গণ্যমান্যদের জন্যে দু-একটা চেয়ার আর কিছু বেঞ্চি সাজানো হয়েছে বিশিষ্টদের জন্যে। তার বাইরে জনতার জন্যে মাটিতেই বসবার ব্যবস্থা।

এসব কিছু খুঁটিয়ে কি তখন লক্ষ্য করেছি! অবাক চোখে যা দেখতাম, তার সঙ্গে আপনা থেকে আনুষঙ্গিক যা ছাপ মনে পড়েছে তাই থেকেই তখনকার ছবিটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছি।

যাত্রার আঁসরের আয়োজনের যা যা দেখে আসতাম তারই গল্প করতাম অসুস্থ বীরুমামার কাছে। আমার সেই শুকনো বিবরণের ওপর রং ফলিয়ে যাত্রার রহস্য বিস্ময় যা সে ফুটিয়ে তুলত সমস্ত মনটা তাতে আরো হতাশ হয়ে উঠত।

রাত্রে যাত্রার আসরের বাজনা দূর থেকে ভেসে এলে অনেকদিন তাই বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারিনি। ঘুম না হলেও সাড়াশব্দ বিশেষ কিছু দিতাম না। কিন্তু মার চোখে কিছুই লুকোন থাকে না। নিঃশব্দে আমার অস্থিরতাটা লক্ষ্য করে মা একদিন যা করলেন তা কিন্তু একেবারে আমার কল্পনাতীত।

যাত্রার সেটা বোধহয় তৃতীয় রাত। আরম্ভ হবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত দূরের বাজনা আমায় জাগিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ মা আমাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, যাত্রা দেখতে যাবি?

মার কথাটার মানে বুঝতেই প্রথমটা আমার কষ্ট হয়েছে। বোঝবার পর একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। মা আমাকে যাত্রায় যেতে চাই কি না জিজ্ঞাসা করছেন! কিন্তু এ জিজ্ঞাসা তো বৃথা। যেতে চাইলেও যাব কি করে?

মা-ই উপায়টার ইঙ্গিত দিলেন। বললেন, একলা যেতে পারবি এখান থেকে যাত্রা পর্যন্ত?

ব্যাপারটা সত্যিই অসম্ভবের সীমানায়! এই অন্ধকার রাত্রে নির্জন মাঠ বন পেরিয়ে পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছেলেব পক্ষে এতখানি একলা যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

ভাবতে আমিও পারতাম না। কিন্তু যেতে পারব কি না মার এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই এমন একটা প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছিল যাতে কিছু আর না ভেবেই মাথা নেড়ে যাবার সাহস আছে বলে জানিয়েছিলাম। আব জামা জুতো পরবার পর নিজেই বাইরের দরজা খুলে মা আমায় রওনা করে দিয়েছিলেন।

প্রথম যাত্রা দেখা মন থেকে যেমন মোছবার নয়, সেদিনের সেই অন্ধকার রাত্রে যাত্রার আসর পর্যন্ত একলা যাওয়াও তেমনি।

বড রাস্তা দিয়ে ঘুরেও বাজারের যাত্রার আসরে যাওয়া যেত। কিন্তু তাতে বেশ একটু ঘুর আর দূর হয়। সে রাস্তাও একেবারে অন্ধকার জনমানবহীন।

প্রায় চোখ কান বুজে তাই যাত্রার বাজনার শব্দটুকুর নিশানা ধরে মাঠ বন বস্তির ভেতর দিয়ে ছুটে গেছি।

যত কাছে পৌঁছেছি উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে ভয় তত ভেঙে গেছে।

আসরের কাছে তো লোকে লোকারণ্য। দিনের বেলা যেখানে ক'টা ভাঙাচোরা তক্তপোষ দেখেছি এখন সেখানে যেন স্বপ্নপুরী। পেট্রোম্যাক্স তখনও চালু হয়েছে কি না মনে নেই। কারবাইডের বাতির সঙ্গে আব কি রকম এক উজ্জ্বল ঝোলানো বাতিতে মাঝখানের মঞ্চটাকে ঝলমল করতে দেখেছিলাম। ঝলমল শুধু অবশ্য আলোর রোশনাইয়ে নয, যাত্রা যারা করছে তাদের চুম্‌কি বসানো জরি মখমলের পোশাকেও।

মঞ্চটাকে ঘিরে একেবারে ঠাসাঠাসি ভিড। শহর শুদ্ধ লোক বুঝি মাটিতে বসে তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখছে। তারই ভেতর কোথায় যে বসেছিলাম তা খেয়ালও করিনি। দুটো চোখ আর কান ছাড়া আর কোন কিছুর সাড়া যেন তখন নেই। পরে জেনেছি পালাটা ছিল—জনা। দলটার নাম সত্যম্বর অপেরা গোছের কিছু হবে।

তখনও যাত্রায় জুড়ির চল ছিল। এক একটা অঙ্ক শেষ হলে চারধারে চারজন জুডি উঠে যাত্রার পালায় যা হয়ে গেল ও যা এবার হবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কসরতে তা গেয়ে শোনাতেন। তাদের পরনে থাকত চোগা চাপকান আর তার ওপর অজস্র সোনা রূপোর মেডেল আঁটা।

জুড়িদের কোরাস গানের রেওয়াজ কবে কি ভাবে আরম্ভ হয়েছিল জানি না। এককালে তার সমাদরও নিশ্চয়ই ছিল নইলে জুড়িরা নিজে থেকেই অত মেডেল গড়িয়ে জামায় আঁটত বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার সেই ছোটবেলায় দেখা যাত্রার সময়েই জুড়ির গান তার কদর হারিয়েছে। জুড়ির গানের সময়টা তখন এক ধরনের বিরতি। নড়ে চড়ে একটু হাত পা ছড়ানো, পান বিড়ি খাওয়া গল্প গাছা করার জন্যই সেটা বরাদ্দ।

সেই বিরতির সময়েই স্টেশনের একজন কর্মচারী, বীরুমামার বাবার সহকারী ডাকবাবু আমায় দেখতে পেয়ে স্নেহভরে সামনের দিকে তাঁর সীটের পাশে নিয়ে গিয়ে বসান। রমা না উমা যার নাম, সেই মেয়েটিও সেখানে তখন বসে আছে।

যাত্রা ভাঙতে প্রায় ভোর হয়ে গেছে। রমা না উমা তারই মধ্যে কখন তার বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এক ফোঁটা ঘুম কিন্তু আমার চোখে আসেনি। সারাক্ষণ প্রায় নিস্পন্দ হয়ে বসে যাত্রা শুনতে শুনতে সেই পালার মধ্যেই যেন পুরোপুরি হারিয়ে গেছি।

কল্পনায় মিথ্যে করে সাজানো একটা জগতও চোখের ওপর একেবারে সত্য হয়ে উঠে সব কিছু যে ভুলিয়ে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা জীবনে সেই প্রথম।

সারা রাত ঘুম না হওয়ার ক্লান্তি যেন টেরই পাইনি। তার বদলে অন্য একটা আচ্ছন্নতা নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। সত্য আর কল্পনাকে আলাদা করে যেখানে চেনা যায় না, সেখানে গিয়ে পৌঁছবার একটা ঘোর। সে ঘোর অনেক কাল পর্যন্ত মনের ওপর গাঢ় হয়ে ছিল।

এরপরে দিনের বেলা যাত্রার দলের জনা, প্রবীর থেকে সমস্ত অভিনেতা ও নাচের সখীদের আসল চেহারা দেখবার পরও সে ঘোর কাটেনি। নামটা যার ঠিক মনে নেই সেই রমা না উমা মেয়েটিকেই বরং হঠাৎ যেন একটু নতুন চোখে একদিন দেখেছিলাম। জনা প্রবীর মদনমঞ্জরী সখীরা—যাত্রার পালার এই সকলের কল্পনার আভা লেগে সে যেন প্রথম একটা আলাদা মেয়ে হয়ে গিয়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে।

লিখে বোঝাতে গিয়ে এখনো যেখানে কথায় কুলোচ্ছে না, সেখানে যেমন যতটুকু লিখেছি, তেমন ভাবে ততটুকুও নিজের মনের রূপান্তর কি সেদিন ধরতে পেরেছিলাম! মোটেই না।

তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে যাত্রার পালায় কল্পনার জগতের চাক্ষুষ একটা চেহারা দেখবার পর নিজের মনের অনেক অজানা লুকোনো মহল সম্বন্ধে প্রথম বোধটা

যেন জাগতে শুরু করেছিল। মিথ্যেই পথ দেখিয়েছিল সত্যের গূঢ় গভীর রহস্যের, কথাটা এ ভাবেও বলা যায়।

নলহাটি ছেড়ে কলকাতায় এলাম। কলকাতা মানে ভবানীপুরের শেষ প্রান্তে একটা দুখিনী রাস্তার সেকেলে একটা পুরানো একতলা বাড়ি। এই বাড়িটিই আমাদের জন্যে কেনা হয়েছে। পিছনে প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল তুলে পাহারা দেওয়া একতলা বাড়ি। সামনে টিনের চালের একটা আলাদা বাসা। সে বাড়ির চেহারা একটু আধটু বদলেছে, কিন্তু সামনের ইট চুন বালি সুরকি বিক্রির সারি সারি গোলা শোভিত সুরকির কল নিনাদিত রাস্তাটির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়নি ওপারের জেলখানারও। রাস্তা দিয়ে বলদ গাড়ির বদলে এখন শুধু লরির বহর যায়। আর বুজে-আসা আদিগঙ্গা বেশ কিছু খোঁড়াখুঁড়ি সত্ত্বেও নদীর বদলে নালার ধর্মই পালন করে। মানুষ বেড়েছে বহু গুণ, বাড়ি-ঘর কিছু নতুন উঠেছে, কিছু পুরোন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পাড়াটার চরিত্র যেন বদলায়নি।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই জীবনের প্রথম সত্যকার শোক পেলাম। কালাজ্বরের ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সেই রোগেই মা মারা গেলেন।

পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল বলতে পারলে সাহিত্যের দিক দিয়ে ভাল শোনাত, কিন্তু মনের অবস্থা সত্যি যা হয়েছিল তা ওই মামুলী ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

বেদনা হতাশা বিমূঢ়তা যা অনুভব করেছিলাম তা মনের এত গভীরে যে সব সময়ে স্পষ্ট করে টেরও পেতাম না। দিদিমাই তাঁর সতর্ক স্নেহে তা পেতে দেননি। তাছাড়া ছেলেবেলার মন বোধহয় জীবনের বিধানেই একটু বেশিরকম সলিলধর্মী হয়। সূক্ষ্মতম আঘাত যেমন তার বাজে তেমনি অতি নিদারুণ আঘাত তা নিঃশব্দে নিজের মধ্যে তলিয়ে দিতে পারে।

কলকাতায় আসবার পরই নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি। বীরুমামাও একই স্কুলে ভর্তি হয়েই আমার সঙ্গেই আছে। স্কুলে ও কাছাকাছি পাড়ায় নতুন বন্ধু বান্ধবও হয়েছে।

এই সব নিয়ে ভুলে থাকার মধ্যে ভেতরের গভীর একটা যন্ত্রণা মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক রকম পাগলামি হয়ে প্রকাশ হত।

আমাদের রাস্তায় আদিগঙ্গার ধারে অনেকগুলি স্নানের ঘাট। একদিন কিসের হাফ হলিডেতে স্কুল থেকে ফেরার সময় একটি ঘাট থেকে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে বহুদূর পর্যন্ত অবুঝ আকুলতায় তাঁর পিছু পিছু গিয়েছিলাম মনে আছে। মা বলে যাকে অনুসরণ করেছিলাম, মার সঙ্গে তাঁর খুব যে মিল ছিল তা নয়। তাঁর সঙ্গে

আরো দুজন মহিলা আর ছোট বড জনতিনেক ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলেমেয়েরা হয়তো তাঁরই সন্তান।

এ সব কথা মনেই না ওঠবার মত অবোধ তখন ছিলাম না, তবু ভেতরের হতাশ ব্যাকুলতায় মনের ওই যুক্তিতর্কের দিকটা যেন অসাড করে দিয়ে একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারাতে দিয়েছিলাম। মনে মনে কল্পনা করেছিলাম, নতুন চেহারা পোশাকে লুকিয়ে থাকলেও মা হয়তো হঠাৎ আমাকে দেখে চিনতে পেবে চমকে উঠে কাছে ডাকবে।

এ অলীক স্বপ্নে কিছুক্ষণ যত তৃপ্তিই থাক, শেষ পর্যন্ত তা ভাঙাব যন্ত্রণা নিদারুণ।

এ ধরনের অবুঝ পাগলামি তাই দু একবাবেব বেশী কবিনি।

স্কুল আর বাইরেব জীবনেব কৌতূহল আব উত্তেজনায় তখন মনের পাপডিগুলো খুলতে খুলতে পৃথিবাটাকে বড করে দিতে শুরু করেছে।

নিজেব ভাগ্যটা আমার খুব ভাল বলতে ইচ্ছে কবে। ছেলেবেলা থেকেই কিছু বেশ সাধাবণ মাপ-ছাডানো মানুষেব সঙ্গে আমার পবিচয় হযেছে। আমি যা বিরল মনে কবছি সে-রকম সৌভাগ্য হযতো অনেকেরই হয। তা হয হোক, আমারটার দাম তাতে আমার কাছে কমে যাবে না।

স্কুলের জীবনের প্রথম দিক থেকে দুজন সহপাঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

তাদের মধ্যে একজন সপ্তম শ্রেণীতেই স্কুলে এসে ভর্তি হল। ভর্তি হওয়ার দিন থেকেই ক্লাসের সে এক কৌতূহল বিস্ময়েব বস্তু। চেহারা চালচলন সব কিছুই তার সাধারণ মাপ ছাডানো। আমাদের ক্লাসের তুলনায তার সেই বয়সেই রীতিমত গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটা প্রথমেই চোখে না পডে পারে না। মাথাটা যেমন প্রকাণ্ড তার ওপর সজারুব কাঁটার মত খাডা খাডা ঘন চুলগুলোও তেমনি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সে চুল অনেক কসরৎ করেও সভ্যভব্য সাজে বাগানো যেত না বলে তার মাথায় উদ্ধত কণ্টকধ্বজা হয়েই থাকত সারাক্ষণ।

বৈশিষ্ট্য তার শুধু চেহারাতেই নয, চেহারার সঙ্গেই ছন্দ মেলানো উদ্দাম প্রাণ-শক্তিতেও। স্কুলে ঢোকার কিছুদিনেব মধ্যেই সে অনেক কিছুর মধ্যে একটা ফুটবল টিমও গডে তুলল।

ফুটবল খেলা আমাদের অজানা কিছু নয়। কিন্তু তখনকাব সেভেন্থ ক্লাসের ছেলেদের পক্ষে নিজেদের টিম গডার কথা তো কল্পনাতীত।

ও ব্যাপারে আমি তখনও একেবারেই অজ্ঞ আনাডি। যারা একটু ওয়াকিবহাল তারা আসল প্রশ্ন তুললে, টিম তো হবে, ফুটবল কোথায়?

সে আমি দেখব। বললে আমাদের নতুন সহপাঠী।

তার বলার ধরনটাই এমন আস্ফালনের মত যে আমরা কেউ বিশ্বাস করেছিলাম বলে মনে হয় না।

কিন্তু সত্যিই তার পরদিন সে একটা ফুটবল নিয়ে হাজির। ছেঁড়া তালি-মারা পুরনো কিছু নয়। একেবারে নতুন ঝকঝকে ফুটবল। আর শুধু কি ফুটবল, তার সঙ্গে হাওয়া ভরবার ব্লাডার সিরিঞ্জ, ফুটো জোড়ার সলিউশন—সব।

কতকাল আগের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা এমন আশ্চর্য অভাবিত যে মনে একেবারে গেঁথে আছে। এখনও চোখে একেবারে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। সাউথ সুবার্বান স্কুলের বড় বাড়িটার ভেতরটা এখনও বদলায়নি। মাঝখানের হল ঘিরে একতলা দোতলায় সারি সারি ঘর। উত্তরমুখো সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর সামনের বড় ঘরটা ছিল শিক্ষকদের জন্যে বরাদ্দ। আর পশ্চিম দিকের প্রথম ঘরটাই ছিল আমাদের সেভেন্থ ক্লাসের।

স্কুল বসবার আগে সেই ক্লাসের বারান্দায় জটলা করে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে আমাদের নতুন সহপাঠীকে, ক্লাসের বেয়ারার কাছে ফুটবল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম গচ্ছিত রাখতে দেখছি। ভাবতে গেলে কি আর এমন ঘটনা, কিন্তু মনের কাছে কোন্‌টা দামী কোন্‌টা খেলো, কোন্‌টা ধরে রাখবার কোন্‌টা মুছে দেবার তার হদিশ পাওয়া ভার। এই সামান্য ঘটনার ছবিটা দেখছি এখনো মনে জলজল করছে।

ফুটবল তো হল। শুনলাম স্কুলের ছুটির পর বেয়ারার কাছ থেকে বল নিয়ে আমাদের খেলা হবে। কিন্তু কোথায়?

কোথায় আবার? হবে গড়েব মাঠে! সমস্যাটা এক কথায় মিটিয়ে দিলে নতুন সহপাঠী। কিন্তু গড়ের মাঠ শুনে আমাদের অনেকেরই আক্কেল গুড়ুম! গড়ের মাঠ ভাল করেই জানি। কিন্তু স্কুলের পর-বাড়ি না গিয়ে ফুটবল খেলতে অতদূর যাওয়া কি সম্ভব?

প্রথম দিনের খেলা কোথায় হয়েছিল ঠিক মনে নেই। স্কুলের কাছের হরিশ পার্কে বা ওই রকম কোথাও বোধহয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ টিমের খেলা সত্যি গড়ের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যথেষ্ট নামও হয়েছিল টিমের। কালু, হরিগোপাল, ফণি মিত্তির ইত্যাদি সে কালের একডাকে চেনা খেলোয়াড়েরা তখন এই টিমেরই গৌরব। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

তার আগে গোড়ার দিকের ইতিহাসটা অবশ্য কৌতুক ও করুণরস-প্রধান। প্রথম টিম গড়েই নিউ বয়েজ ক্লাব নাম দিয়ে আমাদের দলপতি খেলোয়াড়দের ভূমিকা

ভাগ করে দিয়েছিল। আমার ভাগ্যে পড়েছিল হাফব্যাকের ভূমিকা। হাফব্যাক কাকে বলে জানি না। তাতে কি! খেলতে নেমে দেখলাম টিমের অনেকেরই দৌড় আমার চেয়ে বেশি নয়।

এই টিম নিয়েই কিন্তু আমাদের দলপতি তখনকার ছোটদের এক প্রতিযোগিতায় অকুতোভয়ে নাম দিয়ে বসল। সিক্স অ্যাসাইড খেলা। হরিশ মুখার্জী রোডের ওপরেই বি সি ঘোষদের লাল বাড়িটা বাহারী লাল রঙ করা ইটে তৈরি বলে আমরা লাল বাড়ি বলতাম। দেয়াল ঘেরা জমিতে প্রথম খেলাতেই আমাদের ঘোষেদের বাড়ির ছেলেদের বিরুদ্ধে নামতে হল। পাঁচ মিনিট বিরতি নিয়ে মোট বোধহয় আধঘণ্টার খেলা। সেই আধঘণ্টাতেই বিপক্ষ দল আমাদের প্রত্যেক প্লেয়ারের জন্যে একটি করে গুণে গুণে ছ-ছটা গোল খাইয়ে দিল। ব্যাক থেকে ফরোয়ার্ড পর্যন্ত অমিত বিক্রমে একা দাপাদাপি করে সমস্ত মাঠ চষে ফেলেও আমাদের দলপতি সে পরিণাম ঠেকাতে পারল না।

খেলা শেষ হবার পর লজ্জায় কালি মাড়া মুখে আমরা মাথা নিচু করে কোনমতে বেরিয়ে এলাম। দলপতি কি তাতে দমে গিয়ে হতাশ? মোটেই না। বেরিয়ে এসেই সে অদম্য উৎসাহে বললে, আচ্ছা দেখে নেব এরপর। এমন টিম করব যে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

সে প্রতিজ্ঞা সে সত্যিই একদিন রেখেছিল। কিন্তু তখন ওই সদ্য হারের অপমানের পর তার কথাগুলো নেহাত ফাঁকা বড়াই হিসেবে খারাপই লেগেছিল। আর যত গুণই থাক দীনহীনের মত বিনয় তার একটা ভূষণ নয়। তার কথার ধরনই ছিল বড়াইয়ের সুরে বাঁধা।

কেন বলা যায় না, ক্লাসের সমস্ত ছেলের মধ্যে আমার সঙ্গেই তার মেলামেশাটা সবচেয়ে বেশি হয়ে উঠেছিল কিছুদিনের মধ্যে।

একদিন সে তার নিজস্ব ধরনে বললে, জানিস, আমাদের বাড়ির বাগানে আমি একটা মন্দির তৈরি করেছি, আর তার ভেতরে একটা টাকা পোঁতা আছে।

আকারে প্রকারে অনেক তফাত সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্কটা ছিল সমকক্ষের। মিল যেমন ছিল তেমনি ঠোকাঠুকিও লেগে থাকত নিত্য।

তাচ্ছিল্যভরে তার কথাটা তাই উড়িয়ে দিয়ে তার গড়া মন্দির ও তার তলায় পোঁতা টাকা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।

সেইদিনই বিকেলে স্কুলের পর আমাকে সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে তার মা দুজনকে একসঙ্গে বসে বিকেলের জলখাবার খাওয়ালেন। যতদিন বেঁচে

ছিলেন মাতৃহারা হিসেবে তাঁর কাছে এ স্নেহ অযাচিতভাবে বরাবর পেয়ে এসেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর সহপাঠী বন্ধুর সত্যবাদিতার পরীক্ষা। আমারই তখন তার আস্ফালনটা মিথ্যে প্রমাণ করে তাকে লজ্জায় ফেলতে বেশ দ্বিধা হচ্ছে। সে নিজে থেকে কিছু না বললে ও কথাই আর তুলব না ঠিক করেছি। কিন্তু কথাটা আমার তুলতে হল না। সে নিজেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একতলায় তাদের বাড়ির পিছনের ছোট বাগান গোছের জায়গায় নিয়ে গিয়ে সত্যিই মাটি দিয়ে গড়া ছোট একটি চমৎকার মন্দির দেখাল। নতুন নয় সেটা, যেন কোন পুরনো ভাঙা মন্দিরের নমুনা, তার চূড়ার ফাটলে একটা বটের ডাল পর্যন্ত লাগানো।

মন্দির তো দেখলামই, সে মন্দিরের মেঝে খুঁড়ে সত্যিকার একটা টাকাও সে বার করে দেখাল। তখনও এক টাকার নোটের চলন হয়নি। টাকাটা রুপোর এবং আমার বিমূঢ় বিস্ময়ে আরো বেশি ঝকমকে।

এ বড়াইটা সত্য বলে প্রমাণ হওয়ার গর্বে সে কি একটু বেপরোয়া হয়ে উঠল?

তাই মনে হল তার কিছুদিন পরের আর একটি আস্ফালনে। একদিন সে বলে বসল, জানিস আমার মামার বাড়িতে দোতলা সমান আয়না আছে।

দোতলা সমান আয়না!—প্রতিবাদ না করে হেসেই ফেললাম তার কথায়।

॥ সাত ॥

নতুন সহপাঠী বলেছিল তার মামার বাড়িতে দোতলা সমান সব আয়না আছে। সে কথায় হেসে উঠেছিলাম। হেসেছিলাম, ঠিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবার জন্যে নয়। হাসিটা এ ধরনের আজগুবী কথার একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

মাত্রা রাখতে না পেরে সে চাল মারায় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে আর আমি তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি এইতেই ব্যাপারটা চুকে যাবার কথা।

কিন্তু তা গেল না। নতুন সহপাঠীর কাছে বার বার হার মেনে লজ্জা পাওয়াই তখন আমার নিয়তি।

একদিন শনিবারের ছুটির পর দেখি স্কুলের গেটে সে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে বাইরের রাস্তায় যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাও চোখে পড়ল। এ ধরনের জমকালো গাড়ি দেখবার সৌভাগ্য আমার কমই হয়েছে।

গেট থেকে সে আমায় সেদিন বাড়ি যেতে দিল না। সেই গাড়িটাতেই নিয়ে গিয়ে তুলল। ভেবেছিলাম সে বুঝি তাদের বাড়িতেই আমায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হরিশ মুখার্জি রোড ছেড়ে তখনকার রসা রোড ধরতেই অবাক ও সন্দিগ্ধ হয়ে কোথায় যাচ্ছে জানতে চাইলাম।

উত্তরে সে গম্ভীর ভাবে বললে, চল না দেখবি।

গেলাম ও দেখলাম। গেলাম চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার পিছনে চৌরঙ্গী লেনের একটি বিশাল রাজকীয় বাড়িতে। দোতলা সমান আয়না তো সেখানে দেখলামই তার ওপর আরো বেশ কিছু এমন দেখলাম যা আমার কাছে তখন প্রায় রূপকথার রাজ্যের জিনিস। যা দেখেছিলাম তার মধ্যে একটি বিরাট উঁচু হলঘরে কাপড় দিয়ে আগাগোড়া মোড়া ওপর থেকে ঝোলানো অজস্র খাঁচার কথা মনে আছে।

ঝোলানো খাঁচাগুলো অমন কাপড় দিয়ে মোড়া কেন?

প্রশ্নটা করবার আগেই অপরূপ পাখির ডাকের সঙ্গীতে উত্তরটা একরকম পেয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়। সহপাঠী কাপড় দিয়ে খাঁচাগুলো ঢাকার কারণও বুঝিয়ে দিয়েছিল। আলোর আড়ালে রাখলে গলা খোলে বলেই নাকি পাখিদের খাঁচা অমন করে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা।

সত্যিই দোতলা সমান আয়না যেখানে আছে আর শুধু পাখিদের গান শোনবার

জন্যেই ঢাকা খাঁচার একটা হলঘর যেখানে আলাদা করে রাখা, আমার পক্ষে আরো এমন অনেক বিস্ময়ে ভরা সে বাড়িটার সত্যিকার পরিচয় পরে জেনেছিলাম। বাড়িটা তাজহাটের রাজবাড়ি এবং তাজহাট-রাজ আমার সহপাঠীর মাতুল।

আজগুবী আস্ফালন ভেবে যা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি বহুবার সত্য বলে প্রমাণ হয়ে আমার নতুন সহপাঠীর কাছে তার জন্যে আমায় লজ্জা পেতে হয়েছে। কিন্তু যত চমক লাগানোই হোক, শুধু এই বিশেষত্বটুকুর জন্যেই এমন সবিস্তারে তার কথা এ বিবরণের মধ্যে লিখতে বসিনি।

তাজহাট রাজবাড়ির সম্পর্কের উল্লেখ থেকেই তার পরিচয় কেউ কেউ হয়তো অনুমান করতে পারবেন। একান্ত সত্য হলেও তার যথার্থ পরিচয় কিন্তু ওসব বংশ গৌরবের কুলজি থেকে পাবার নয়।

সে পরিচয়ের আভাস তার সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে আমারই বুঝি প্রথম পাবার সুযোগ হয়েছিল। ডন-বৈঠক, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, খেলাঘরের মন্দির বানানো থেকে ফুটবল টিম তৈরি, স্কেটিং করা পর্যন্ত তার অনেক কীর্তি আর খেয়ালই স্কুলে নীচের ক্লাস থেকে ওপরে ওঠার মধ্যে একে একে দেখেছি। তার মধ্যে একদিন সে লম্বা এক বাঁশী নিয়ে আমাদের বাড়িতেই এসে হাজির।

আলাপ বন্ধুত্ব হবার পর থেকে আমি যেমন তাদের বাড়িতে যাই আসি, সেও তেমনি সময় সুযোগ হলেই আমাদের বাড়ি আসে। আমাদের বাড়ি আসার তার প্রধান আকর্ষণ ছিল অবশ্য আমার দিদিমার তৈরি আচার আর আমসত্ত্ব।

সেদিন কিন্তু আচার আমসত্ত্বের টানেই নয় আমায় বাঁশি শোনাতেই সে এসেছে। সঙ্গে যা সে এনেছে তা বাজারে যা সহজেই কেনা যায় সে সুলভ্য পেতলের বাঁশি নয়— বাঁশের লম্বা আড় বাঁশি, তখনকার দিনে যার চল শুরুই হয়নি বলা যায়।

আমাদের রাস্তায় এদিকে ওদিকে ছোট বড় গঙ্গার ঘাটের অভাব নেই। তখনকার দিনে সেগুলি বেশীর ভাগ নির্জনও থাকত। বাড়িতে নয়, বাড়ির কাছাকাছি তেমনি একটি ঘাটে সে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে বাঁশি বাজাতে গেল।

অনেক আস্ফালন ইতিমধ্যে সত্য বলে প্রমাণ করলেও তার বাঁশি বাজাবার ক্ষমতাটা সেদিন খুব বিশ্বাস করতে বোধ হয় পারিনি। বেশ একটু দ্বিধা নিয়েই তাই তার সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার বাজানো যা শুনলাম তাতে সত্যিই অবাক। সুরের রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ হলেও এইটুকু তখনই বুঝেছিলাম যে বাঁশি বাজানোর খেয়ালটা সে অনেক উঁচুদরের কেরামতিতে না তুলে এনে ছাড়েনি।

শুধু কি বাঁশি? সাইকেল চালানো নিয়েও সে কিছুকাল আগে থেকে মেতেছে। সে সময়ে আমরা কিছুদিন আমাদের ক্লাসেরই একজন মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে পড়তে যেতাম। সে পড়ুয়া দলের মধ্যে বীরুমামাও ছিল আর সেই সহপাঠীও। সহপাঠীর এ রকম কোচিং ক্লাসে এসে পড়বার কোন দরকারই অবশ্য ছিল না। তবু সে আমাদের দলে থাকবার উৎসাহেই তার নতুন কেনা সাইকেল চড়ে আসত। সাইকেল চড়ে আসাটাও তার উৎসাহের একটা কারণ।

তখনকার দিনে ও বয়সের ছেলের সাইকেল চড়াটাই একটা বাহাদুরী। কিন্তু শুধু তাতে সন্তুষ্ট থাকবার পাত্র সে নয়। অধিকাংশ দিন স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফিরে সেখান থেকে আমরা মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়তে যেতাম। পড়াশুনা ঠিক মতই হত, কিন্তু তারপর যা হত তা সহপাঠীর সাইকেলের খেলা। সে খেলায় নিত্য নূতন কসরৎ দেখানো ছিল তার নেশা।

মাস্টারমশাই-এর বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল। মাঝারি রকমের গভীর আর চওড়া একটা খানা পার হয়ে সেখানে যেতে হত। খানার ওপর পার হবার জন্যে ডক্কা গোছের যে লম্বা কাঠটা ফেলা থাকত সেটা ঠিক সমতল নয়। এই বেপোট কাঠটার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ওপারে যাওয়াই ছিল সহপাঠীর একটা দুঃসাহসিক বাহাদুরী। তার সে বাহাদুরীর খেলায় আমাকেও যোগ দিতে হয়েছে। আমায় কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে সাইকেলে খানা পার হওয়ার বাহাদুরীটা সে আরও বিপজ্জনকও করে তুলেছে অনেকবার।

দুর্ঘটনা একটু আধটু ঘটেনি এমন নয়। হাত পা না ভাঙলেও কাটা, ছেঁড়া, ব্যথা পাওয়া বাদ যায়নি। কিন্তু তার দৃষ্টান্তে সেগুলো তখন তুচ্ছ।

এইসব চমক দেওয়া গুণপনার মধ্যে তার আসল পরিচয়ের আভাসটা সত্যি কথা বলতে গেলে তেমন কিছু বিশেষ বলে তখন মনে হয়নি। মর্ম না বুঝে সেটা একরকম অবহেলাই করেছিলাম।

একদিন স্কুলে এসে সে আমায় একটি নতুন জিনিস দেখিয়েছিল। বেশ বড় কাগজে আঁকা একটা ছবি। কাগজটা আমাদের স্কুলের লেখার জন্যে যা ব্যবহার করতাম সেই সাধারণ ফুলস্ক্যাপ নয়। কেমন একটু খসখসে মোটা গোছের কাগজ আর তার ওপর ছবিটা বেশ গাঢ় কালো কালিতে আঁকা।

ছবিটার সঙ্গে কাগজ আর কালির এই বিশেষত্বগুলো যে লক্ষ্য করেছিলাম এটুকু স্পষ্ট মনে আছে। ছবিটা ভালই লেগেছিল কিন্তু মুগ্ধ করার চেয়ে অবাক করেছিল বেশি। ছবিটা আমার সহপাঠীরই আঁকা—বিস্ময় এই কারণে।

ছবিটা অসাধারণ কিছু নয়। প্রাকৃতিক একটা দৃশ্য মাত্র। কিন্তু চোখ দুটো একটু বন্ধ করলেই এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

সামনে একটা বিরাট নদী, তার ওপারে একটা পাহাড় আর সে পাহাড়ের ডানদিকে মাথার ওপরে একটিমাত্র বড় গাছ। ছবিটার যা কিছু বিশেষত্ব তা ওই গাছটিতে. মানে গাছটির গুঁড়িতে আঁকা একটি বড় কোটরে।

এমন কোটরওয়ালা গাছের ছবি আমি অন্তত এর আগে দেখিনি।

ছবিটা শেষ পর্যন্ত সহপাঠী আমায় উপহারই দিয়েছিল। একে কোটরওয়ালা গাছ তার ওপর আমার বন্ধুর নিজের হাতে আঁকা বলে ছবিটা যত্ন করেই আমি অনেকদিন বাড়িতে রেখেও দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার পাওয়া উপহারের অনন্যতাটা খুব বেশী দিন ভোগ করতে পারিনি।

সহপাঠী তখন প্রায় প্রতি হপ্তাতেই একটা করে নতুন ছবি এঁকে এনে দেখাচ্ছে। দু-চারজনকে উপহারও দিচ্ছে সে সব। ছবি নতুন হলেও আঁকার বিষয় প্রায় সবগুলিতেই এক। সেই নদী পাহাড আর পাহাড়ের মাথায় কোটরওয়ালা মস্ত এক গাছ। গাছটা ডাইনে বাঁয়ে যেখানেই থাকুক কোটর তাতে থাকবেই।

আমার নিজস্ব উপহারের অনন্যতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় নিজের অগোচরেই একটু দুঃখ পেয়েছিলাম কি না জানি না। কিন্তু যথোচিত সাবধান না হওয়ার দরুন ছবিটি কিছুদিন বাদে যে হারিয়ে ফেলি সে জন্যে আজ আমার আফশোসের আর সীমা নেই। ছবিটি থাকলে ভারতজোড়া শুধু নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতির এক শিল্পী-প্রধানের প্রথম ছবি আঁকার নমুনা সগর্বে সকলকে দেখাতে পারতাম।

এ শিল্পী হলেন অনন্য ভাস্কর ও চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ছবির তুলি আর ভাস্কর্যের বাটালি ছাড়া সাহিত্যের কলমও যিনি সমান নৈপুণ্যে চালান।

আলো জল বাতাসের মত আরো অনেক কিছুর প্রভাবে মানুষ এ সংসারে বড় হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে আমার মনের জগৎকে বিস্তৃত করার ব্যাপারে শিল্পী দেবীপ্রসাদের কিছুটা ভূমিকা যে আছে অকপটে তা স্বীকার করতে পারি।

যেমন আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হওয়ার ব্যাপারে—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমরা নেহাত ছোট ও স্কুলের বেশ নিচের শ্রেণীতে পড়ি। অন্যদের তুলনায় আমার বয়স আবার আরো অল্প। ও বয়সে বাইরের বিশালতর জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ উদাসীন থাকবারই কথা। কিন্তু দেবীপ্রসাদই থাকতে দেয়নি। তখনই তার কাছ থেকে সত্যে কল্পনায় মেশানো বিশ্বযুদ্ধের নানা কাহিনী শুনেছিলাম।

ছেলেমানুষী আতিশয্যে একটু চড়া রঙে আঁকা হলেও সে-ই প্রথম জার্মানী ফ্রান্স ইংলণ্ড ইটালীর মত নামগুলির সঙ্গে বাইরের জগতের একটা চেহারা আমার কাছে ফুটিয়ে তুলেছে।

বাইরের জগতের আরেক দিকের পরিচয়ও দেবীপ্রসাদের মারফতই আমি প্রথম পেয়েছিলাম। তখনকার যুগের প্রথম বিদেশী চলচ্চিত্র কাহিনী পর্দায় দেখার সৌভাগ্য তার দৌলতেই হয়েছিল।

সে যেন আরেক কলকাতার কথা। তখনও কলকাতায় ট্রাম বাস চলে না। সারা শহরে সিনেমা হল বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই কল্পনার বাইরে।

সেই যুগে কোন্ সালে মনে নেই, ম্যাডান কোম্পানি গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা করে। ফিল্মকে তখন আমরা বায়োস্কোপ বলেই জানতাম। গড়ের মাঠের তাঁবুতে সে বায়োস্কোপ দেখবার কথা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সেই অসম্ভব স্বপ্নই একদিন সত্য হয়ে উঠল দেবীপ্রসাদের উৎসাহে আর উদ্যোগে। একদিন একরকম জোর করে গড়ের মাঠের সেই তাঁবুতে বায়োস্কোপ দেখাতে সে আমায় নিয়ে গেল।

কি ছবি দেখেছিলাম তা ঠিক মনে নেই। কিন্তু ছবি দেখার আনন্দের চেয়ে দেখতে যাওয়ার উত্তেজনাটাই ছিল তখন বড়। টিকিটের দামটা যতদূর মনে পড়ছে তখনকার হিসেবে বেশ একটু বেশিই ছিল। সে দাম অবশ্য আমায় দিতে হয়নি, দেবার ক্ষমতাও ছিল না। ক্ষমতা থাকলেও নিজে থেকে গড়ের মাঠের তাঁবুতে গিয়ে বায়োস্কোপ দেখার দুঃসাহস আমার হত না বলেই মনে হয়।

গড়ের মাঠের তাঁবুতে বায়োস্কাপ দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তারপর অনেকবার আমি দেখেছি। ছবি যা দেখেছি তার চেয়ে দেখতে যাওয়াটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, তার মধ্যে বড় ও বেপরোয়া, স্বাধীন ও সাহসী হবার একটা স্বতন্ত্র প্রচ্ছন্ন স্বাদ ছিল বলে। বড় ও বেপরোয়া হবার এ স্বাদ অনেকখানি দেবীপ্রসাদের দৌলতেই পাওয়া।

পিছনের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখছি তখনকার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ওঠবার পরই আমাদের দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেলেও দেবীপ্রসাদ সে সময়কার স্মৃতিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে!

স্কুল ছেড়ে চলে যাবার পরও মাদ্রাজের আর্টস কলেজে অধ্যাপনা করতে না যাওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়নি। ছেলেবেলায় প্রথম আঁকা ছবি যেমন আমায় দেখিয়েছিল, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব নেবার

পর তার নতুন শিল্পজীবনের প্রথম সার্থক ছবিও তেমনি উৎসাহে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ছবি আঁকা শেখাবার ভার পাবার খবর নিজেই সে আমায় জানিয়ে গেছে, মাদ্রাজ থেকে অধ্যাপনার জন্যে প্রথম ডাক পাওয়ার চিঠিপত্রও দেখিয়ে গিয়েছিল নিজে থেকে।

তার মাদ্রাজ চলে যাবার পর বাইরের দিক দিয়ে যোগাযোগটা ক্ষীণ হয়ে এলেও ছেলেবেলার টানগুলো সব কিছুর অন্তরালে মনের তলায় কত অটুট যে থাকে, আজ পরিণত বয়সে তা টের পাচ্ছি। তাই বোধহয় থাকে সকলেরই।

স্কুল জীবনে দেবীপ্রসাদের মত আরো কয়েকজনের কথা তাই বিশেষ করে মনে পড়ছে। তারা কেউ দেবীপ্রসাদের মত জীবনের সার্থকতার চূড়ায় সমাসীন না হলেও আমার মনের দিগন্ত প্রসারিত হতে সাহায্য করে স্মৃতিতে স্থায়ী দাগ রেখে গেছে।

তাদের একজনের তো নামটুকুও মনে নেই। স্কুলের গণ্ডীটুকুও পার হতে পারেনি জানি। স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠার পরই আর তার দেখা পাইনি।

পরিণাম তার জানি না। তবে নিশ্চিন্ত শান্তি কি উজ্জ্বল সাফল্যের মন্ত্র নিয়ে সে সংসারে আসেনি। বেঁচে থাকলে এতদিনে বোধহয় সংসারের হার-মানাদের মধ্যে কে জানে কোথায় তার পরিচয়টুকুও আছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

ছেলেবেলায় আমাদের ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়বার সময়েই বোধহয় কিছুদিনের জন্যে সে আমার কাছে প্রায় রূপকথার রাজ্যের নায়ক হয়ে উঠেছিল।

স্কুলে একদিন নিচের বড় হলঘরের মাঝখানে তাকে ক্লাসের সময়ে নীল-ডাউন হয়ে থাকতে দেখে অবাক আর কৌতূহলী হয়েছিলাম। এ শাস্তিটা স্কুলে সবচেয়ে অপমানের বলে জানা ছিল। কোন্ অপরাধে এ শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে জানতে তাই উদ্‌গ্রীব হয়েছি।

ছেলেটি আমার অচেনা নয়। আমাদের ক্লাসেই ভিন্ন সেকশনে পড়ে। বন্ধুত্ব না থাকলেও আলাপ তার সঙ্গে ছিল, অপরাধের কথা যথা সময়ে জানতে পেরেছি। তার অভিভাবকেরাই নাকি স্কুলে এসে সে অপরাধের কথা জানিয়ে তাকে শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করবার কথা বলে গেছেন।

গুরুতর অপরাধটা হল বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া।

না, সাধারণ এক আধবেলার পালানো, কি লুকিয়ে মামা কি মাসি বাড়ি চলে যাওয়া নয়। একেবারে দেশের মাটি ছেড়েই সত্যিকার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া।

শুনলাম ছেলেটি তেমনি করে পালিয়ে একেবারে নাকি বর্মা চলে গিয়েছিল।

এ দারুণ অপরাধের বিবরণ শুনে সেদিন সারাক্ষণ আর ক্লাসে স্থির হয়ে বসতে পারিনি। স্কুলের ছুটি হতে না হতে তাকে বাড়ি যাবার পথে গিয়ে ধরেছি।

সঙ্গে তার আরো দু-চারজন তখন ছিল। তারা একটা দুটো কথা জিজ্ঞাসা করে একটু সমবেদনা দেখিয়ে বা হাসি ঠাট্টা করে চলে যাবার পর আমি তার সঙ্গ আর ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত পয়সা দুয়েকের অলুকাবলি দুজনে ভাগ করে খেয়ে স্কুলের কাছের হরিশ পার্কেই তাকে নিয়ে গিয়ে বসাতে পেরেছি।

এভাবে তাকে নিয়ে এসে বসাতে এমন কিছু যে বেগ পেতে হয়েছে তা নয়, ছেলেটি প্রায় নিজের ইচ্ছেতেই এসে বসে আমার অনুরোধে তার বর্মা চলে যাবার গল্প শুনিয়েছে।

ওই একদিনই নয়, তার কাছে সে গল্প আরো অনেক দিন শুনেছি। এক দু' পয়সার আলুকাবলি, কি বুড়ির চুল, কি চানাচুরের প্যাকেটের বেশী কিছু তার জন্যে খরচ করতে হয়নি।

শুধু বর্মায় পালানোই নয়, সেই সঙ্গে তার আরো অনেক অসমসাহসিক বাউণ্ডুলে-গিরিব [redacted] গল্প সে শুনিয়েছে তাতে কাল্পনিক বাহাদুরীর রং হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, বেশ একটু গাঢ় করে লাগানো। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে সে গল্প শুনতে শুনতে আমাব যেন তাকে অন্য জগতের কেউ বলে মনে হয়েছে। মাত্র এগারো বারো বছব বয়সে অমন বেপরোয়া হয়ে যে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিতে পারে সে তে রূপকথার রাজ্যের ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে আমি সারাক্ষণ লক্ষ্য করেছি। তাতে লাভ কিছু হয়নি অবশ্য। তার চেহারা পোশাক দেখলে সে যেন ছদ্মবেশে আছে মনে হয়!

গায়ের রং ময়লা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। মুখখানা একটু গোলগাল ভাল-মানুষের মত হলেও চোখ দুটোয় কেমন একটা দুষ্টুমির ঝিলিক। যেন সব কিছুর ভেতর থেকেও সে ঠিক নেই। সব সময়ে মনে মনে কি যেন ভাবতে ভাবতে সে হাসছে। পোশাক-আশাক তো তার নিতান্ত সাধারণ ছিল বলেই মনে পড়ছে। সাধারণ শুধু নয়, বেশ একটু গরীবানির ছাপ মারা।

গায়ে একটা মাপে-ছোট আধময়লা কোট আর সব বাদে মাঝখানের দুটি বোতামে কোন রকমে আটকে আছে। পরণের কাপড়টাও (তখনকার দিনে প্যাণ্ট পরবার রেওয়াজ আমাদের মত স্কুলে কখনো ছিল না) অপরিষ্কার। পায়ের ক্যাম্বিসের জুতোটাও গোড়ালির দিকটা ভেঙে চটির মত করে পরা।

ছেলেটি সম্বন্ধে কৌতূহল অত্যন্ত তীব্র ছিল বলেই তার চেহারা আর পোশাকের

ছবিটা মনের মধ্যে এত স্পষ্ট হয়ে আছে। ছেলেটা কিন্তু বকাটে বেয়াড়া গোছের কিছু নয়। অন্য সেকসনের ছাত্র হলেও পড়াশুনায় সে যে বেশ ভাল আগের বারের বার্ষিক পুরস্কার দেবার দিনই তা টের পেয়েছিলাম। আমাদের স্কুলে এক একটি ক্লাসের একসঙ্গে সব সেকসনেব ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের ওপর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম ছিল।

আগের বারের সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ওই ছেলেটিকে একটি প্রাইজ পেতে দেখেছি। সব সেকসনের ছেলেদের মিলিয়ে পরীক্ষার মোট নম্বরে একেবারে ওপরে ছ' সাতজনের মধ্যে থাকতে না পারলে পুরস্কার জোটে না।

পডাশুনায় অত সরেস হওয়া সত্ত্বেও তার এই অদ্ভুত বাউণ্ডুলেগিরির নেশার জন্যেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম একটু বেশী। তার শাস্তি পাওয়ার দিনটির পর থেকে তার সঙ্গ আর ছাডতেই চাইনি। যতটা পারি তার সঙ্গে গভীর ভাবে মিশতে চেয়েছি।

কিন্তু বিরাগ বিরক্তি কিছু না দেখালেও সে যেন সব সময়েই কেমন নির্লিপ্ত উদাসীন। তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পাবার চেষ্টা যেন তরল জলকে মুঠো করে ধরা। যত চেষ্টাই করি না কেন সে আঙুলের ফাঁকে গলে বেরিয়ে যায়।

কিছুদিন বাদে চেষ্টা করবার সুযোগও আর থাকল না। একদিন স্কুলে গিয়ে জানলাম আবার সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমাদের স্কুলে অন্তত সে আর কখনো ফিরে আসেনি।

*　　　　*　　　　*

নাম ভুলে-যাওয়া ছেলেটির মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হওয়ার খেয়াল সম্বন্ধে আমার অতখানি আগ্রহ নেহাত অকারণে বোধহয় হয়নি। যত ক্ষীণই হোক ছেলেবেলায় মনের মধ্যে ওই ধরনের একটা অবুঝ ঝোঁক মাঝে মাঝে টের পেতাম।

ইতিমধ্যে একবার সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে কদিনের জন্যে পালিয়েও গিয়েছি। তবে ঠিক নিরুদ্দেশের টানে নয়, পালিয়ে গিয়েছিলাম বাড়িতে আমার ওপর অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে গভীর অভিমান নিয়ে। সাহস থাকলে সেই পালানোটাই নিরুদ্দেশের পাড়ি হয়ে উঠতে পারত। রাগ অভিমানটা কেটে গিয়ে মনটা ঠাণ্ডা হবার পর সে রকম একটা খেয়ালও একবার হয়েছিল।

বাড়ি থেকে পালিয়ে তখন আমি হাওড়া স্টেশনের ভেতরেই আশ্রয় নিয়েছি। কাউকে কিছু না জানিয়ে নির্ভয়ে ও নিরাপদে লুকিয়ে থাকবার অমন জায়গা আর পাব কোথায়! বিশেষ করে তখনকার দিনের হাওড়া স্টেশন তো আজ-কালকার নরককুণ্ড

নয়। ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে আমার দরকারের পক্ষে আদর্শ একটা জায়গাই বেছে নিয়েছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে থাকার তখন কোন হাঙ্গামাই নেই। পৃথিবী তখনও এত দুর্মূল্য হয়নি, পকেটে সামান্য যা পয়সাকড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতে কখনো পুরি-কচৌরী কখনও চা বিস্কুট খেয়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। শোবার জন্যে প্ল্যাটফর্মেও গড়াতে হয় না। ইণ্টার থার্ডক্লাসের ওয়েটিং রুমের চেয়ার বেঞ্চিতে আরামে ঘুম দেবার কোন বাধাই নেই, এর ওপর অন্য সব প্রয়োজনে সর্বসাধারণের কল-জল-বাথরুম তো আছেই।

খাই দাই আর একরকম পরমানন্দে স্টেশনে ঘুরে বেড়াই দিন রাত। কোন চেনা লোকের চোখে না পড়ে যাই এইটুকু শুধু সাবধান থাকবার। তারই বা সত্যি দরকার কি! তখনকার দিনে যখন তখন স্টেশনে আসবার মত কটা চেনা লোকই আমার ছিল যে ভয় করব। তা ছাড়া তেল বিহনে রুক্ষ মাথা আর তিনদিনের অকাচা ময়লা পোশাকে আমাকে চিনছেই বা কে? দিন দুই তিন এমনি ভাবে কাটাবার পর মনটা কেমন একটু অস্থির হয়েছে। এমনিভাবে এই স্টেশনেই দিনের পর দিন কাটাব নাকি? পকেটের পয়সা তো ফুরিয়ে আসছে। তারপর করব কি?

এই সব ভাবনার মধ্যে দুবেলা ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাছের দূরের অসংখ্য ট্রেনের যাওয়া আসা দেখেছি। সব সমস্যার সমাধান ওই একটা দূরের পাল্লার ট্রেনে উঠে বসাতেই আছে বলে মনে হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের ভেতর ঢুকে উঠতে গিয়েও কিন্তু পারিনি মনের জোর আর সাহসেরই অভাবে। শেষ মুহূর্তে আমার আদি-গঙ্গার ধারের বাড়ি, আমার স্কুল, আমার স্কুলের মাঠ এই সবের জন্যে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছে। মানুষ জনের চেয়ে জায়গাগুলোর স্মৃতির টানেই যেন বেশী।

মনে মনে তখনই হয়তো বুঝেছিলাম জাত বাউণ্ডুলে যাকে বলে তা আমি নই। দূরের পাড়ি তো দিতে পারলাম না। তাহলে এখন করব কি? বাড়িঘর চেনা পরিবেশের জন্যে মনটা যে রকম টনটন করছে তাতে শেষ পর্যন্ত ফিরেই যেতে হবে না-কি? কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে থেকে ফিরে গেলে কোন আয়নার দিকে আর মুখ তুলে যে তাকাতে পারব না!

এ সঙ্কট থেকে সেই তুলসীমামাই আমায় বাঁচিয়েছিলেন।

আমার সেই বয়সের ছেলেমানুষী বুদ্ধির দৌড় কি হতে পারে তা অনুমান করে তিনি হাওড়া স্টেশনে এসেই আমায় খুঁজে বার করেছিলেন।

॥ আট ॥

তুলসীমামা হাওড়া স্টেশনেই আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন কিন্তু আমার মান বাঁচাবার ব্যবস্থাও করে দিলেন সেই সঙ্গে।

কদিন ধরে বাড়ির একটা ছেলে নিখোঁজ। ভাবনা চিন্তা উদ্বেগ অস্থিরতা যা হবার ঠিকই হয়েছে। তখনকার দিনে এ ধরনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেবার উৎসাহ বড একটা দেখা যেত না। আমার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে পুলিশে খবর দেওয়ার কথা উঠলেও কাজে কিছু হয়নি। কিন্তু জানা শোনা যে সব জায়গায় আমার যাওয়া সম্ভব সবখানেই খোঁজ করা হয়েছে।

এরই ভেতর তুলসীমামাই আমার ছেলেমানুষী বুদ্ধির দৌড় কি হতে পারে বুঝে আমার পালাবার জায়গাটা ঠিক আন্দাজ করবার পর কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি হাওড়া স্টেশনে এদিক ওদিক একটু ঘুরেই আমায় বার করে ফেলেন।

তাঁর কাছে ধরা পডে ভয়ের চেয়ে লজ্জা ও দুঃখ তখন আমার অনেক বেশী! লজ্জা ও দুঃখ জেদ বজায় না রাখতে পেরে হার মেনে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হওয়ার অপমানে। তুলসীমামা কিন্তু সে অপমান থেকে আমায় বাঁচিয়েছিলেন।

তিনি সরাসরি আমায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করেননি। হাওড়া স্টেশন থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁরই এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকদিন আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে বাড়িতে আমার নিখোঁজ হওয়াকে আরো গুরুতর করে তুলেছিলেন আর শেষ পর্যন্ত তাঁর কলকাটি নাড়ায় আমি বিজয়ীর সম্মান নিয়েই বাড়িতে নিজের দাবি আদায় করে ঢুকতে পেরেছিলাম।

দাবিটা কি ছিল খুব স্পষ্ট করে এখন মনে করতে পারি না। যতদূর স্মরণ হচ্ছে নিজেদের জন্যে একটা ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধান কেনা আর বাড়িতে সেলাই করা বালির কাগজের খাতার বদলে বাজারের একসারসাইজ বুক চাওয়ার ব্যাপারটাই তার মধ্যে ছিল প্রধান। এই অন্যায় আবদারের জন্যে দিদিমার কাছে নয় তাঁর ভাই বীরুমামার বাবার কাছে প্রথমে বকুনি তারপর বুঝি মারই খেয়েছিলাম। সেই দুঃখ অভিমান নিয়েই চলে গিয়েছিলাম বাড়ি ছেড়ে।

তুলসীমামা আমার মানরক্ষা আর সে দুঃখ অভিমান ঘুচোবার ব্যবস্থা যে করতে

পেরেছিলেন তার কারণ হরিনাভি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে এসে তিনি এই হরিশ চ্যাটার্জির বাড়ি থেকেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই এ পড়ছেন।

শুধু তুলসীমামা নয় আমাদের বাড়িতে আত্মীয়দের তখনো আরো অনেকেই থাকেন। তুলসীমামা ছিলেন মার মাসতুতো ভাই। এক মামাতো ভাই বীরু তো আগে থাকতেই এখানে আমার সঙ্গে পড়ছে। তার ওপর আর অন্য দুই মামাতো ভাই অপূর্ব ও অনুকূল সেন আর তাঁদেব ভগিনী নীহারও তখন এখানে থেকেই পড়াশুনা করে। এছাড়া বীরুর বাবা তখন রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব ছেলেমেয়ে নিয়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছেন।

বাড়ি সুতরাং আমাদের সারাক্ষণ সরগরম। খাওয়া দাওয়া থেকে পড়াশুনো সব কিছু হরি ঘোষের গোয়ালের ব্যাপার। থালাবাটি রোজ রোজ মেজে ঘষে যোগানো শক্ত। তাই বেশীর ভাগ দিনই একসঙ্গে সব কলার পাতা পেতে খাই। ইলেকট্রিক আলো তখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি। তুলসীমামা ও অপুমামার জন্যে আলাদা লণ্ঠন থাকলেও আমি বীরু আর অনুকূল মামা একই কেরোসিনের ডিট্‌জ লণ্ঠনের চারিধারে বসে পড়ি। তিনজনে আমরা একই ক্লাসের ছাত্র।

খুব অসুবিধে কিছু তাতে হয়েছিল কি? হলেও তা টের পাইনি। মাঝে মাঝে শুধু নিজের বই কাগজ রাখবার একটা বাক্স বা ড্রয়ারের জন্যে আগ্রহ বোধ করতাম। বহুকাল পরে আমার 'ভিড়' নামের একটি গল্পে এই আগ্রহ আর তা নিষ্ফল হওয়ার করুণতা একটু বোধহয় ফোটাবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে নিজস্ব একটা নিভৃতির জন্যে গভীর কোন অভাব বোধ তখনও মনে ছিল না। যখন যা যেমন পেয়েছি তা তেমনি ভাবেই গ্রহণ করেছি।

ও বয়সে জীবন এত উত্তেজনায় ঠাসা থাকে যে মুখ গোমড়া করে দুঃখ বিলাস করবার অবসর সাধারণত কারুর থাকে না। আমার অন্তত ছিল না।

এরই মধ্যে অদ্ভুত এক কাণ্ড একবার করে ফেলেছি।

দিদিমা তাঁর সমবয়সী সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গঙ্গাসাগর যাবেন কদিন ধরেই শুনছিলাম। কথাটা তেমন ভাবে গায়েই মাখিনি।

সেদিন বইখাতা নিয়ে সকালে স্কুলে যাবার জন্যে বার হওয়ার সময় বাইরে দিদিমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবার দুটি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।

মালপত্র তুলে আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে দিদিমা গাড়িতে উঠতে যাবেন হঠাৎ এক মুহূর্তের খেয়ালে বই খাতা নিয়েই আমি গাড়ির মধ্যে উঠে বসলাম। এর পর আর আমায় নামায় কে?

অনুরোধ উপরোধ ধমকানি সব কিছুই বিফল হবার পর দিদিমা নিরুপায় হয়েই আমায় সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন। জীবনের সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

তখনকার দিনে গঙ্গাসাগর যাওয়া সংসার থেকে কিছুটা নাম কাটিয়ে যাওয়ার সামিল ছিল। ঝড়জলে বেঘোরে নৌকো ডুবির মত দুর্ঘটনা তো হতই তার ওপর ফি বছর কলেরা মহামারীতেই মারা যেত অসংখ্য লোক।

কোন্ সাল সঠিক বলতে পারছি না। তবে যতদূর মনে হচ্ছে উনিশ ন' চোদ্দ পনেরো হবে। আমি তখন ন'দশ বছরের ছেলে।

তখনকার ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশন। সেখানে থেকে ট্রেনে চেপে ডায়মণ্ড হারবার। ডায়মণ্ড হারবারে পৌছে গাঙের ঘাটে যে দৃশ্য দেখেছি তার সম্পূর্ণ তাৎপয ও রস বোঝবার বয়স তখনও হয়নি।

ছবিটি কিন্তু মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে ছিল। বয়স হবার পর নতুন চোখের দেখায় তার মানেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গাঙের কাদাজলে পিছল ঘাটে দেখেছিলাম সারি সারি ছোট বড় নৌকো। পাড়ের ওপর যাদের ভিড় তারা প্রায় সকলেই একবারে বৃদ্ধা—বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌছেছে। গঙ্গাসাগরে যেতে নয়, একেবারে জীবনের পারাবারই পার হবার জন্যে তারা যেন প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে যে দু-চারটি অল্পবয়স্ক চেহারা দেখা যাচ্ছে সেগুলি সঙ্গে করে তীর্থদর্শন করিয়ে আনবার ভার যারা নিয়েছে সেই পেশাদারী পাণ্ডাদের। পাণ্ডার বদলে গঙ্গাসাগর যাত্রার তারা 'সেখো' বলে পরিচিত।

তখনও শখ করে বা বাহাদুরী দেখাতে সুগম বা দুর্গম তীর্থে-টির্থে যাবার হুজুগ তরুণদের মধ্যে দেখা যায়নি। সুতরাং 'সেখো' ছাড়া অল্পবয়স্ক তেমন কেউ সেই জনতায় ছিল না বললেই হয়। দু একটি যাদের দেখা গেছে তারা হয় তখনকার কোন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক বা বৃদ্ধ অথর্ব বাবা মায়ের সহায় হিসেবে সেখানে উপস্থিত।

এই দৃশ্যের মধ্যে আমার মত ন'দশ বছরের ছেলে একটি বিরল ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই। বিরল হলেও এ ব্যতিক্রম একেবারে অনন্য নয়। অতি অল্পবয়সী আরো দু-একটি ছেলেমেয়েকে এই সাগর মেলার ভিড়ে আমি দেখেছিলাম। তবে তাদেরই একজন একদিন আমার একটি গল্পে অমনভাবে যে এসে জায়গা নেবে তা তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

মনের অতলে কোন্ স্মৃতি যে কি ভাবে লুকিয়ে থাকে কেউ আমরা জানি না। সে স্মৃতির রূপান্তরও পারি না অনুমান করতে।

আমার গঙ্গাসাগর যাত্রার স্মৃতিতে গাঙের ঘাটে আমাদের পাশের একটি যাত্রীঠাসা নৌকায় 'সেথো'র সঙ্গে কয়েকজন যাত্রীর তিক্ত তুমুল ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। উপরি পয়সার লোভে সে নৌকোর 'সেথো' সাধারণ যাত্রীর সঙ্গে একদল পতিতাকে সেখানে জায়গা দিয়েছিল। ঝগড়া তাদের নিয়েই। সেই পতিতাদের মধ্যে তাদের পালিতা একটি ছোট্ট বালিকাকেও দেখেছিলাম। কুৎসিত ঝগড়ার কিছু ঝংকার ছাড়া সে ঘটনার ও পরিবেশের অন্য কিছু মনে কোন দাগ ফেলেছে বলে কিন্তু তখন টের পাইনি।

ওই বয়সের গঙ্গাসাগর যাত্রায় মনের মধ্যে যা ছাপ ফেলেছিল তা দুই ঢাকা নৌকোয় ডায়মণ্ড হারবারের গাঙ ছাড়িয়ে শতমুখীতে পড়ার পর চারিদিকে সমুদ্র-বিস্তৃতির সেই প্রথম শঙ্কা বিস্ময় মেশানো অনুভূতি। দুদিনের পাড়িতে মনে আছে এক বিস্তীর্ণ চরের গায়ে নৌকো বেঁধে ডালভাত রেঁধে খাওয়া। মনে আছে দূরের চরের ফালিতে আমাদের 'সেথো'র বাঘ বলে দুটি প্রাণী দেখানো।

চরের ফালিটি এত দূরে যে প্রাণী দুটির সঠিক পরিচয় দূরবীণে ছাড়া নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। দূরবীণ অভাবে 'সেথো'র কথাটাই মেনে নিয়ে আমরা স্বচক্ষে সুন্দরবনের স্বাধীন বাঘ দেখার রোমাঞ্চিত আতঙ্ক উপভোগ করেছি।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে সত্যি সত্যি নৌকোডুবির পরিণাম থেকে কোনরকমে যে রক্ষা পেয়েছি সে স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

অন্ধকার রাত। কোন চরের কাছাকাছি এক জায়গায় আমাদের নৌকো নোঙর ফেলে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ভেতরে যে যেখানে পেরেছি আমরা তখন কাঠের পাটাতনের ওপরেই গায়ে কম্বল চাপিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছি।

হঠাৎ গেল গেল বলে আতঙ্কিত হট্টগোল।

এমনিতে ব্যাপারটা দারুণ কিছু নয়। গাঙের জলে মাঝরাতের জোয়ার এসেছে। জোয়ারের স্রোত ওখানে অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু মাঝিদের তো তার জন্যে সজাগ থাকবারই কথা। প্রথম জোয়ারের ধাক্কা সামলানো তাদের কাছে কিছুই নয়।

কিন্তু জোয়ারের প্রথম ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে আর অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে বিপদটা সর্বনাশা হয়ে উঠেছে। আমাদের সামনের দিকে বেশ কিছু দূরে একটি ভড় মানে বড় মালের নৌকো নোঙর ফেলে এই জোয়ারের অপেক্ষাতেই ছিল। কেমন করে বলা যায় না বেকায়দায় নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে বেসামাল অবস্থায় সেই ভড়টি একেবারে আমাদের নৌকোর উপর এসে পড়েছে।

কি যে হয়েছিল স্পষ্ট বর্ণনা করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু অন্ধকারে ভীত মাঝি ও যাত্রীদের চিৎকার, দুই নৌকোর সংঘর্ষের আওয়াজ, আমাদের নৌকোর পাটাতন সমতল থেকে হঠাৎ খাড়া হ.য ওঠার সঙ্গে যাত্রীদের তালগোল পাকিয়ে গড়িয়ে পড়ার একটা বিশৃঙ্খলা, সব মিলে এমন তীব্র একটা আতঙ্কের অনুভূতি সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল, মন থেকে কোনদিন যা মোছবার নয়।

কেমন করে রক্ষা পেয়েছিলাম ঠিক জানি না, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে যেমন হঠাৎ এসেছিল, বিপদ কেটেও গিয়েছিল তেমনি তাড়াতাড়ি।

ভড়টা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদের একবার একটু কাৎ করে দিয়েই দূরে ভেসে চলে গিয়েছিল। নৌকোর মারাত্মক কোন ক্ষতি হয়নি। বিপদ কাটবার পর আলো জ্বেলে খোঁজ খবর নিয়ে বোঝা গিয়েছিল একটু আধটু আঘাত পেলেও যাত্রীরা সবাই নৌকোতেই বেঁচে বর্তে আছে।

জায়গার নামগুলো নির্ভুল পরম্পরায় বলতে পারব না, তবে এরপর বোধহয় ধবলাট বলে কোন একটি ঘাঁটিতে নৌকো বেঁধে মাঝিরা খুব ঘটা করে গঙ্গা মায়ের পুজো দিয়েছিল অতবড় বিপদ থেকে বাচবার জন্যে।

তা গঙ্গা মাঈ আর কপিল মুনি মিলে সেবার রক্ষা করছিলেন ঠিকই। অনেক বছরের মধ্যে সেইবারই গঙ্গাসাগরে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়নি। শীতকালের ওই হিমের মধ্যে এক ফালি দোতলার ঘরে বালির ওপর শুধু কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে কাটিয়েও অসুখ বিসুখ কিছু করেনি।

অসুবিধা যা হয়েছে তা শুধু খাওয়ার। তার মধ্যে একদিনের অভিজ্ঞতাটা লিখে রাখবার মত।

প্রতিদিন কেনা খাবার খেয়েই ওখানে কাটাতে হয়। একদিন দিদিমার পরিচিতা এক ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁদের ওখানে দুপুরে আমার খাওয়ার কথা বলেছিলেন। কথাটা যা ব্যবহার করেছিলেন তা হল ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাওয়া।

বাজারের খাবার নয়, বামুন বাড়ির রান্না ভাত তরকারি। দিদিমা তাই রাজী হয়ে আমায় সেখানে খেতে পাঠিয়েছিলেন।

এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি বেশ সদলবলে এসেছেন। তাঁদেরও সকলের হোগলার কুঁড়ে, কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি জটলা বেঁধে প্রায় একটি ছোটখাট পাড়া বালির চরের ওপর গড়ে উঠেছে।

বেশ একটু সঙ্কোচ নিয়েই সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাউকে সেখানে চিনি না। কাউকে নিজে থেকে যে জানাব সে ক্ষমতা আমার নেই।

বেশ কিছুক্ষণ অসহায় অপ্রতিভভাবে দাঁড়াবার পর দিদিমার পরিচিতা সেই প্রৌঢ়া আমায় ওখানে দেখতে পেয়ে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বসতে তো বলে গেলেন। কিন্তু বসব কোথায়? চারিধারে তো শুধু বালি। এরই ওপর বসতে হবে নাকি? আমার এই দ্বিধান্বিত অবস্থার মধ্যেই ভেতর থেকে একজন একটি কলাপাতা নিয়ে বেরিয়ে এসে সেটি বালির ওপর পেতে আমায় বসতে বলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

বুঝলাম ওইখানে ওই কলাপাতাতেই আমায় খেতে হবে। কিন্তু দ্বিধাভরে কলাপাতার সামনে বসবার পর বিমূঢ় বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

যে পাতাটি আমায় খেতে দেবার জন্যে সেখানে পাতা হয়েছে সেটি উচ্ছিষ্ট। অন্য কেউ সেটিতে যে খেয়েছে তা গোঁপন করার কোন রকম চেষ্টাই সেটিতে করা হয়নি।

রাগ কি ঘৃণা নয়, ভেতর থেকে কি রকম একটা ভয় আর অস্বস্তিই তখন যে বুকটাকে প্রবল ভাবে চেপে ধরেছিল সেকথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

ভয়, পাছে তখনই ভেতর থেকে রান্না ভাত-তরকারি নিয়ে বেরিয়ে এসে কেউ আমায় দেখে ফেলে। আর অস্বস্তি দিদিমার কাছে কি কৈফিয়ত কেমন করে দেব তাই নিয়ে। আমার সঙ্কল্প তখনই অবশ্য আমি ঠিক করে ফেলেছি। আর সেই মতই পাতাটির ওপর কিছু বালি চাপা দিয়ে নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছি।

দিদিমার কাছে ধরা পডবার ভয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত সেদিন আমাদের হোগলার কুঁড়েটিকে চোখে চোখে রেখে কাছাকাছি ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

কুঁড়েটির ওপর নজর রাখতে হয়েছিল হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে। অসংখ্য একই আকার ও চেহারার হোগলার কুঁড়ের মধ্যে নিজেদেরটি ঠিকমত চিনে বার করা আমার মত ছোটদের কেন বডদেরও যে সুসাধ্য ছিল না তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।

দিদিমার কাছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্য কথাই স্বীকার করেছিলাম। সেদিনও দিদিমার কাছে বিবরণ দেওয়ার সময় মনের মধ্যে তিক্ত একটু ক্ষোভ নিশ্চয়ই ছিল।

আজ কিন্তু তা এক বিন্দুও নেই। পরিণত মনের ভাবনায় আজ এইটুকু অন্তত বুঝেছি যে আমার মত একটি বালককে অবজ্ঞা অবহেলা তাচ্ছিল্য করবার এতটুকু ইচ্ছাও সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের ছিল না। তাঁরা সত্যকার প্রীতি-মমতা নিয়েই একটি বালককে তাঁদের প্রসাদ দিতে চেয়েছিলেন।

উচ্ছিষ্ট পাতায় যে দিয়েছিলেন তা শুধু আমারই কল্যাণে। আমি কায়স্থ সন্তান শূদ্র, সুতরাং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাওয়া আমার পক্ষে একটা সৌভাগ্য। এই সূত্রে আরো একটা কথা যে ভোলবার নয়, তা এখন আমি ভাল ভাবেই মানি।

হৃদয় মন আমাদের যেমনই হোক আমরা নিজেদের অগোচরেই সাময়িক ও বিশেষ গণ্ডীগত রীতি-নীতি লোকাচরের একান্ত ভাবে দাস। স্বাধীন বিচার ও চিন্তা, যাকে আমরা বলি এই শতাব্দীর আগে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ কিছু গোষ্ঠী ও সংক্ষিপ্ত এক একটি সময়-সীমার বাইরে তার স্ফুরণ হয়নি বললেই হয়।

গঙ্গাসাগর মেলায় আমার ওই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার সমস্ত গ্লানি ও তিক্ততা শুধু সময়টার কথা মনে রাখলেই আপনা থেকে দূর হয়ে যায়।

সময়টা উনিশশো চোদ্দ কি পনেরো। সমাজ-সংস্কারের অনেক আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও বৃহত্তর সাধারণ সমাজ তখন অন্ধ লোকাচারের শৃঙ্খলে বাঁধা। নিমন্ত্রণ বাড়িতে তখনও স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরদের আলদা জায়গায় পাত পড়ে। মহৎ বলে নয়, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বলেই অন্য সকলের পূজা পাওয়া তখন শাস্ত্র ও লোকাচারে অবধারিত ছিল।

এই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে গঙ্গাসাগর থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই বাড়িতে ফিরেছিলাম।

তীর্থস্নানের পুণ্য কিছু না হোক, এই খামখেয়ালের সাগর-যাত্রা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটু বড় হয়ে ফিরেছিলাম কি? মনে হয় তা ফিরেছিলাম।

॥ নয় ॥

মাত্র দিন দশেকের গঙ্গাসাগর যাত্রায় কি দশ বছরের বড় হয়ে ফিরেছিলাম?

ভাবনাটা একেবারে অলীক নয়।

বছরের হিসেবে গোনা না যাক, হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ওই ঘুরে আসবার অভিজ্ঞতাটুকু বড় হয়ে ওঠার দিকে কিছুটা যে এগিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখন অবশ্য বড় হয়ে ওঠারই বয়স।

অনেক দিক দিয়েই মনের দিগন্ত ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। নতুন নতুন জানালা খুলে যাচ্ছে অজানা আকাশে।

এমনি একটা জানালা খুলে গিয়েছিল শুধু একটি বইয়ের কল্যাণে।

রাস্তার ধারের ফুটপাথে ফেলে রাখা পুরোনো বইয়ের রাশি থেকে নেহাত খেয়াল ভরে তুলে নেওয়া একটি গ্রন্থ। বাছাই-টাছাই করে কেনা নয়, কারণ লেখকের নামও আমি কখনও আগে শুনিনি। বইটি যা নিয়ে লেখা সেই বিষয় সম্বন্ধে শুধু তখন আমার মনে একটু কৌতূহল জাগতে শুরু করেছে। বইয়ের বিষয়, আর সেটির সযত্নে বাঁধানো চেহারা দেখেই কিনতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। বইটি ইংরেজীতে লেখা আর বিষয়টা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ যে একটা মাথাব্যথা তখন ছিল তা নয়। ভগবান সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে এইটুকু জেনে এসেছি যে, যা যা পেয়ে আমরা খুশি, সে সবের জন্যে, অন্য সময়ে না হোক, রোজ রাতে ঘুমোবার আগে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়, আর পরীক্ষায় পাস, খেলায় জিৎ ইত্যাদি সৌভাগ্যের জন্যে তাঁর কাছে খুব কাতর ভাবে প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নির্বিচারে যা এতকাল মেনে এসেছি সে বিশ্বাসে কিছু কাল আগে থেকে একটু যেন তখন চিড় ধরেছে। চিড় ধরেছে নাস্তিকতা খণ্ডনেরই একটি ছোট পুস্তিকা পড়ে, এইটেই মজার ব্যাপার।

নাম-টাম কিছুই মনে নেই, কেমন করে আমার হাতে এসে পড়েছিল তাও বলতে পারব না। তবে গঙ্গাসাগর যাত্রা থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই নাস্তিকতা-বিরোধী একটি ছোট পুস্তক পড়ে আমার মনে যে প্রথম এ বিষয়ে সংশয় জাগতে শুরু করেছিল একথা ভাল ভাবে মনে আছে।

সংশয় জাগবার কারণ এই যে পুস্তিকাটিতে আস্তিক্যের সপক্ষে যে সব যুক্তি

দেওয়া হয়েছিল তাতে খণ্ডিত হবার বদলে নাস্তিকতাই যেন জোর পেয়েছিল বেশী। অর্থাৎ ভগবান আছেন কি নেই বিচারে, ওকালতির দোষে থাকার চেয়ে না থাকার দিকটাই ভারী হয়ে উঠেছিল।

মনের সেই অবস্থায় এই নতুন বইটি হাতে পড়ে আমার ভাবনার জগতে বেশ একটু গোলমাল বাধিয়ে দিলে। আগের মত নির্বিচারে সব কিছু মেনে নেওয়ার নিশ্চিন্ততা ঘুচে গেল আমার মন থেকে। ভগবান থাকা না থাকার সংশয় জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যত অস্ফুটভাবেই হোক একটা জিজ্ঞাসার যন্ত্রণার সেই প্রথম সূত্রপাত করল আমার মনে।

যে বইটি আমার জীবনে প্রথম এই সংশয়ের দোলা এনেছিল সেটির লেখকের নাম ইঙ্গারসল এইটুকুই তখন স্মরণ করে রেখেছিলাম। তাঁর পুরো নাম যে রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসল, তাঁর দেশ যে আমেরিকায় আর ওদেশের একজন ধর্মযাজকের ঘরেই জন্ম নিয়ে তিনি যে সারাজীবন তার ওকালতি পেশার সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়বাদ প্রচারই জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন এসব কথা অনেক পরে জেনেছি।

স্বভাবে একটু গ্রন্থকীট বলে জীবনে ভাল মন্দ বড় কম বই পড়িনি। তার মধ্যে দেশ-বিদেশের রথী মহারথী অনেক লেখকেই আছেন। তবু নিজের জীবনের ধারার কথা ভাবতে গেলে মোড় ঘোরাবার মত যেসব বিশেষ ঘটনা আর বিস্ময়কর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের কথা মনে পড়ে তার মধ্যে ফুটপাথের ফেরিওয়ালার কাছে কেনা এই পুরনো বইটির ভূমিকা অন্য কোন কিছুর তুলনায় যে সামান্য নয় একথা স্বীকার না করে পারছি না।

শুধু সাগর-পারের নয়, ইঙ্গারসল শতাব্দী পারেরও মানুষ। এ শতাব্দীতে পৌঁছবার আগেই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ছেষট্টি বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। নিজের দেশেও সময়ে নেহাত নগণ্য না হলেও লেখক হিসেবে অসামান্যদের পর্যায়ে তিনি পড়েন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়বাদ চিন্তার জগতের দারুণ মৌলিক কিছু প্রবর্তনাও নয়। তবু আমার মত এক দূর দেশের বয়ঃসন্ধিগত সামান্য একটি ছেলের মনে শতাব্দীর পার থেকে তাঁর কালাপাহাড়ী ভাবনাই যে প্রথম অনেক নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দোলা লাগিয়েছিল এ ঘটনার বিস্ময় ও তাৎপর্য কোন মতেই তুচ্ছ করবার নয়।

ফুটপাথ থেকে ইঙ্গারসলের মত অজানা লেখকের ইংরেজী বই কেনা ও তা পড়ার উৎসাহের পিছনে সামান্য যে ইতিহাসটুকু আছে তা এখানে বলায় বোধহয় দোষ নেই।

আমাদের সে যুগ ছিল ইংরেজী শেখা নিয়ে আতিশয্যের। পরাধীনতার গ্লানিতে

শাসক হিসেবে ইংরেজের বিরুদ্ধে যত আক্রোশই থাক ইংরেজী শেখাটাই ছিল বেশির ভাগ শিক্ষিত সমাজের ধ্যান জ্ঞান। ইংরেজী পড়, ইংরেজী বল, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখ—এই রকম একটা কথাও তখন ছাত্রদের মহলে চালু ছিল। ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখা —কি ইংরেজী বলার কোন উৎসাহ না থাকলেও ইংরেজী পড়ার অনুশাসনটা আমার কাছে শাস্তি-গোছের কিছু হয়নি।

বাংলা বই হাতের কাছে যা পেয়েছি ভাল মন্দ, সরেস নিরেস কিছুই পড়তে বাকি রাখিনি। তার সঙ্গে আমার ওই বয়সের গল্পের ক্ষুধা অনেকখানি ইংরেজী বই থেকেই মিটেছে :

তখনকার সিক্সথ্ ক্লাসে পড়বার সময়েই ইংরেজী বই পড়বার জন্যে স্কুলের লাইব্রেরী থেকে কিছু না জেনে শুনেই যে বইটি নিয়েছিলাম তার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সে বইয়ের ইংরেজীতে দন্তস্ফুট করবার চেষ্টায় হায়রান হয়েও সম্পূর্ণভাবে ভাল করে তা যে বুঝতে পারিনি তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সেই আংশিক বোঝা বইটিই শুধু ইংরেজী লেখার বিষয়ে নয়, গল্প-সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগেও আমার অদম্য নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।

বইটির নাম বললেই বক্তব্যটা আর অস্পষ্ট থাকবে না। বইটির নাম 'টোয়েন্টি থাউজণ্ড লিগ্স আণ্ডার দ্য সী' আর লেখক হলেন জুল্স্ ভার্ন।

জুল্স্ ভার্ন ইংরেজ নয় ফরাসী লেখক। তাঁর বই যা পড়েছি সবই ফরাসী থেকে অনুবাদ। কিন্তু সেই অনুবাদিত লেখাই আমাদের প্রথম শুধু ইংরেজীর সঙ্গেই পরিচয় করায়নি, বৈজ্ঞানিক কল্পনার কাহিনীর অন্ধ ভক্ত করে তুলেছে।

সম্পূর্ণভাবে বুঝি আর না বুঝি নির্বিচারে অক্লান্ত ভাবে স্কুলের লাইব্রেরীতে জুল্স্ ভার্ন-এর লেখা যে ক'টি বই ছিল সবই পড়েছি। সেই সঙ্গে সাহস করে অন্য ইংরেজী বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি।

আসল ইংরেজ লেখকের লেখা অন্য ইংরেজী বইটি প্রথম পড়ি তার কথাও এখনও ভুলিনি। বইটি চার্লস ডিকন্সের অলিভার টুইস্ট। এ বইটির ইংরেজী জুল্স ভার্নের অনুবাদ করা বইয়ের ইংরেজীর চেয়ে আরো অনেক কঠিন। সে ভাষার বাধা পার হয়ে ভেতরকার কাহিনীর একটা অস্পষ্ট আভাসের বেশী কিছু পাইনি। যেন আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে দেখা একটা অজানা দূর জগৎ। কিন্তু সেই আবছা আলোর দেখাই সেই বয়সের মনে একটা রহস্যের আকর্ষণ বেশী তীব্র করে তুলেছে।

সেই রহস্যের টানেই স্কুলের শেষ ধাপে পৌঁছবার অনেক আগেই সেখানকার লাইব্রেরীর সব বই শেষ করে বাইরের লাইব্রেরীতে বইয়ের খোঁজে গিয়েছি। এমনি

একটি লাইব্রেরী তখন ভবানীপুরের যদুবাজারের উল্টোদিকে রাস্তার ওপর দোতলায় ছিল। নাম কটেজ লাইব্রেরী। সেখানে একটু সঙ্কোচভরেই বই নিতে তখন যেতে হত। ওইটুকু ছেলে হয়ে নিজের জন্যেই বাংলার বদলে ইংরেজী বই নিয়ে যাচ্ছি একথা বিশ্বাস করতে না পেরে কেউ কেউ একটু-আধটু হাসি ঠাট্টা করত বলেই এই সঙ্কোচ।

ইঙ্গারসল-এর বইটি আমার হাতে পড়া যে নেহাত আকস্মিক নয় তা জানাবার জন্যেই সে প্রসঙ্গে এই সব পুরোনো কথা তুললাম। জুলস্ ভার্নের টানে প্রথম ইংরেজী পড়ার একটা ঝোঁক না জাগলে রাস্তার ধার থেকে কয়েক বছর বাদে একদিন ইঙ্গারসল-এর ওই বইটি কেনার উৎসাহ নিশ্চয়ই আমার হত না। ওই বয়সে জীবনের একটা বড রকমের উদ্ভাসন থেকে তাতে যে বঞ্চিত থাকতাম সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

বড হওয়ার বয়সটা যে কি গোলমেলে আর জটিল, সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধান থেকে তা যতখানি বুঝতে পারি তখন তা সম্ভব ছিল না।

চারিদিকের নানা ঢেউ নানা ভাবে মনের ওপর এসে লেগেছে। সে সব মিলে বাডন্ত মনটার ওপর কি ছাপ ফেলে কত ভাবে যে বেগ দিয়েছে তা এখনও অবশ্য সব হিসেবের বাইরে।

তবে এখন যেসব জটিলতা বেশ একটু ভয়াবহই মনে হয়, বয়সের ধর্মে তখন সেসব গ্রাহ্য করবার মত সচেতনতাও যেন ছিল না।

ইঙ্গারসল-এর কাছ থেকে অস্তি নাস্তির সংশয়ের দোলা যেমন পেয়েছি, তেমনি আরেকদিকের এক যন্ত্রণা ও উত্তেজনা তখন আমার জগৎকে নাড়া দিতে শুরু করেছে। যন্ত্রণা পরাধীনতা বোধের আর উত্তেজনা তা থেকে মুক্তির আন্দোলনের। প্রকাশ্যে রাজনৈতিক নেতারা যে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন চালাচ্ছেন তার অন্তরালে এক বিপ্লবী বিস্ফোরণের বারুদের পলতে যে সঙ্গোপনে জ্বলছে আমাদের বাড়িতেও তার গন্ধ তখন যেন পাচ্ছি।

যতদূর জানি, তুলসীমামা সক্রিয় ভাবে কোন আন্দোলনের সঙ্গে বোধহয় যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তাঁর থাকবার দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে মাঝে মাঝে যে ছোটখাট সমাবেশ হত তা খুব নির্দোষ ছিল বলে মনে হয় না।

সেখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে একজনের স্মৃতি তো আমার মন থেকে কোনদিন মোছবার নয়। প্রায় একহারা চেহারার পাতলা রোগা দীর্ঘ মানুষটির চলাফেরা থেকে মুখের ভাবে এমন কিছু ছিল যে একান্ত অপরিচিতের মধ্যেও প্রথম দেখাতেই আপনা থেকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলত।

নাম আদীশ্বর ভট্টাচার্য। শিক্ষকতাই ছিল তাঁর ব্রত। সেই ব্রত নিয়ে তখনকার অখণ্ড বাংলার এদিক ওদিক বহু জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তুলসী মামার ঘরের সমাবেশে সাধারণত আমাদের মানে—আমার কি বীরুমামা বা অনুকূলমামার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হত না। কিন্তু সে সৌভাগ্য হলে আমি যে অন্তত নিজেকে ধন্য বোধ করতাম একথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেখানকার প্রধান আকর্ষণ অবশ্য আদীশ্বরদা—মামাদের যেমন, আমাদেরও তিনি তেমনি আদীশ্বরদা ছিলেন। কি কথা তিনি বলতেন, মুগ্ধ হয়ে কি তাঁর কাছে শুনতাম, মনে করতে গেলে এখন একটু অবাকই লাগে।

তা, জ্বালময়ী কোন বক্তৃতা তিনি শোনাতেন না, গুরুগম্ভীর মূল্যবান কোন উপদেশও কখনো দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু অত্যন্ত সহজ ভাবে স্নেহভরে সাধারণ আলাপ যা তিনি করতেন তা শোনবার পর গভীর অন্তরে দুঃসাধ্য মহৎ কিছুর জন্যে একটা কেমন পবিত্র ও দৃঢ় কঠিন সঙ্কল্পের প্রেরণা নিয়ে যেন বেরিয়ে আসতাম।

আদীশ্বরদা সে যুগের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে কোন্ স্তরে কি ভাবে কতটুকু যুক্ত ছিলেন তা আমি জানি না, জানবার চেষ্টাও কখনো করিনি। সে যুগের মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ও উপেন বন্দ্যোকেও পরে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিপ্লব-নায়কের প্রথম আভাস যাঁর মধ্যে পেয়েছিলাম, বজ্রগর্ভ অথচ প্রশান্ত-স্নিগ্ধ বিপ্লব-প্রেরণার মূর্ত প্রতীক ভাবতে আমার সেই আদীশ্বরদার কথাই আগে মনে পড়ে। নিজে তিনি যে স্তরের কর্মীই হোন, হাতে কলমে যারা কাজ করে তাদের কারুর কারুর তাঁর সম্বন্ধে গভীর নীরব শ্রদ্ধাটুকু লক্ষ্য করবার সুযোগ আমার তখন হয়েছিল।

আদীশ্বরদার স্মৃতি তাঁর লেখা একটি ছোট পুস্তিকার সঙ্গেও আমার মনে জড়িত হয়ে আছে। তখনকার দিনে তরুণ ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র সবল করবার জন্যে তিনি বইটি লিখেছিলেন। এ রকম একটি বই লেখায় যে বলিষ্ঠ স্পষ্টবাদিতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা তখনকার দিনেও সুলভ ছিল না।

তুলসীমামার ঘরটিতে আদীশ্বরদার মত আর যাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একদিন ওই ঘরের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও প্রণালী বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা কয়েকটি চটি বই এক কোণ থেকে পেয়ে শিহরিত হয়েছিলাম মনে আছে। বইগুলি যে লুকিয়ে সেখানে রাখা তা অবশ্য অনায়াসেই বুঝেছিলাম।

সে বই ক'টি পরের দিনই খুঁজতে গিয়ে কিন্তু আর পাইনি। পাওয়ার আশাই

বৃথা। কারণ গোপনে চালান হবার পথে ক'দিনের জন্যে সেগুলি অস্থায়ী একটি আস্তানা ছুঁয়ে গিয়েছিল মাত্র।

সে যুগে একটু সজাগ থাকলে আমাদের বয়সী ছেলেদের বিপ্লবের পাতাল-বাহিনী বহ্নিস্রোতের সঙ্গে একটু আধটু সংযোগ কখনো না কখনো হতই। কেউ কিছু বলে না দিলেও আমাদের বয়সী ও অগ্রজদের মধ্যে কারা সে আন্দোলনে অল্পবিস্তর জড়িত তা আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঠিকই বুঝতে পারতাম।

বুঝতে পারিনি শুধু অতি নিকটের একজনের বেলায়।

আমি ও আমার মত আরো কয়েকজন যখন বিপ্লবী জগতের প্রান্তটুকুর বেশি ছুঁতে পারিনি তখন আমার প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গী ও বন্ধু একজন সহপাঠী যে সঙ্গোপনে সে জগতের ব্রতে আত্মসমর্পিত, একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তা জানতে পেরে একেবারে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

তখন সবে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠেছি। সকালে স্কুলে যাবার জন্যে বার হবার সময় বীরুমামার বাবার শাসন শুনলাম—স্কুলে যাবার সময় ভবানীপুর থানার সামনে দিয়ে যেন না যাই।

ভবানীপুর থানা তখন হরিশ মুখার্জি রোডে আমাদের পাড়ার গোবিন্দ ঘোষাল লেনের কাছাকাছি একটি ব্যারাকগোছের বড় বাড়িতে ছিল। সাধারণত সে রাস্তায় থানার সামনে দিয়ে আমাদের স্কুলে যাবার কথা নয়। গোবিন্দ ঘোষাল লেন দিয়েই আমরা যাওয়া-আসা করি।

হঠাৎ থানার সামনে দিয়ে যাওয়া বারণ হওয়ায় কৌতূহলের তীব্রতায় সেইটেই যে সেদিন একমাত্র স্কুলে যাবার রাস্তা হয়ে উঠল তা বলাই বাহুল্য।

রহস্যভেদ করতে থানার সামনে পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগে গলির ভেতরেই উত্তেজিত অনেকের মুখে আসল খবরটা পাওয়া গেল।

আমাদের স্কুলের শুধু নয়, আমামের ক্লাসেরই একটি ছেলেকে বাড়ি খানাতল্লাসী করে রিভলভার টিভলভার সমেত পুলিশ থানায় ধরে এনেছে। এখনও থানার সামনের ঘরেই তাকে নাকি বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা কাছাকাছি গেলে পাছে পুলিশ তার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব আছে বলে সন্দেহ করে, ধরপাকড় বা জুলুম করে এই ভয়েই শুধু আমাদের পাড়ার সমবয়সী সব ছেলেদের ওপরেই ও পথে না যাবার ওই নিষেধাজ্ঞা।

সে নিষেধাজ্ঞা আর পুলিশ জুলুমের ভয়, অবশ্য সেদিন আমার মত আরো কয়েকজনকেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যত ভয়ে ভয়েই হোক থানার সামনে দিয়ে

সেদিন স্কুলে গিয়েছিলাম। যেতে যেতে চকিত দৃষ্টিতে থানার বাইরের কামরাটা দেখে নিতেও ত্রুটি করিনি।

যেটুকু তাতে দেখতে পেয়েছিলাম তাতে সত্যিই একেবারে বিমূঢ় হযে গিয়েছিলাম বিস্ময়ে। এ বিস্ময়, খবরটা যা রটেছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় জানার দরুন নয়। এক পলকের চকিত দেখায় যাকে সেখানে দৃপ্ত কঠিন মুখে একটা টুলের ওপর বসে থাকতে দেখেছি বিস্ময় বিমূঢ়তা তাকে চিনতে পেরে।

সে সত্যিই আমাদের স্কুলের ছাত্র ও আমার একান্ত অন্তরঙ্গ সহপাঠীদের একজন, নাম তার গোপাল কৃষ্ণ বেরা। স্কুলের সেই ষষ্ঠশ্রেণী থেকেই আমরা দুজনে একসঙ্গে একই সেকশনে বরাবর পাশ করে আসছি।

গোপাল বেরা ছেলেবেলা থেকেই পাইকিরি ছাঁচে ঢালা আর সবাইয়ের থেকে একটু আলাদা নয়। কোথায় যেন একটা দুর্লভ শক্ত গাঁথুনি তার মধ্যে-আছে বলে অনুভব করে বরাবরই তার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আমি বোধ করেছি। আমাদের বন্ধুত্বে উচ্ছ্বাস কোথাও না থাকলেও চিরদিন তা গভীর ভাবে আন্তরিক ও অটুট।

কিন্তু আমি যে গোপাল বেরাকে এতদিন জেনে এসেছি তার ভেতর এই আরেক বেরা কোথায় লুকোন ছিল?

আমার সঙ্গে অত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও ঘুণাক্ষরে তা জানবার সুযোগ সে আমায় দেয়নি।

গোপাল বেরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ইতিহাসে সাহিত্য নিয়েই একটা বেশ কৌতুকের ব্যাপার এই সূত্রে মনে পড়ছে। কৌতুকটা আমিই তার সঙ্গে করেছিলাম একটি কবিতা নিয়ে।

পরিণত জীবনে কবি হিসেবে যাঁরা পরিচিত হন তাঁরা প্রায় সকলেই খুব ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন বলে শুনি। সে-রকম কিছু বাল্যকীর্তি কিন্তু আমার নেই। ছোটবেলায় মোট একটিমাত্র কবিতাই আমি লিখেছিলাম এবং সেই কবিতারই অসামান্য বরদায়িনী শক্তির প্রমাণ নিজের বেলাতেই পেয়ে সে পথ অনুসরণ করবার কোন চেষ্টাই করিনি।

সেই বরদা কবিতাটির কথাই আগে বলি।

একটু বেশি চঞ্চল ছিলাম বলে ছেলেবেলায় স্কুলের কোন কোন শিক্ষকের কাছে আমার সমাদর একটু বিশেষ ছিল। এই শিক্ষকদের একজন ছিলেন হরিদাস পণ্ডিত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পায়ে খড়ম, পরণে শুভ্র থান আর গায়ে শুভ্র উপবীত আর উড়ুনি দেওয়া তাঁর তেজঃপুঞ্জ চেহারাটা এখনো চোখের ওপর ভাসছে মনে হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। সাধারণত তাঁর ক্লাসটা টিফিনের আগে সকালের দিকেই থাকত আর সেই সময়টাতে বেশির ভাগ দিনই আমাকে ক্লাসের কোন বেঞ্চিতে নয়, ক্লাসঘরের বাইরে বারান্দায় রেলিংয়ের ধারে নীল ডাউন অবস্থায় দেখা যেত।

নীল ডাউন হবার কারণ আমার শিবের অসাধ্য চঞ্চলতা আর কথা বলার রোগ। নিজে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা করেও এ স্বভাব আমি শোধরাতে পারিনি, পণ্ডিতমশাইও অনেক বকুনি ও শাসনে কোন ফল না পেয়ে হতাশ ও নিরুপায় হয়ে বাইরে আমায় নীল ডাউন রাখার ওই ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থায় তিনিও শান্তিতে পড়ানোর ঘণ্টাটা কাটাতে পারতেন, আমিও সামান্য লজ্জাবোধটুকু কদিনে কাটিয়ে উঠে দোতলার বারান্দা থেকে স্কুলের জীবনযাত্রার অনেক কিছু নিশ্চিন্ত মনে দেখতে আর উপভোগ করতে পারতাম। এই নিশ্চিন্ত উপভোগের মধ্যে একদিন সভয়ে চমকে উঠলাম।

পণ্ডিতমশাই ক্লাসের ভেতর থেকে অমার নাম ধরে ডাকছেন।

এই খানিক আগেই তো আর সকলের সঙ্গে আমার ডিক্টেশনের খাতা তাঁর টেবিলে রেখে এসে ভুলে হঠাৎ পাশের সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলে ফেলে যথারীতি বাইরের বারান্দায় নীল ডাউন হতে এসেছি। এর মধ্যে উপরি আবার কি হল?

।। দশ ।।

বাইরের বারান্দায় নীল ডাউন অবস্থাটা খুব সম্মানের বা স্বাচ্ছন্দ্যের নয়। কিন্তু ভেতর থেকে হরিদাস পণ্ডিত মশায়ের ডাক শুনে মনে হল সারাদিন ওখানে ওই শাস্তি নিয়ে বসে থাকতে পেলে যেন বেঁচে যেতাম।

আমার অপরাধটা যে কি সেটা বুঝতে না পারার দরুনই অস্থিরতাটা এবার একটু বেশী হয়েছে। পণ্ডিতমশাই যা ডিক্টেশন দিয়েছেন সে সব বানান কি খুব ভুল করেছি?

কিন্তু বানান ভুলের অপরাধ তো আমর নতুন কিছু নয়। তাছাড়া পণ্ডিতমশাইকে এ ধরনের অপরাধে ক্ষিপ্ত হতে কখনও দেখিনি। কিছু বুঝতে না পেরে বাইরে না হোক ভেতরে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ক্লাসের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

তখনকার সময়ে আমাদের শিক্ষকদের জন্য বেশ একটু উচ্চাসনেরই ব্যবস্থা থাকত। বেশ বড় মাপের একটি নিচু কাঠের চৌকি, তার ওপর ছোট টেবিল আর চেয়ার। সেই উঁচু চেয়ারে বসে শিক্ষকেরা আমাদের কাছে একটু বেশী সুদূর হয়ে উঠতেন কি না জানি না, কিন্তু হরিদাস পণ্ডিতের মত কয়েকজনের এ রকম কৃত্রিম উচ্চতার প্রয়োজন ছিল না। এটুকু বলতে পারি, স্বাভাবিক অবস্থাতেই তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারতাম না। সেদিনকার সেই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের পর তো নয়ই। মাথা নিচু করে তাঁর উচ্চাসনের কাছে গিয়ে দাড়াবার পর তাঁর সম্ভাষণে একটু কেমন অবাকই হলাম। তাঁর কানমলা কি গাঁট্টার উপক্রমণিকা হিসেবে যে রকম কটুর ভাষায় আমরা অভ্যস্ত, এ তো ঠিক তা নয়। কোথায় যেন একটু সূক্ষ্ম তফাত যে আছে মনের ওই অবস্থাতে তা লক্ষ্য না করে পারলাম না।

সঠিক ভাবে বিবরণটা দিতে পারব না। কিন্তু দুরু দুরু বুকের ভয়ের কাঁপুনি সেদিন খানিক বাদেই যে কয়েকটি মাত্র ধাপে বিস্ময় বিহ্বলতায় পৌঁছে দিল সেটুকু মনে আছে। প্রথমে তাঁর একটু অন্য স্বরের ধমকে মেঝে থেকে মুখ তুলে চাওয়া, তারপর সেই সুগম্ভীর মুখে চোখে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস দেখা, আর তৃতীয় ধাপে তাঁর অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শোনা—

খাতায় এ ছাই-ভস্ম কে লিখেছে? তুই?—প্রশ্নটা এই জাতীয়, কিন্তু গলার স্বরে রূঢ়তার বাষ্প নেই।

খাতায় ছাই-ভস্ম লেখার অপরাধটা স্বীকার করবার পর একেবারে যেন ভোজবাজী হয়ে গেছে চোখের ওপরে। শাসন ও ভৎর্সনা ছাড়া যাঁর কাছে কোনদিন কিছু আশাই করিনি তিনি হঠাৎ প্রসন্ন স্নেহার্দ্র স্বরে খাতাটা দিয়ে আমার মাথায় একটু মৃদু আঘাত করে বলেছেন, ও-ওঃ কবিতা লেখা হয়েছে, উনি কবি হবেন!

খাতাটা তারপর আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বিদায় দিয়েছেন।

বিমূঢ় বিহ্বল ভাবে আমি তখন আবার যথাস্থানেই নীল ডাউন হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁর ধমকে থামতে হয়েছে।

বাইরে যাচ্ছিস্ কোথায়? নীল ডাউনের শখ এখনো মেটেনি বুঝি! যা নিজের জায়গায় গিয়ে বোস।

তাই গিয়ে বসেছি। আর সেই থেকে হরিদাস পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে আমায় বাইরে নীল ডাউন হতে আর কখনও হয়নি।

স্বভাব-টভাব শুধরে আমি যে ক্লাসের শান্ত নিবাক ছেলেদের একজন হতে পেরেছিলাম তা নয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নিয়মভঙ্গ করেই ফেলতাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের একটু ভ্রূকুটি বা মৃদু ধমকের বেশী কোন শাস্তি আর পাইনি।

খাতায় লেখা যে ছাইপাঁশটুকু আমার ভাগ্যে এমন আলাদীনের প্রদীপ হয়ে উঠেছিল, সেই গুটি চার লাইনের কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন মাত্র অস্পষ্টভাবে এখন মনে করতে পারি।

কবিতাটি নৌকোর ওপর লেখা। ছেলেবেলার জগতে এত কিছু থাকতে হঠাৎ নৌকোর ওপর কেন কবিতার কলম চালাতে গিয়েছিলাম তা বোঝা খুব অবশ্য কঠিন নয়। বাড়ির সামনের আদিগঙ্গায় দিন রাত জোয়ার ভাটায় ছোট বড় সালতি ডিঙি বজরা ভড়ের যাওয়া আসাই আমার কবিতার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়।

যা লিখেছিলাম তার প্রথম ক'টা লাইন এই রকম—দিনরাত নদী দিয়ে কত নৌকো যায়, ধরতে পারি যদি কেউ সাঁতার শেখায়।

পরের দুটি ছত্রে ওই মূল সুরেরই বিস্তার ছিল বোধ হয়।

এই আহা মরি কবিতাটি অমন হাতে হাতে আমায় কাব্যের যাদুকরী ফল পাইয়ে দিলেও তারপর কয়েক বছরের মধ্যে কবিতার ত্রিসীমানায় আর ঘেঁসিনি।

সে রাজ্যে পা বাড়াতে হল আমার বন্ধু সেই গোপাল বেরার-ই উৎপীড়নে।

হ্যাঁ উৎপীড়ন ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না।

তখন ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি। গোপাল আর আমি সে ক্লাসে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতাম। গোপালের অনেক কিছুতেই উৎসাহ। তার মধ্যে শারীর-চর্চা যেমন ছিল তেমনি কাব্য সাধনাও

প্রায়ই সে আমায় একটি দুটি নিজের লেখা কবিতা এনে শোনাত। কবিতাগুলির একটিও মনে নেই। আর কিছু না থাক সেগুলিতে ছন্দ মিলের খেলা যে ছিল এইটুকু স্মরণ আছে।

প্রায় নিত্যই তার স্বরচিত কবিতা শুনতে শুনতে হীনমন্যতায় মরিয়া হয়ে একদিন স্কুলে এসেই ক্লাসে বসবার আগে আমি তাকে একটি কবিতা শুনিয়ে থ' করে দিলাম। সে কবিতা থ' করবার মতই বটে।

তার প্রথম এ ক'টি ছত্র এখনো ভুলিনি সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

—ব্যাঘ্র আমার সোনার ব্যাঘ্র
হিংস্র তুমি তো নও রে,
গুপ্ত প্রেমের মধু-চুম্বনে
পরাণ চুমিয়া লও রে।
আশ্রয় করি বনাধার
আশাপথ চাহি থাকো তার,
শুধু বিজয়ায় মধু কোলাকুলি
দেখিলেই তুমি দাও রে।

এ কবিতা পড়বার পর দু-চারবার একটু সবিস্ময় প্রশ্নে সত্যিই সেটা আমার লেখা কি-না জানতে চেয়েও আমার নীরব মৃদু হাস্যে তার উত্তর বুঝে নিয়ে গোপাল বেরা কেমন একটু আচ্ছন্ন অভিভূত ভাবেই স্কুলের পর বাড়ি ফিরেছিল মনে আছে। তারপর দিন স্কুলে এসেছিল একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে। এসে আমায় এই মারে তো সেই মারে।

বিশেষ করে আমার মুখে হাসি দেখে সে আরো খাপ্পা।

তুমি হাসছ! হাসতে তোমার লজ্জা করে না!

কেন, লজ্জা করবার কি হয়েছে;—আমি তাকে আরো জ্বালিয়ে নির্বিকার ভাবেই বলেছিলাম।

লজ্জা করবার নেই? ও কবিতা তো এ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় বেরিয়েছে!

তা তো বেরিয়েছেই!—আমি অম্লান বদনে স্বীকার করেছিলাম।

আর অন্যের লেখা ও কবিতা তুমি নিজের বলে চালিয়েছ !—গোপাল ধিক্কার দিয়ে বলেছিল।

নিজের বলে চালিয়েছি ! কখ্খনো না !—এবার আমি আমার কৌশলটুকুর জোরে ন্যায়ের ফাঁকিতে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম—তুমি রোজ আমায় কবিতা লিখে এনে শোনাও, আমিও তোমায় একটা কবিতা লিখে এনে শুনিয়েছি। সেটা আমার কি কার লেখা তা তো ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করিনি। তুমি যদি সেটা আমার বলে ধরে নিয়ে থাকো সেটা কি আমার অপরাধ ?

কথোপকথনের যে বিবরণ দিলাম সেটা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক অবশ্যই নয়। তবে ভাষার অল্পবিস্তর তফাত থাকলেও আলাপটা ওই ধরনেরই হয়েছিল আর রাগারাগির বদলে সেটা শেষ হয়েছিল হাসাহাসিতেই।

আমি যে গোপাল বেরার কবিতা-বর্ষণের শোধ নিতে ওই চাতুরিটি করেছিলাম সেটা অপকটে স্বীকার করার পর আমাদের কবিতার প্রতিযোগিতা আর অগ্রসর হয়নি।

আমায় না শোনালেও লুকিয়ে লুকিয়েও কবিতা সে আর লিখেছিল বলে মনে হয় না, কারণ সেই সময় থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে আরো সাংঘাতিক কোন সাধনায় সে মেতে উঠেছিল নিশ্চয়।

যে কবিতার অংশটি নিয়ে বন্ধু গোপাল বেরার সঙ্গে অমন কৌতুক করেছিলাম সেটির বাকি ছত্রগুলি তখন পড়ে থাকলেও আমার কিন্তু মনে নেই। কবিতাটি যে কার লেখা তাও আমি এখনও জানি না। তখনকার ভারতবর্ষ থেকে কবিতাটি কপি করবার সময় লেখকের নাম খুব সম্ভব লক্ষ্যই করিনি।

আসল কথা, কবিতা সম্বন্ধে কোনদিন যে আমি উৎসাহিত হব, তখনকার দিনের প্রথম শ্রেণীতে ওঠবার আগে আমি কখনো কল্পনাই করতে পারিনি।

স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ওঠা অনেক দিক্ দিয়ে আমার জীবনের একটা বড় রকমের মোড় ঘোরানো ঘটনা। এমনিতে স্কুলে সবার উঁচু ক্লাসে ওঠাটা নেহাত মামুলী রুটিন-বাঁধা ব্যাপার। একেবারে গবেট না হলে ছেলেরা প্রায় সবাই স্কুলের শেষ ধাপে স্বচ্ছন্দেই অবাধে উঠে আসে, আর তারপর সে ধাপ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে কলেজের জগতে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রথম শ্রেণীটা তাদের কাছে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় কিছু নয়।

আমার কাছে কিন্তু তাই। তখনকার দিনেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার ব্যাপারে বয়সের একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল। ষোল বছরের কম বয়স হলে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাওয়া যেত না।

পরীক্ষার সময় ষোল-বছর পূর্ণ না হওয়ার জন্যে প্রায় প্রত্যেক বারই দু-একটি ছেলেকে আর এক বছর স্কুলে আটকে থাকতে হত। আমাকেও থাকতে হয়েছিল, তবে এক নয় অতিরিক্ত পুরো দুটি বছর। আমার বেলা প্রথম শ্রেণীতে ওঠার পর দেখা গেছল যে পরীক্ষা দেবার সঠিক বয়সে পৌছাতে আমার তখনও দুটি বছর বাকি। সবশুদ্ধ তিন বছরের জন্যে তাই একই ক্লাসে আমি আটকে থাকলাম। আমার দু'দল সহপাঠী আমায় পিছনে ফেলে রেখে কলেজ-জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

এ দুর্ভাগ্য এড়াবার উপায় যে একেবারে ছিল না তা নয়। আমার বীরু মামাকে তো এ নিয়মের বাধা ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। দু' বছরের নয়, এক বছরের জন্যে তার বয়স কম পড়েছিল। তার বাবার চেষ্টায় আমাদের স্কুল থেকে অন্য স্কুলে শুধু সে ট্রান্সফারই নিলে না, কোথা থেকে এক পুরোন কোষ্ঠী বার করে নিজের বয়সটাও এক বছর বাড়িয়ে নিলে।

সে রকম কোন জন্মপত্রিকা দাখিল করার ক্ষমতার অভাবে দু-দুবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিতে পেরে একই ক্লাসে আমি তিন বছর কাটাতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু সেটা আমার পক্ষে খুব একটা দুর্ভাগ্য কি বলা যায়? আজ এই বিকেলের আলোয় পিছন দিকে তাকিয়ে আমি অন্তত তা বলতে রাজী নই।

একই ক্লাসে পর পর তিন বছর আটকে থাকার দরুন পরীক্ষা পাসের নিয়মিত সাধারণ পড়াশুনা সম্বন্ধে আমি যে বেশ একটু উদাসীন হয়ে উঠলাম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনটা যে আমার অনেক দিকে সজাগ হবার অবকাশ পেল এটাও ঠিক।

বই পড়ার নেশা আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রবল। পাঠ্য বইও মনোযোগ দেবার দায় থেকে অনেকখানি মুক্তি পেয়ে সেই নেশায় আমি রাশ ছেড়ে দিলাম বলা যায়। বাংলা ইংরেজী ভাল মন্দ সেকেলে একেলে হাতের কাছে পেলে কোন বইই আমি পড়তে বাকি রাখতাম না।

পড়ার এত ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও লেখা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না বললেই হয়। সে উৎসাহ প্রথম জাগবার মূলে যে দুটি কারণ ছিল, তার একটি হল বাড়ি থেকে স্কুল যাবার পথের একটি গলি, আর অন্যটি সেই ছেলেবেলার মত আমার কলম-ধরা হাতে এক দিনের একটি আকস্মিক অহেতুক কবিতা লেখার সুড়সুড়ি।

স্কুলের রাফ খাতার পিছন দিকে একটি পাতায় কবে যে কাটাকুটি করে একটি লাইন কবিতা লেখার চে   করেছিলাম তা মনেও ছিল না। পড়বি তো পড় সেই লেখাই

চোখে পড়ল ক্লাসের একজন শিক্ষকের। মজার ব্যাপার এই যে, সেই ছেলেবেলার মত এবারের শিক্ষকও সংস্কৃতেরই পণ্ডিত।

এ পণ্ডিতমশাই কিন্তু চেহারায় চরিত্রে একেবারে আলাদা জাতের মানুষ। নাম রণেন গুপ্ত হলেও রণেন পণ্ডিত বলেই সবার কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন, পেশায় শিক্ষক ও বিদ্যায় পণ্ডিত হলেও চেহারা তাঁর ব্যায়ামবীরের মত। নিয়মিতভাবে শারীরচর্চা সত্যিই যে তিনি করতেন তাঁর সবল পেশীবহুল দেহটাই ছিল তার সাক্ষী। ভাব ভঙ্গী ভাষা সব কিছুই ছিল তাঁর বলিষ্ঠ। সংস্কৃত পণ্ডিত বলতে যে নিরীহ নির্বিরোধ শান্ত গোছের মানুষের ছবি মনে আসে তিনি ছিলেন তার বিপরীত। সংস্কৃত ব্যাকরণের সার মুখস্থ করতে শেখাতেন যেন স্লোগানের মত জোর দিয়ে। আমাদের সংস্কৃত শেখাবার অবসরে যে সব গল্প শোনাতেন বা আলোচনা করতেন তা স্কুলের চেয়ে কুস্তির আখড়ারই উপযুক্ত।

সেদিন ক্লাসের আর সকলের সঙ্গে তার আদেশে কিসের এক শব্দরূপ লিখে খাতাটি তাঁর টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। শব্দরূপ দেখার পর কি করে পিছনের পাতার সেই কবিতাটির খসড়া তার চোখে পড়ে য য জানি না।

তারপর আমায় যেমন চমকিত, তেমনি বিস্মিত বিহ্বল-করা সে কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা!

খাতার পিছন দিকের পাতায় যা আমি অনেক কষ্ট করে লেখবার কসরৎ করেছিলাম সেটি 'ভারত আমার ভারত আমার!' গোছের দ্বিজেন্দ্রলালের সুপরিচিত কবিতার অতি অক্ষম একটি অনুকরণ। কবিতাটির বিষয় ছিল হিমালয়, এইটুকু ছাড়া আর একটি লাইনও আজ মনে করতে পারছি না।

সেই অক্ষম কবিতা আর রণেন পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার কাছে কাব্যের দরজা কিন্তু একটু অভিনব ভাবে খুলে দিলে। খুলল সম্পূর্ণ উল্টো দিক দিয়ে।

রণেন পণ্ডিতমশাইয়ের প্রশংসায় বেশ একটু ফুলে ফেঁপে যদি উঠে থাকি সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেদিন স্কুলের ছুটির পর সেই স্ফীতির ফানুস কিন্তু দেখতে দেখতে ফুটো হয়ে চুপসে গেল। ফুটো হল আমার সহপাঠী ক'টি বন্ধুর সমালোচনায়।

না। ঈর্ষা হিংসার বিরূপ সমালোচনা তা নয়। সে সমালোচনা যারা করেছিল সহপাঠী হলেও তারা বয়সে ও বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার প্রতি তাদের প্রীতি ভালবাসা যে কতখানি ও অকৃত্রিম বহু প্রমাণে তা জানতে আমার বাকি ছিল না। বন্ধুত্বের সঙ্গে একটা মুগ্ধ শ্রদ্ধাও তাদের প্রতি আমার ছিল।

এই অকৃত্রিম বন্ধুদের কেউই আজ আর নেই। অনাথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার স্কুলজীবন শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যায়। আর হক্ এই পদবীটুকু ছাড়া যার নামের বাকি অংশ আমার মনে নেই, সে কলেজে ঢোকবার কিছুকাল বাদেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিল বলে জানি। সেই থেকে আর তার কোন খবর পাইনি।

সুকুমার ও অনাথদা আমাদের পাড়ারই ছেলে। দুজনের মধ্যে একটা পারিবারিক সম্পর্কও ছিল। সুকুমার আমারই মত বয়স কম হবার জন্যে আগের বছর পরীক্ষা দিতে না পেরে প্রথম শ্রেণীতেই আটকে আছে আর অনাথদা প্রায় তিন বছর লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পর আবার নতুন করে আমাদের ক্লাসে এসে ভর্তি হয়েছেন।

অনাথদার ছেড়ে যাওয়ার ইতিহাস একটু অদ্ভুত। ষোল সতেরো বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হতে হতে তিনি হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তখনকার দিনে যা কিছু সম্ভব সব চেষ্টা করেও বহুদিন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনাথদা বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দুঃখে শোকে তাঁর মা যখন প্রায় মৃত্যুমুখে তখন কিভাবে যেন খবর পাওয়া যায় যে অনাথদা হরিদ্বারের এক ধর্মশালায় সন্ন্যাসী হয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ হরিদ্বারে লোক পাঠিয়ে অনাথদাকে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তিনিও তখন সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় প্রায় মারা যেতে বসেছেন।

অনাথদাকে সেখান থেকে কোনরকমে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসায় শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলা হয়। সুস্থ হবার পর আবার নিজের ইচ্ছাতেই তিনি স্কুলে এসে আমাদের ক্লাসেই ভর্তি হন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় যা ক'দিনের মধ্যেই ওই বয়সের প্রীতি ভালবাসা থেকে প্রগাঢ় মুগ্ধ শ্রদ্ধায় গিয়ে পৌঁছোয়।

অনাথদার সঙ্গ ক বছরই বা পেয়েছি। স্কুলে'এক বছর বাদেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলেজে গিয়ে ঢুকেছেন। কলেজের ছাত্র হয়েও আমাকে তিনি অবশ্য ভোলেননি বা পরিত্যাগ করেননি। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সমান ভাবেই রেখে গিয়েছেন।

কিন্তু এ যোগাযোগ তো মাত্র দুটি বছরের বেশী নয়। তার কলেজ জীবনের দ্বিতীয় বছরেই আমাদের পাড়ার একটি ক্লাবের নববর্ষ উৎসবের পরই তিনি আমাদের ছেড়ে যান।

মাত্র এই ক'টি বছরের অন্তরঙ্গতায় আমার জীবনে যে প্রভাব তিনি রেখে গিয়েছেন তা বর্ণনা করে বোঝাবার ভাষাই আমি পাই না।

আমার সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে অপরিশোধ্য ঋণ তার কাছেই।

॥ এগারো ॥

অনাথদা আমাদের পাড়ারই ছেলে। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দুজনেই সাধারণ মাপের বাইরে। ওই বয়সেই তাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা কিছু দেখতাম যাতে তাদের আর সকলের থেকে একটু আলাদা মনে হত। বয়সে তারা একটু বড় বলেই এই পার্থক্য-বোধটা জাগেনি। ক্লাসে নানা বয়সের ছেলে পড়ে। তাদের চেয়ে ঢের বেশী বয়সের দু-চারজন ঠাট্টা-ইয়ার্কি থেকে ঝগড়া মারামারির সঙ্গী হয়ে উঠেছে অনায়াসে।

কিন্তু অনাথদা বা সুকুমারের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারতাম না। কেন যে পারতাম না তার কারণ বোঝার চেষ্টা করে এখনো অবাক হই। দুজনেই ওরা মিশুক বড় কম ছিল না। সেই সময়টা আমার প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল ওরাই। নিজেদের চারিধারে দূরে সরিয়ে রাখার মত কোন গাম্ভীর্যের গণ্ডিও তারা টেনে রাখত না তবু তাদের প্রতি ছেলেবয়সের প্রীতি ভালবাসার সঙ্গে একটা সম্ভ্রমের আভাস যে মিশে থাকত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের চরিত্র আর ব্যবহারের স্নিগ্ধ মাধুর্যের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যের লক্ষণই হয়তো এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভ্রমবোধের মূল।

পরীক্ষা দেবার পক্ষে বয়সটা বেশ কম থাকায় তখনকার প্রথম শ্রেণীতে উঠেও তিন বছর আমায় সেই এক ক্লাসেই আটকে থাকতে হয়। একদিক দিয়ে নিষ্ফলা এই তিনটে বছর আমার জীবনের অনেক কিছু ওলটপালট করে দিলেও কোন কোন ব্যাপারে শাপে বর যে হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে পারব না।

নিয়ম করে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পড়াশুনা করে যাওয়ার মেজাজ মর্জি যেমন আমার নষ্ট হয়ে গেছে, অবাধ ও প্রায়-উদ্দেশ্যহীন পড়াশুনা আর ভাবনা চিন্তার খেয়ালীপনার সঙ্গীসাথীদের তুলনায় স্কুল আর বাড়ির জগতের বাইরের পৃথিবীটা তেমনি বেশ একটু আগেই যেন আবিষ্কার করেছি।

পরোক্ষ ভাবে হলেও এ আবিষ্কারের প্রধান প্রেরণা আর উৎসাহ তখন পেয়েছি অনাথদার কাছ থেকেই।

পাড়ায় তখন অনাথদার প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণায় একটা সাহিত্যের বৈঠক গড়ে উঠেছে। হপ্তায় হপ্তায় প্রতি রবিবার সেখানে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পড়া হয়। উদ্যোক্তা প্রত্যক্ষ-

ভাবে আমরা হলেও পিছনে তুলসীমামা ও পাড়ার কয়েকজন অগ্রজ দাদাদের সমর্থন সাহায্য ভাল ভাবেই ছিল।

এ বৈঠকের নাম ছিল 'সচল সঙ্ঘ'। নামটা নাকি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ। নামটা আমিই দিয়েছিলাম তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল আছে না জেনেই। সে ভুলটা যাঁরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা সংশোধনের কথা কিন্তু বলেননি। নিজেরাই কি একটা ব্যাকরণের যুক্তি বার করে সচলতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

আমাদের শুভানুধ্যায়ী সমর্থক সহায়ক এই অগ্রজদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষ ভাবে না বললে নয়। তাঁর নাম ননীগোপাল মজুমদার।

সচল সঙ্ঘের উৎসাহদাতা হিসেবে আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয়, তখন যতদূর মনে পড়ছে তিনি সবে এম. এ. পাশ করে অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাকরেদ হিসাবে তাঁর সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ করছেন। ননীগোপাল মজুমদারের মুখেই পুরাতত্ত্বের রহস্য রোমাঞ্চময় জগতের প্রথম আভাস আমরা পাই। সচল সঙ্ঘের বৈঠকে তিনি দু-একবারের বেশী আসেননি। তবু আমাদের একটি বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর 'সংক্রান্তি' নামে সভাপতির ভাষণটির নাম শুধু নয় বেশ কিছুটা বক্তব্যও অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে এসে যেন মনে করতে পারি। 'সংক্রান্তি' নামটাও সেদিন যেমন অভিনব লেগেছিল, তেমনি তার বক্তব্যও। সৃষ্টির মূল রহস্যের খেই যে আছে বৃত্তের মধ্যে, তার শেষ যে কোথাও নেই, সমাপ্তি মানেই যে সূচনা এই রকম কয়েকটা কথা তাঁর ভাষণে তিনি এমন সুন্দর করে বলেছিলেন যে, আজও যেন কানে লেগে আছে।

ননীগোপাল মজুমদার সাহিত্যের পথ বেছে নিলে অনেক দূরে হয়তো যেতে পারতেন, কিন্তু সাহিত্য নয় পুরাতত্ত্বই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্যতম শিষ্য আর উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রত্নতত্ত্বের জগতে কি কীর্তি যে তিনি রেখে গেছেন তা শিক্ষিত সমাজের কারুর আজ জানতে বাকি নেই। দুঃসাহসিক এক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে সিন্ধুর মরুভূমিতে ধর্মান্ধ নৃশংস দস্যুদের হাতে কিভাবে তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন সহকারীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, পুরাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে সে শোচনীয় কাহিনী অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

ননীগোপাল মজুমদার সচল সঙ্ঘের নিয়মিত সভ্য না হলেও আমাদের পাড়ারই একটি বাড়িতে তাঁর সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য আমাদের হত। আমার সহপাঠী বন্ধু সুকুমারেরই সেটি মামার বাড়ি। সুকুমারের মামা ছিলেন আচার্য নলিনী মোহন শাস্ত্রী। আমার কাছে তিনিই ছিলেন সাহিত্য সাধনার আদর্শ।

যেমন সৌম্য প্রশান্ত তাঁর চেহারা, তেমনি ছিল তাঁর মধুর স্নেহময় ব্যবহার। তিনি যে খুব বড় একজন পণ্ডিত মানুষ আর তাঁর সাহিত্যচর্চাও যে অনেক ওপরের স্তরের এসব কথা আমাদের অগ্রজদের কাছে শুনতাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তিনি আলাপ করতেন ঠিক যেন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত।

তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল্য বোঝার মত বয়স হবার আগেই তাঁর লেখা গান প্রতি বছরের সরস্বতী পূজায় আমাদের পাড়ার ক্লাবে আমরা গেয়েছি। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন পাড়ায় সরস্বতী পূজোর ভাসানের দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে গাইবার গান তিনিই লিখে দিয়েছেন।

তখন কিছুদিন সুকুমারের বাড়ির সামনের বড় উঠোনে ব্যাডমিণ্টন খেলতে যেতাম। সেই সময়েই নলিনী মোহন শাস্ত্রীকে দেখি। তার নীরব নিষ্কাম সাহিত্য সাধনার কথাও তখন জানতে পারি।

সুকুমার তার মামার লেখা কবিতার ক'টি খাতা আমায় দেখিয়েছিল। পাতার পর পাতা ভর্তি অজস্র কবিতা। বোঝবার যেটুকু ক্ষমতা তখন হয়েছে তাতে কবিতাগুলি অপূর্ব বলেই মনে হয়েছিল। কবিতাগুলি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম তেমনি অবাক হয়েছিলাম সেগুলি সম্বন্ধে আরেকটি খবর শুনে। নলিনী মোহন শাস্ত্রী নাকি সে সব কবিতার একটিও কোথাও ছাপতে দেন না। শুধু লিখে যাওয়াতেই নাকি তাঁর আনন্দ। নেহাত যদি ছাপেন তাহলে চল্লিশ বছর হবার আগে নাকি কোন মতেই সে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না।

কথাগুলো একটু অদ্ভুত বলেই মনের মধ্যে এখনো একেবারে গেঁথে আছে। নলিনী মোহন শাস্ত্রীর বয়স তখন চল্লিশ নিশ্চয়ই পার হয়নি। আর আমার বয়স তখন তের চোদ্দর বেশী নয়। তার এ সঙ্কল্প কিন্তু আমার মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে ছিল। তখন সবে লেখার নেশা মনে লেগেছে ; তা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণে অন্ততঃ চল্লিশ বছরের আগে কোন লেখা ছাপাবার চেষ্টা না করার সঙ্কল্প অনেকদিন ধরে রেখেছিলাম।

এই নলিনী মোহন শাস্ত্রীর বাড়িতে ননীগোপাল মজুমদার প্রায় আসতেন। পরে তিনি নলিনী মোহন শাস্ত্রীর এক কন্যাকে বিবাহও করেন।

প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে কি রহস্য রোমাঞ্চ উত্তোজনা যে আছে মজুমদার মশাইয়ের কাছেই তা প্রথম জেনেছি। এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নিজের আগ্রহ ও তন্ময়তা এত বেশী ছিল যে, আমাদের মত ছেলেমানুষদের কাছেও নিজের কাহিনীতে বিভোর হয়ে সে সব কথা বলে যেতেন।

কাগজপত্র বা বইয়ে পড়বার অনেক আগে তাঁর কাছেই মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের আশ্চর্য কাহিনী প্রথম শুনি, শুনি সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের নায়ক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অসামান্য আর প্রায় সৃষ্টিছাড়া মানুষের কথা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু প্রত্নতত্ত্বের জগতেরই আশ্চর্য পথিকৃৎ ছিলেন না। তথ্যনিষ্ঠ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার আগে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ অমন জীবন্ত বাস্তবতা আর কারুর কলমে পায়নি।

অন্য সব বইয়ের আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণের কথা' তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়েছি। পড়ে বিহ্বল হয়ে থেকেছি বহু কাল সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের মোহময় আচ্ছন্নতায়।

নন্দগোপাল মজুমদারের কাছেই প্রথম শুনি যে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার কোন বই নিজের হাতে বসে লিখতেন না। একজন অনুলেখককে তিনি শুধু মুখে মুখে কাহিনী বলে যেতেন। সে বলাও নাকি ছেদ টেদহীন অনর্গল।

ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব একেবারে নখদর্পণে না থাকলে আর সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও প্রায় অলৌকিক না হলে এ ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস মুখে মুখে রচনা করে যাওয়া অসম্ভব।

শুধু এই দিকেই না, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ব্যাপারেই নাকি প্রায় অবিশ্বাস্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উনিশ শ' তিরিশ সালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা না গেলে তার প্রতিভার আরো কি আশ্চর্য দান হয়তো আমরা পেতে পারতাম।

আমাদের 'রচনা সঙ্ঘ' [illegible] বড় সাহিত্যের বৈঠক কোনদিন ছিল না। কিন্তু তারই কল্যাণে নন্দগোপাল মজুমদারের মত মানুষের সংস্পর্শে এসে সে যুগের শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জগতের ধারার সঙ্গে যেটুকু পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল তার দাম বড় কম নয়।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ওই 'রচনা সঙ্ঘের' সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়েই প্রথম 'সবুজ পত্র' কাগজটির সন্ধান ও তাতে প্রমথ চৌধুরীর লেখার পরিচয় পাই বলে মনে আছে। এ সন্ধানের নায়ক অবশ্য অনাথদা। সে-ই কোথা থেকে সবুজপত্র-র একটি সংখ্যা যোগাড় করে এনে রীতিমত উত্তেজনা নিয়ে আমায় পড়িয়েছিল।

সবুজপত্র যে-জগতে তখন সাড়া তুলেছে সাহিত্যের সে মহলের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই তখন ছিল না। তবু সবুজপত্র আর প্রমথ চৌধুরীর লেখা আমাদের

সাহিত্য নিয়ে ভাবনা চিন্তার জগৎ বেশ একটু ওলটপালট করে দিয়েছিল এটুকু ভাল করেই মনে আছে।

নতুন করে মনকে নাড়া দেবার বেশ কিছু চিন্তা ভাবনার ঢেউ নানা দিক থেকে তখন আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে। পৌঁছে দেবার কাজটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাথদাই করেছে। গোলগাল নাদুস নুদুস স্নিগ্ধ পবিত্র চেহারার একটি ছেলে। দেখলে তাকে নেহাত নিরীহ গোবেচারা ছাড়া আর কিছু ভাবা শক্ত। তার ভেতরে একটা উজ্জ্বল প্রাণের স্রোত সারাক্ষণ অমন সবেগে যে বইছে বাইরে থেকে তা বোঝবার কোন উপায় নেই।

অনাথদা সবকিছু সম্বন্ধে সজাগ। শক্তিমান বেতারযন্ত্রের মত দশদিকের সব চিন্তা-তরঙ্গ ধরবার জন্যে সে যেন সারাক্ষণ তার সূক্ষ্ম সব তার আকাশে তুলে রেখেছে।

অনাথদা তখন কলেজে। আমি তখন স্কুলে। কলেজে এসে আমার সঙ্গে কিন্তু সে দেখা করবেই। এই সাক্ষাতের জন্যে আমিও বড় কম উদ্‌গ্রীব থাকতাম না। তার সঙ্গে দেখা মানে কোন্ দিন যে কি নতুন কথা শোনা তার ঠিক নেই। সেইটেই একটা উত্তেজনা।

পড়াশুনা ও সাহিত্য সম্পর্কিত ব্যাপারে অনাথদা তখন প্রায় আমার নিত্যসঙ্গী। শুধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সন্ধান করতে যাওয়ার ব্যাপারে সে সঙ্গে ছিল না। হয়তো তখন কলেজে গেছিল বলেই।

হ্যাঁ, শরৎচন্দ্রকে সেই স্কুলে পড়বার সময়ই একদিন সাহস করে খুঁজতে গিয়েছিলাম। সাহসটা অবশ্য নিজে থেকে করিনি। সেটা যিনি জুগিয়েছিলেন তিনি তুলসী মামাদের বন্ধু একান্ত ভক্তি-ভালবাসার পাত্র অগ্রজদের একজন। 'সান্নুদা' নামে তিনি সেকালে আমাদের নিজেদের পাড়াতে তো বটেই একালেও সমস্ত ছায়া-ছবির জগতেই পরিচিত। সান্নুদা সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে গেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহী চেহারা চরিত্র থেকে আচারে ব্যবহারে অমন একজন যথার্থ চির যুবার স্মৃতি তাঁর পরিচিত মহল থেকে সহজে বোধহয় মুছে যাবে না।

সেটা ছুটির দিন ছিল না, তা সত্ত্বেও স্কুল পালিয়ে বাড়িতে বসে কি যেন একটা করছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ বাড়ির বাইরে সান্নুদার ডাক শুনে অবাক।

বাইরে বেরিয়ে তাঁর প্রস্তাব শুনে ততোধিক।

শরৎ চাটুজ্যেকে দেখতে যাবি ?—সান্নুদার প্রশ্ন।

শরৎ চাটুজ্যেকে দেখতে যাব! কথাটার পুরো তাৎপর্য বুঝতেই আমার বোধহয় বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

শরৎ চাটুজ্যে তখন আমার কাছে অজানা কোন নাম নয়। মামাদের দৌলতে তাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশ্যে ও গোপনে পড়েছি। নানা মহলে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও তাঁর লেখার বিষয়ে নানা আলোচনা শুনেছি।

কিন্তু লেখার জগতের সেই রূপকথার মানুষকে যে চাক্ষুষ দেখতে যাওয়ার কথা ভাবা যায় সেকথা মনেও হয়নি।

সানুদার অদম্য উৎসাহে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হলেও শরৎ চাটুজ্যেকে সত্যি সত্যি স্বচক্ষে দেখতে পাবার কোন্ আশা আমার মনে ছিল না।

দেখা কিন্তু সত্যিই হয়েছিল। আর সে দেখাটা কয়েকটি বিশেষ কারণে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতার একটি বলে আমি মনে করি।

শরৎচন্দ্রকে খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে অবশ্য সহজ হয়নি। সানুদা শরৎচন্দ্রের ঠিকানা ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে ঠিকনায় ভুল থাকলেও তাঁর ধৈর্য আর ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের কোন ত্রুটি ছিল না। শেষ পর্যন্ত শিবপুরের অত্যন্ত প্রাচীন শ্রীহীন একটি পাড়ার একটি জীর্ণ গোছের বাড়িতে সশরীরে সত্যিই আমরা শরৎচন্দ্রের দর্শন পেলাম।

দর্শন পাবার পর প্রথম বিস্ময় জাগল তাঁর চেহারায়। এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের যা কিছু ছবি চোখে পড়েছে তা সবই গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত। কিন্তু এ যে একেবারে মেঘমুক্ত মুখ!

শরৎচন্দ্র সেই সময়েই বোধহয় এদেশে ফেরবার পর প্রথম দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলেন। তাঁর মুখ তখন চাঁছাছোলা পরিষ্কার।

সেই পরিচ্ছন্ন মুখ দেখে যত অবাক্ ই হই তার চেয়ে বেশী হয়েছিলাম তাঁর ঘরটিতে বসে। একতলাতেই অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি ঘর। লম্বায় চওড়ায় ছ হাত চার হাতের কম বই বেশী হবে না। মেঝেতে কম্বল গোছের কিছুর উপর একটি গেরুয়া রঙের চাদর পাতা। ঘরের একদিকে একটি নিচু দু' থাকের সস্তা কাঠের শেল্‌ফে কিছু বই আর সামনের লম্বা দেয়ালের একটি হুকে একটি বন্দূক আর তার ওপর একটি রুদ্রাক্ষের মালা টাঙানো।

শরৎচন্দ্রের ঘরের সবকিছুর ওপরই সেদিন তীব্র আগ্রহ কৌতূহলে চোখ বুলিয়ে ছিলাম, স্বয়ং শরৎচন্দ্রকে যত না লক্ষ্য করেছিলাম তার চেয়ে বেশী বোধহয় করেছিলাম দেয়ালে টাঙানো ওই বন্দুক আর তার ওপরকার রুদ্রাক্ষ মালাটি।

॥ বারো ॥

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবার পর সেই আনন্দে গর্বিত উৎফুল্ল হয়েছিলাম এটুকু স্পষ্টই মনে আছে। তবে তাঁর ঘরের বন্দুকের ওপর রুদ্রাক্ষের মালার মানে খোঁজবার কথা মাথাতেও আসেনি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরে আবার কখনও দেখা করবার ইচ্ছা বা কল্পনাও তখন মনের মধ্যে ছিল না। কারণ প্রধানত অনাথদারই উৎসাহে কিছুদিন কবিতা গল্প প্রবন্ধ সব কিছুতেই অল্পবিস্তর হাত মক্স করবার চেষ্টা করলেও ভবিষ্যতে সাহিত্যের পথই সার করবার কথা কখনও ভাবিনি। এরপর কিছুদিনের মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনায় সাহিত্যের পথটা সম্বন্ধেই আমি প্রায় উদাসীন হয়ে উঠলাম।

এ ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ অনাথদাই।

বছরের শেষ চৈত্র সংক্রান্তিতে সচল সঙ্ঘের একটি বার্ষিক সমাবেশের [illegible] সেবারে করেছিলাম। [illegible] আমাদের পক্ষে [illegible] সম্মেলনের মত করেই আয়োজন করা হয়েছিল। অগ্রজেরাও আমাদের সহযোগ দিয়ে অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনটা সে বছর অতিরিক্ত রকম গরম ছিল। বিকালের সেই সভার অধিবেশনের কোনদিকে কোন খুঁত না থাকে তার জন্য সেই সকাল থেকে অন্য সকলের চেয়ে অনাথদা খেটেছে বেশী। খেটেছে তার বিকেলের সভার লোকেদের পরিবেশন করবার জন্য সরবত বিশারদ পাড়ার আর এক অনাথদা চাঁই চাঁই বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দু'জালা যে আম পোড়ার সরবৎ বানিয়ে রেখেছিল তাই খেয়েছে গ্লাসের পর গ্লাস অসহ্য পিপাসায়।

সচল সঙ্ঘের বার্ষিক সভা সবদিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত হয়েছিল বলে প্রশংসা করেছে সবাই। সে প্রশংসা সব চেয়ে বেশী যার প্রাপ্য তার পরের দিন থেকে সেই অনাথদার সঙ্গে কিন্তু আর দেখা হয়নি। দেখা হয়নি আর কোন দিন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভাবে হঠাৎ কঠিন নিউমোনিয়া হয়ে অনাথদা তিন দিনের মধ্যে আমাদের ছেড়ে গেছে। গরমের মধ্যে বার বার ঠাণ্ডা সরবত খাওয়াই নাকি তার অমন নিউমোনিয়া হওয়ার কারণ। সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় শরীরের ওপর অতিরিক্ত অনভ্যস্ত অত্যাচারে ও শেষে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভেতরটা তার অত্যন্ত দুর্বলই হয়ে গেছিল

নিউমোনিয়ার সঙ্গে যোঝবার শক্তি তাই তার ছিল না। নিউমোনিয়া জাতীয় রোগের ওষুধ হিসেবে পেনিসিলিন বা সালফা জাতীয় কোন ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অনাথদার মৃত্যুর পরই সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহটা অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছি। পাড়ার সকলের চেষ্টায় তার নামে অনাথ লাইব্রেরী বলে একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু জীবন্ত প্রেরণার অভাবে সেটা টিমটিম করে কয়েক বছর টিকে ছিল মাত্র, সচল সজ্যের মত মাতিয়ে রাখতে পারেনি।

ম্যাট্রিক পাস করবার পর আমার স্কুল জীবনও তখন শেষ হয়েছে। শেষ পরীক্ষা দেবার পক্ষে বয়সটা একটু বেশী কম থাকায় আমার স্কুলজীবনটা অন্য অনেকের তুলনায় একটু বেশী দীর্ঘ। পিছনের দিকে চাইলে দেখতে পাই যে সেই জীবনের ছাপটাই মনের মধ্যে এখনো গভীর ভাবে লেগে আছে।

এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের সময়ে শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের মনে একটা বিস্ময় মুগ্ধতা মেশানো সম্ভ্রমের ভাব ছিল। তাদের আমরা যেন একটু অন্য স্তরের মানুষ বলেই মনে করতাম।

তাই মধ্যে সেই নিচের ক্লাস থেকে ওপরে ওঠার পথে কয়েকজন শিক্ষকের স্মৃতি কোন দিন ভুলবার নয়। সেভেন্থ ক্লাসের সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর হরিদাস পণ্ডিতমশাই, তারপর সেই শ্রেণীতে সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারা চরিত্রের ক্লাস-টিচার কিরণ মিত্র মশাই। কিরণবাবু সেই যুগেই অনেক কিছুতে বিদ্রোহ আধুনিকতার প্রতিনিধি ছিলেন দেখতে রোগা-টে পাতলা গোছের হলেও শরীর ছিল সবল সতেজ ও মজবুত। পরিষ্কার ধোপদস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরে কোঁচানো চাদর গায়ে স্কুলে আসতেন। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর পোশাক আশাকই সবচেয়ে সব সময়ে পরিপাটি থাকত শুধু নিজের বেলাতে নয়, ছাত্রদের বেলাতেও তিনি শ্রী ও শোভনতার বিশেষ ভাবে পক্ষপাতী ছিলেন।

তখনকার দিনের স্কুলের ছাত্র মাত্রেরই মাথার চুল কাটার আদর্শ যা ছিল তা পাথ কদম বা কদমী ছাট। অত দূর পর্যন্ত না গেলেও দশ-আনা ছ' আনা গোছের বাহারী ছাঁট ছাত্রদের পক্ষে ছিল কল্পনাতীত। কিরণ মাস্টার মশাই কিন্তু স্পষ্ট করেই কদর্য চুল ছাঁটার বিরুদ্ধে তার মতামত জানাতেন।

পড়াতেন তিনি খুবই ভাল, কিন্তু পাঠ্য বইয়ের পাতার মধ্যেই আমাদের বন্দ করে রাখতে চাইতেন না।

মনে আছে, একদিন ভাদ্রমাসের বন্যার মরশুমে গঙ্গায় বান দেখে এসে বিবরণ

দেবার জন্যে আমাকে আর একটি ছেলের সঙ্গে শুধু ছুটি নয়, ট্রাম ভাড়ার পয়সা পর্যন্ত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

এই কিরণ মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে আমি ও বীরুমামা আর কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে কিছুকাল পড়তে যেতাম। বাড়িতে ভাল ভাল গৃহশিক্ষকের অভাব না থাকলেও শুধু আমাদের সঙ্গী হবার জন্যেই বন্ধু দেবীপ্রসাদও তার নতুন নেশার সাইকু নিয়ে কিছুদিন সেখানে গিয়েছে।

কিরণ মাস্টার মশাইয়ের পর যাঁর কথা মনে পড়ে সেই কেদারবাবু আবার একেবারে আলাদা জাতের মানুষ ছিলেন। তিনি তখনকার থার্ডক্লাসের ছেলেদের পড়াতেন। তাঁর খ্যাতি কিন্তু থার্ড ক্লাসে ওঠবার আগেই নিচের ক্লাসের ছেলেদের কাছে পৌঁছাত। আমাদের কাছেও যথারীতি তা পৌঁছেছিল আর থার্ডক্লাসে উঠে তাঁর কাছে পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম।

থার্ড ক্লাসে উঠে তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পেয়ে সে ঔৎসুক্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং যা আশা করেছিলাম তার অতিরিক্তই কেদারবাবুর কাছে পেয়েছি।

কেদারবাবুর স্কুলজোড়া খ্যাতি ছিল তাঁর গল্প বলবার ক্ষমতার জন্যে। যেমন তেমন যে সে গল্প নয়, তিনি গল্প বলতেন শুধু নেপোলিয়ন সম্বন্ধে। সে গল্প এমন ভাবে বলতেন যে ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠত তাঁর কথায়।

আমরা যখন তাঁকে পেয়েছি তখনই তিনি প্রৌঢ় হয়ে এসেছেন। মাথায় লম্বা অবিন্যস্ত পাকা চুল। শীর্ণগোছের দেহ খুব দীর্ঘ না হলেও একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন, রোগাটে শুকনো মুখের কোটরে ঢোকা চোখে কিন্তু এমন একটা কৌতুক মেশানো উজ্জ্বলতা, ওই বয়সেই যা আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। আমাদের আগে ও পরে কত দফার ছাত্রদের যে তিনি গল্প শুনিয়ে মনোহরণ করেছেন তার ঠিক নেই। এখনো তাঁর কথা ভাবতে গেলে যে ইতিহাসের কাহিনী তিনি বলতেন তারই একটি চরিত্র হিসেবে যেন তাঁকে দেখতে পাই।

কেদারবাবুর ক্লাসে আমাদের বাংলা থেকে ইংরেজি আর ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করতে হত। ক্লাসে এসেই অনুবাদ করার কথাগুলি তিনি আমাদের টুকে নেবার জন্যে মুখে বলে যেতেন। টুকে নেবার পরে যত কম সময়ে সে অনুবাদ আমরা সেরে ফেলতে পারি তত আমাদের লাভ। আমাদের খাতা যত তাড়াতাড়ি লেখা হয়ে যাবে তত বেশী সময় আমরা পাব তাঁর কাছে গল্প শোনবার। সেই আগ্রহে যে যত পারি অল্প সময়ে অনুবাদ শেষ করে আমরা তাঁর টেবিলে খাতা জমা দেবার চেষ্টা করতাম।

এই তাড়াহুড়োর প্রতিযোগিতায় কেদারবাবুর কাছে আমি যে খেতাব পেয়েছিলাম তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে তা আমার কাছে সত্যিই মূল্যবান হয়ে আছে।

কেদারবাবুর টেবিলে 'প্রায় নিয়মিত ভাবে আমার খাতাই প্রথম জমা পড়ত। সেটাকে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব বলে কখনো ভাবিনি। কিন্তু একদিন আমাদের ক্লাসের প্রায় বরাবরের ফার্স্ট বয় বলে চিহ্নিত শৈলেন মিত্রর খাতাটা আমার আগে জমা পড়তেই ব্যাপারটাকে একটু অন্য চোখে দেখলাম। তাড়াতাড়ি খাতা জমা দেওয়ার চেষ্টায় একটু জেদাজেদির ছোঁয়া লাগল।

শৈলেন মিত্র আমাদের স্কুলের নাম-করা ভাল ছেলে ছিল। সেও আমার মত এইট্থ্ ক্লাসেই বোধহয় স্কুলে এসে ভর্তি হয়। তারপর থেকে নতুন ক্লাসে ওঠবার প্রায় সব বার্ষিক পরীক্ষাতেই সে সবার ওপর প্রথম হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে তার যা কিছু প্রতিযোগিতা ছিল তা কান্তি বসাকের সঙ্গে। পরীক্ষার সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতিযোগিতাটা বেশীর ভাগ এই দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। যত দূর মনে পড়ছে দুজনেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল আর তারপর একজন আই. সি এস ও অন্যজন বি. সি. এস. অফিসার হিসেবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে কান্তি বসাকের নাম তার নিজস্ব কয়েকটি কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ক্লাসের যথার্থ ফার্স্ট বয় শৈলেন মিত্রর সঙ্গে জেদাজেদির পাল্লায় আমার সফল হবার কথা নয়। শৈলেন জেদ করে চেষ্টা করলে আমার চেয়ে তাড়াতাড়িই অনুবাদ শেষ করে খাতা জমা দিতে পারত বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু পরের দিন কেদারবাবুর ক্লাসে তাকে অন্য কৌশলে পিছিয়ে ফেলে গিয়েছি। সেদিন কেদারবাবু ক্লাসে এসে যথারীতি অনুবাদ করবার কথাগুলি আমাদের টোকবার জন্যে মুখে বলে গেছেন। তাঁর ডিক্টেশন শেষ হবার পরই আমার খাতাটা তাঁর টেবিলে গিয়ে জমা দিয়েছি।

প্রথমে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেও খাতাটি খুলে অনুবাদটি সত্যিই করা হয়েছে কিনা কেদারবাবু দেখে নিয়েছিলেন, তারপর আমার কৌশলটা বুঝে মুখ টিপে একটু হেসে মন্তব্য করেছিলেন, 'ট্রানস্লেটিং মেসিন' বলে।

মন্তব্যটা সম্পূর্ণ প্রশংসাবাচক বোধহয় নয়। কিন্তু সেদিন মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর চোখের কৌতুক মেশানো স্নেহের দৃষ্টিতেই আমার কৌশলের দাম আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার কৌশলটা অবশ্য অসাধারণ কিছু ছিল না। শৈলেন মিত্রের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে সেদিন কেদারবাবুর ডিক্টেশন আমি খাতায় টুকিনি। তাঁর বলার

সময়েই মুখে মুখে অনুবাদ করে গিয়েছিলাম। কেদারবাবু শুধু নেপোলিয়নের গল্পই আমাদের শোনাননি, তাঁর প্রায়-নাটকীয় বর্ণনায় জীবন্ত করে সে-যুগ সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন ও কৌতূহলী করে তুলেছিলেন। তাঁর কাছেই প্রেরণা পেয়ে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানবার পক্ষে তখনকার দিনে আমাদের যা একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেই অ্যাবট্-এর লেখা বিরাট বই আমি কষ্ট করে পড়েছিলাম মনে আছে। শুধু নেপোলিয়নের কালই নয়, যে কোন যুগের ইতিহাসই একটা জাগ্রত কৌতূহল নিয়ে জীবন্ত করে দেখার প্রথম পাঠ কেদারবাবুর সেই গল্প বলার ক্লাস থেকেই পেয়েছি।

এক হিসেবে সেটা পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার ক্লাস। কিন্তু অমন ফাঁকি দেবার মাস্টার শিক্ষাজগতে আরো বেশী যদি থাকত।

এর পর যার কথা বলতে যাচ্ছি দেবতার আসন বলতে যা বোঝায় আমার মনের মধ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতার তেমনি এক সর্বোচ্চ আসনেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। দেবতার মত সে মানুষের নামও ছিল দেবকিশোর মুখার্জি। তিনিই ছিলেন আমাদের সময়ে সাউথ সাবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার এবং তারই সময়ে তখনকার অখণ্ড বাংলার সমস্ত স্কুলের মধ্যে প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রদের সাফল্য ও কৃতিত্বের দিক দিয়ে সাউথ সাবার্বান যে অদ্বিতীয় থাকত তার প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট ঘাটলেই দেখা যাবে।

ফার্স্টক্লাসে ওঠার আগে পর্যন্ত হেডমাস্টার মশাই আমাদের সকলের কাছে রীতিমত সুদূর ও একটা সম্ভ্রমের বস্তু ছিলেন মাত্র। দাড়ি গোঁফ মাথার টাক ও মুখ চোখের গড়ন নিয়ে তাঁর নাতিদীর্ঘ সবল সমর্থ চেহারাটা ছিল ঠিক সপ্তম এডোয়ার্ডের মত। এক বার্ষিক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনে ছাড়া তাঁকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ বড় একটা আমাদের হত না।

ফার্স্টক্লাসে উঠে হেডমাস্টার মশাইয়ের নিকট সান্নিধ্যে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আমরা যা ভেবে এসেছি ইনি তো তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ! ওই গম্ভীর রাশভারী এবং বাইরের চেহারায় বেশ কঠিন ও অনধিগম্য মানুষটির হৃদয়ে ছেলেদের জন্যে এত স্নেহ ভালবাসা যে সঞ্চিত তা কে ভাবতে পেরেছিল।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় একটি পরিবর্তন ও চরিত্র সংশোধনের জন্যে আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে যাকে বলে তা আমি কোনদিন হতে পারিনি। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বেয়াড়া দুরন্তপনা করে ফেলা ছিল আমার স্বভাব। স্কুলের নানা ক্লাসে তার জন্যে একটু-আধটু বকুনি বা ধমক খেলেও সাধারণ-

ভাবে প্রায় সব শিক্ষকের সঙ্গেই আমার সম্পর্কটা সহজ স্বাভাবিক ছিল। ভৎর্সনা তিরস্কার সামান্য যা পেয়েছি তা স্নেহের শাসন হিসেবেই।

একটি মাত্র ছিল তার ব্যতিক্রম আর তার মূলে ছিল একটি অন্যায় অবিচার। ফোর্থ ক্লাসে যখন পড়ি তখন একদিন টিফিনের ছুটির সময় দুজন সহপাঠীর সঙ্গে কি নিয়ে যেন আমার একটু ঝগড়া হয়। ঝগড়ার মধ্যে আমার বইখাতা একজন ডেস্ক থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলায় আমিও তার একটি বই ওই ভাবে ফেলে দিই। ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে যাবার কথা, কিন্তু সে ছেলেটি কার প্ররোচনায় মনে নেই, খোদ হেডমাস্টার মশাইয়ের অফিস ঘরে গিয়ে বই ছিঁড়ে দিয়েছি বলে আমার নামে নালিশ করে আসে। এ রকম একটা সামান্য ঝগড়ায় অমন ভাবে শোধ নিতে যাওয়া আমার কাছে ছিল অভাবিত, তাই ছেলেটির নালিশ করে আসার আস্ফালনটা প্রথমে আমায় মিথ্যে ভয় দেখানো বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু খানিক বাদে বড় অফিস থেকে চাপরাশী আমায় ডাকতে আসায় সে ভুল ভেঙে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্তম্ভিত হলাম চাপরাশীর সঙ্গে হেডমাস্টার মশাইয়ের বড় অফিস ঘরে গিয়েও। হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সাধারণত অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার শ্যামবাবু সে ঘরে বসতেন। স্কুলের ছাত্রদের নালিশ শোনা ও তার বিচার করাও ছিল তার কাজ। অফিস ঘরে ঢুকে প্রথমেই স্তম্ভিত হয়েছিলাম শ্যামবাবুর হাতে বেত দেখে। তার মানে আমার কথা শোনবার আগেই বিচার সেরে শাস্তি দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন! কেন বই ছিঁড়েছ?—বলে শ্যামবাবুর প্রথম ধমকের উত্তরে আমার কথাটা তাকে বলবার চেষ্টা একবার করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা শোনেননি। আমায় হাত পাততে বলে সজোরে তার ওপর বেতের ঘা দিয়েছিলেন। একবার দুবার নয় বেশ কয়েকবার বেত মারবার পর তিনি নিজেই কিন্তু বেশ একটু যেন উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন এবং উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে বলেছিলেন, দেখছেন কি বদমাশ ছেলে!

আমার অপরাধ, অত মার খেয়েও চোখ দিয়ে আমার জল বার হয়নি। বরং এই অন্যায় অবিচারের নীরব প্রতিবাদের জ্বালাই দৃষ্টিতে হয়তো ফুটেছিল।

তারই উপরি শাস্তি হিসেবে আরও বেশ কয়েক ঘা বেত খাবার পর তখনকার মত ছাড়া পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর কাছে তখন থেকেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলাম স্কুলের বেয়াড়া বদমাশ ছেলেদের একজন অগ্রগণ্য হিসাবে।

ফোর্থ থেকে ফার্স্ট ক্লাসে ওঠবার মধ্যে সামান্য কারণে আরও দু-একবার শ্যামবাবুর কাছে আমায় যেতে হয়েছে কিন্তু বেত্রাঘাত খেয়ে চোখের জল বার হওয়া যদি

সংশোধনের প্রমাণ হয় তাহলে শিক্ষা আমার অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত বিদ্রোহই ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে আমার মধ্যে।

এই রকম মন মেজাজ নিয়েই ফার্স্ট ক্লাসে উঠে হেডমাস্টার মশাইয়ের অভাবিত স্নেহ ভালবাসা পেয়ে ভেতর থেকে একটু বোধহয় শোধরাবার আগ্রহ জাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু এতদিনের গড়ে ওঠা স্বভাব যাবে কোথায়?

হঠাৎ একদিন নতুন শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটা সত্যিকার অন্যায় করে ফেলে তাঁর অভিযোগে বড় অফিসঘরে খোদ হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকেই সে ঘরের চাপরাশি মারফত বিচারের ডাক পেলাম।

তেরো

ফার্স্ট ক্লাস থেকে হেডমাস্টাব মশাই-এর খাস অফিসঘর বেশি দূর নয়। আমাদেব ছিল ফার্স্ট ক্লাসেব 'এ' সেকশন। ক্লাস বসত দোতলায একেবাবে দক্ষিণ-পূর্বের একটি ঘবে। আর হেডমাস্টার মশাই এর নিজস্ব ঘব ছিল ওই দোতালাবই একেবারে উত্তব প্রান্তে। ডাইনে বা বাঁযেব বাবন্দা দিয়ে ঘুরে যেতে মিনিট খানেক লাগত।

ওই মিনিট খানেকেব মধ্যেই মনটা আবাব সেই পুবনো ছাঁচে যেন ফিবে গেল। হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে গিযে দাড়ালাম। দৃষ্টিটা নিচেব দিকে হলেও মাথাটা নোযানো নয়।

হেডমাস্টাব মশাই তাঁব বিশেষ আসন ছেড়ে সামনের দিকেব একটি চোয়াবে তখন বসেছেন। অন্য দু একজন শিক্ষকও এদিকে ওদিকে আছেন। তাঁদেব মধ্যে শ্যামবাবুকে ঘবে ঢোকবার মুখেই দেখেছি।

বারান্দা ঘুবে আসবাব সময বিচাবটা তাব কাছেই হবে বলে ধবে নিয়েছিলাম। তাব বদলে হেডমাস্টাব মশাই স্বযং সে ভাব নিযেছেন দেখে আশ্বস্ত দূরে থাক মনটা হতাশা তিক্ততায আবো কঠিন হযে উঠল। বিশেষ কবে তাঁর সামনের ছোট একটি টুলেব ওপর আমাব পবিচিত সেই বেতগাছিটি দেখে।

শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টাব মশাই এর কাছেও এই লাঞ্ছনা আব শাস্তি পেযে দাগা হযে থাকতে হবে। আব অকাবণে অন্যায বিচাবে নয শাস্তি যা পাব তা এবাবে সত্যিকাব অপরাধেব দরুন ন্যায্য কারণেই। এই আত্মধিক্কারটাই তখন উল্টোপাক খেয়ে স্বভাব চড়ে-যাওয়ানো ঔদ্ধত্যে মুখটা কঠিন কবে তুলেছে।

হেডমাস্টাব মশাই-এব মুখেব দিকে চেযে দেখিনি। নীচেব দিকে নামানো দৃষ্টিতে টুলেব ওপব থেকে তার বেতটা একবাব হাত দিযে নাড়া দেখলাম। বজ্রগম্ভীব স্বরও শুনলাম। —কি কবেছ আজ ক্লাসে?

আবাব সেই পুবানো প্রতিক্রিয়া—দাতে দাত চেপে কঠিন মুখে একেবাবে বোবা হয়ে দাড়িযে থাকা। হেডমাস্টাব মশাই আবাব একই প্রশ্ন কবলেন।

গলাব স্বরটা আবো একটু গম্ভীব। আমি তেমনি নিরুত্তর।

টুলেব ওপর থেকে বেতটা তাব হাতে উঠতে দেখলাম, সেই সঙ্গে শ্যামাবাবুর ক্রুদ্ধ

হিংস্র কণ্ঠও কানে এল।—একেবারে হাড় পাজি ছেলে! মুখখানা দেখছেন? চাবকে ওর পিঠের চামড়া খুলে নিতে হয়।

কত দিন আগের ঘটনা—কিন্তু শ্যামবাবুর কথাগুলোর উদ্ধৃতিতে বোধহয় ভুল হয়নি। কারণ তখনকার কয়েকটা মিনিটের স্মৃতি মনের মধ্যে একেবারে পাকা ভাবে ছাপা হয়ে গিয়েছে।

শ্যামবাবুর কথা শোনার সঙ্গে আমি হেডমাস্টার মশাই-এর হাতের বেত নাড়াটা দেখছি আর তৈরীও হয়েছি 'হাত পাতো' বলে পরের আদেশের জন্যে।

কিন্তু সে আদেশ এল না। তারপর কয়েক সেকেণ্ডে কি যে হয়ে গেল তা ঠিক মত গুছিয়ে বর্ণনা করতেও বোধহয় পারব না।

হেডমাস্টার মশাই বেত মারবার জন্যে হাত পাততে বললেন না। তার বদলে হঠাৎ তাঁকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম। উঠে দাড়াবার পর আমার পিঠে তাঁর হাতের স্পর্শটা পেলাম, সেই সঙ্গে আদেশ,—ও ঘরে চল।

ও ঘর মানে দোতলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তের লাইব্রেরী ঘর।

হেডমাস্টার মশাই আমায় সে ঘরে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরিয়ানের চেয়ারে বসলেন। হাতে তাঁর বেতটা তখনও ঠিক আছে। লাইব্রেরী ঘরটা নির্জন। ছেলেদের বই দেওয়া নেওয়াটা বিকেলে স্কুলের ছুটির পরই হয় বলে শিক্ষকদের কেউই তখন সেখানে নেই। অফিস ঘরে অন্য সকলের সামনে না মেরে লজ্জাটা একটু বাঁচাতে শাস্তিটা আমায় এই ঘরেই দিতে চান এর বেশি তখন বুঝিনি।

কিন্তু যা বুঝেছিলাম সবই ভুল। লাইব্রেরী ঘরে এসে বসবার পর হেডমাস্টার মশাই কয়েক সেকেণ্ড একেবারে চুপ। তাঁর হাত থেকে বেতটা সামনের টেবিলে রাখা শুধু এটুকু ইতিমধ্যে দেখেছি।

আমার চোখের দৃষ্টি তখনও যথারীতি নিচের দিকে। মুখ তুলে তাঁর দিকে এ পর্যন্ত তাকাইনি। কিন্তু এর পরে তিনি যা করলেন তাতে আপনা থেকেই মুখ ও চোখ তাঁর দিকে না তুলে পারলাম না।

একটা হাত ধরে একটু কাছে টেনে কাঁধের ওপর একটা হাত আলগা ভাবে রেখে তিনি নাম ধরে শুধু বললেন, তোমার কাছে এটা আশা করিনি।

সপ্তম এডোয়ার্ডের মত যাঁর চেহারা, যাঁর গলার স্বরে সমস্ত স্কুল তটস্থ, তাঁর হাতের এমন স্নেহের স্পর্শ, গাঢ় ব্যথিত স্বরে তাঁর এমন সম্ভাষণ কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। চোখ দুটো ওপরে তুলে তাঁর মুখটাও তখন দেখতে পেয়েছি। সে মুখে তখন অবিশ্বাস্য এক বিসন্ন অস্ফুট কাতরতা।

সেই বিষণ্ণ কাতরতাই তাঁর পরের ভর্ৎসনায়।—কেন এমন করলে ?

তিরস্কার নয়, শাসন নয়, তাঁর নিজেরই যেন ব্যথিত আক্ষেপ।

বেতের ঘায়ে হাতের চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও যে চোখে শুধু উদ্ধত জ্বালাই এতদিন ফুটে উঠেছে তাই এইবার জলে একেবারে ভেসে গেল। ভেতর থেকে উথলে-ওঠা সে কান্না আর রোধ করতে পারলাম না অনেকক্ষণ। কিছুই বলেননি হেডমাস্টার মশাই। পিঠে একটা হাত রেখে একেবারে নীরব থেকে আমায় আমার নিজের চোখের জলেই যেন শুদ্ধ হতে দিয়েছিলেন। তারপর এমন করে কান্নার বেগ রোধ না করতে পারার জন্যে চোখের জল মুছতেও যখন লজ্জা হচ্ছে তখন শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে শুধু বলেছিলেন,—যাও ক্লাসে যাও। উপদেশ নির্দেশ কিছু নয়। শুধু ওই একটি কথার বেশি আর কিছু বলা তিনি দরকার বোধ করেননি।

মাথা নিচু করে আর কোন দিকে না তাকিয়ে, চোখের জলও না মুছে হেডমাস্টার মশাই-এর খাস অফিস ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে নিজের ক্লাসেই ফিরে গেছলাম। উপস্থিত অন্য শিক্ষকেরা বিশেষ করে সহকারী প্রধান শিক্ষক মশাই তাদের কামরা থেকে আমার শাস্তির ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন নিশ্চয়। কোন তীব্র শাসনের তিরস্কার বা শাস্তির বেত্রাঘাতের আভাস না পেয়ে আর তার ওপর চোখে মুখে অঝোরে কান্নার অমন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আমায় ক্লাসেই ফিরে যেতে দেখে কি তাঁরা ভেবেছিলেন তা জানি না। কারণ যথার্থই ওসব কিছু লক্ষ্য করবার মত অবস্থায় আমি তখন ছিলাম না। সত্যিই আমি যেন অন্য ছেলে হয়ে ক্লাসে ফিরে গিয়েছিলাম। আর সীসা যে হঠাৎ কখনো সোনা হয়ে ওঠে না তা জেনেও এটুকু না বলে পারছি না, যে, মনের মধ্যে ফুটে থাকা যে গোপন ক্ষোভের কাঁটা ক্রমশ বিষিয়ে উঠে আমার জীবনের সব কিছুতে একটা উগ্র অসুস্থ তিক্ততার উৎস হয়ে থাকতে পারত, হেডমাস্টার মশাই-এর অপ্রত্যাশিত আশাতীত স্নেহের স্পর্শের আন্তরিকতায় সে কাঁটাটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাঁর শাসন বেতের ডগা দিয়ে প্রকাশ পেলে কি প্রতিক্রিয়া যে আমার মধ্যে হত তা সঠিক বলতে কোন মনোবিজ্ঞানী পারেন কি না জানি না, আমার কিন্তু তার পরিণতিটা ভাবতেও কেমন একটু ভয়ই হয়। আর যা-ই হয়ে থাক, তাঁর মত মানুষের স্নেহ আর বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করার সঙ্কল্প যে আমাকে বহুকাল নিয়ন্ত্রিত করেছে এটুকু অসঙ্কোচে বলতে পারি।

ছাত্রদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহের গভীরতা, তাদের সাফল্য উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ ব্যাকুলতার নমুনা ওই একটাই পাইনি।

তাঁর নিজের পুত্র শ্রীরাধাকিশোর মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে এক স্কুলেই পড়ত। ছাত্র হিসেবে সে সত্যিই ছিল প্রথম সারির। হেডমাস্টার মশাই-এর স্বাভাবিক ভাবেই তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার কথা। তিনি তা দিয়েছেন কিন্তু শুধু তার ওপর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষায় যে ক'জনের কৃতিত্ব দেখাবার সম্ভাবনা আছে বলে তাঁর মনে হয়েছে, তাদের সকলকেই নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে আনিয়ে দিনের পর দিন তিনি পড়িয়েছেন। এই নির্বাচিত ক'জনের মধ্যে আমারও যে একটু স্থান হয়েছিল এ আমার চিরদিনের গর্ব।

তাঁর বিশেষ নির্বাচনের সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমি অন্তত রাখতে পারিনি বলেই মনে করি। আমার সম্বন্ধে তাঁর আশা ছিল বিশেষ করে ইংরেজীর বিষয়ে। শেষ পরীক্ষায় নম্বর যা পেয়েছিলাম তা খুব লজ্জাকর না হলেও তাঁকে যে হতাশ করেছিল তা বোঝা খুব শক্ত হয়নি।

তাঁকে আরেক বিষয়েও হতাশ করেছিলাম কিছুটা নিজের স্বভাব দোষে আর বাকিটা নিয়তিতে। অহেতুক স্নেহবশেই নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে তিনি একটু অন্যরকম আশা পোষণ করতেন। আমরা যখন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়েছি তখন তিনি বেশ পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেচেন। সেই বয়সেও তাঁর প্রিয়পাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার ভাবনা চিন্তা ব্যাকুলতা স্কুলের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই বাঁধা থাকত না।

ছাত্রদের বিষয়ে তাঁর সে ব্যাকুলতা যে কি আন্তরিক একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার পরিচয় পেয়ে যেমন বিস্মিত তেমনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বার হবার কিছু পরে তখন সবে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছি। হঠাৎ একদিন সকালে বাড়ি থেকে আমাদের আদিগঙ্গার ধারের রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছি বলে মনে হল।

আমাদের রাস্তায় স্কুলের হেডমাস্টার মশাই দেবকিশোরবাবু আসছেন।

এ রাস্তায় দেবকিশোরবাবুকে দেখা যেমন আশাতীত, তেমনি অভাবনীয় তাঁর বেশভূষা। সেই সপ্তম এডোয়ার্ডের মত চুল গোঁফ দাড়ি ঠিকই আছে, কিন্তু সে কোট প্যাণ্ট নয়, তার জায়গায় ধুতি চাদর আর পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি।

কোথায় যাচ্ছেন স্যার? প্রণাম করে বললাম।

চল, যাচ্ছি তোমাদেরই বাড়ি। তোমার দিদিমার কাছে।

তার বাড়িতে পড়তে যাবার সময় তিনি আমার পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদি কিছু কিছু জেনেছিলেন কিন্তু সে সূত্র ধরে তিনি আমার দিদিমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে আসতে পারেন এটা কল্পনাও করতে পারিনি। আর তার চেয়ে অনেক বেশী

অবাক হয়েছিলাম দিদিমার কাছে তাঁর প্রস্তাবের কথা শুনে। আমায় বিদেশে শিক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে দিদিমার কাছে এই তাঁর দাবি।

আমায় বিদেশে পাঠাবার মত সংস্থান তখনও দিদিমার কাছে সামান্য কিছু ছিল। যা ছিল সবই সেকালে যাকে বলত কোম্পানির কাগজ তাইতে। দিদিমা হেডমাস্টার মশাই-এর অনুরোধে আর যুক্তিতে রাজী না হয়ে পারেননি। একটুখানি শুধু অসুবিধা বোধ করেছিলেন কোম্পানির কাগজ কি ভাবে আমার বিদেশে পড়ায় খরচের জন্যে কাজে লাগানো যায় তাই নিয়ে। হেডমাস্টার মশাই সে উপায়ও বলে দিয়েছিলেন ও নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট বাবার সাহায্য নিয়ে আমার নামে তখনকার দিনের হাজার পাঁচেক টাকার কাগজ লিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শুধু এইটুকু করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আমাকে জোর করে তাগাদা দিয়ে সে কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত যেখান থেকে এ সব ব্যবস্থা হত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সেই অফিসে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

আমেরিকায় পড়তে আমি যাইনি, বিদেশে অন্য কোন জায়গাতেও নয়।

একদিন হঠাৎ বালিশ কম্বল চাদর আর পরবার গোটা দুই করে ধুতি শার্ট আর গায়ের গরম কাপড় একটা পোঁটলায় বেঁধে বোলপুর রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে গিয়ে উঠেছিলাম তখনকার গেস্ট হাউসে আর একটা রাত সেখানে কাটিয়ে তারপর দিন সকালবেলা গেস্টহাউসেরই একজন অনুচরের মাথায় বোঝাটা দিয়ে প্রায় কপর্দক শূন্য অবস্থায় হেঁটে সুরুলের শ্রীনিকেতনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। চাষ শেখাবার বিদ্যালয় হিসেবে শ্রীনিকেতন সবে কয়েক মাস হল সেই বছরই খোলা হয়েছে। সেখানে চাষ শেখবার সঙ্কল্প নিয়েই গিয়েছিলাম। সে কাহিনী যথাস্থানেই বলার চেষ্টা করব।

স্কুলের জীবন শেষ করে আসার পরও দূর থেকে যিনি সমানে আমার ওপর তাঁর স্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন আর নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে এসে আমায় বিদেশে পাঠাবার জন্যে এতখানি অযাচিত সাহায্য করেছিলেন আমার এই কাউকে কিছু না জানিয়ে সব ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার খবর তাঁর অবিদিত নিশ্চয় ছিল না। এক হিসেবে আমি যা করেছিলাম তা বিশ্বাসভঙ্গেরই সামিল। তিনি তাতে আমার সম্বন্ধে হতাশই শুধু হননি, ব্যথাও গভীর ভাবে পেয়েছিলেন। এই ঘটনার পর লজ্জায় আর অপরাধ বোধের গ্লানিতে তাঁর সঙ্গে অনেকদিন দেখা করতে গিয়েও মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি। তারপর একদিন তিনি দেখা শোনারই অতীত হয়ে গেছেন।

হেডমাস্টার মশাই-এর আমার সম্বন্ধে যে আশা ছিল তা পূর্ণ হয়নি, তাঁর কাছে অহেতুক অনর্জিত যে স্নেহ মমতা ও সক্রিয় কল্যাণ-কামনা পেয়েছি তার মর্যাদাও সম্পূর্ণ ভাবে রাখা আমায় দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবু এখন নিজের জীবনে বিকেলের দীর্ঘ ছায়া নিয়ে পিছনে তাকিয়ে এইটুকু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, সে রকম কিছু সম্ভব হলে তাঁর ওপর থেকে তিনি সব শুদ্ধ জড়িয়ে আমায় ক্ষমা করতে পেরেছেন আর আমার দিক দিয়েও বলার কথা এইটুকু যে, অনেক অসমাপ্ত চেষ্টা অনেক কিছু বিফলতার ভেতর জীবনে সামান্য কিছু যদি করে উঠতে পেরে থাকি, তার জন্যে যে দু-চারজনের কাছে একান্ত ভাবে ঋণী তাঁদের মধ্যে সত্যিকার দেবতুল্য চেহারা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় মশাই অন্য কারুর পিছনে নন।

সময় বদলেছে। তা সত্ত্বেও এখনকার ছেলেমেয়েরা এ রকম এক আধজন শিক্ষকের দেখা নিশ্চয়ই কখনো-সখনো কোথাও না কোথাও পেয়ে থাকে। যদি না পায় তা এখনকার শিক্ষাদীক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সে রকম শিক্ষকের আবির্ভাব যদি অসম্ভব করে তুলে থাকে তাহলে অকপটে স্বীকার করব যে, অন্য সব কিছু লাভ লোকসানের হিসেব অগ্রাহ্য করে সেই তখনকার যুগে বড় হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যে সেকালের আমরা ধন্য।

আমেরিকা যেতে গেতে হঠাৎ শ্রীনিকেতনে চলে গিয়ে এক হিসেবে একটা হাস্যকর কেলেঙ্কারী করেছিলাম। এই আকস্মিক চলে যাওয়াটা হঠাৎ এক মুহূর্তের খেয়াল ঠিক কিন্তু ছিল না। মনের যে অস্থিরতা থেকে এ খেয়ালের উৎপত্তি অনাথদা মারা যাবার পর ম্যাট্রিক পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে গিয়ে ভর্তি হওয়ার সময়ই তা শুরু হয়েছিল। স্কটিশে আর্টস নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কলেজটা খুব খারাপ যে লাগত তাও নয়, কিন্তু নিয়মিত ভাবে নিত্য যাওয়ার উৎসাহ কেন জানি না কিছুতেই মনের মধ্যে জাগাতে পারতাম না।

তখনও কলকাতায় বাস বলে কিছুর আবির্ভাব ঘটেনি। ট্রামে করেই দক্ষিণ থেকে সেই উত্তরের কলেজে যেতে হত। যাওয়াটায় সময়টা একটু বেশি লাগলেও সেটা কষ্টসাপেক্ষ কিছু ছিল না। ট্রামে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথাই তখনও কেউ ভাবতে পারে না।

যাওয়ার সুবিধে ও কলেজের আকর্ষণ যা ই থাক, প্রতিদিন নিয়ম করে কলেজে কিন্তু যেতাম না। বাড়ি থেকে ট্রাম ভাড়া আর জলখাবারের পয়সা নিয়ে ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়লেও কলেজে আমার খোঁজ করলে বিফল হতে হত। তার বদলে আমায় বেশির ভাগ দিনই দেখা যেত চিড়িয়াখানায় কোন বেদিতে বা মাঠের মধ্যে।

চোদ্দ

কোথায় স্কটিশ চার্চ কলেজ আর কোথায় চিড়িয়াখানা।

কলেজের বদলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বসে থাকাটার মধ্যে কবিত্ব করার বাষ্পও কিন্তু ছিল না।

যা ছিল তাকে খেয়াল বলা যায়। খেয়ালের চেয়ে যা বেশী ছিল তা একটা নাতিসুস্থ অস্থিরতা যা নিজেকে নিয়ে কি করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছে না।

ভেতরের এই অস্বস্তি আর অস্থিরতার•প্রকাশটা সে হিসেবে উল্টো। অস্থিরতায় ছুটে বেড়ানো নয়, ওই চিড়িয়াখানাতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেশীর ভাগ এক জায়গায় বসে কাটিয়ে দেওয়া, একটু বিপরীত ব্যবহার সন্দেহ নেই।

কলেজ পালিয়ে চিড়িয়াখানায় বসে থাকা অবস্থায় আত্মীয়বন্ধু কারুর কোনদিন চোখে পড়িনি। পড়লে দ্রষ্টার চোখে আমার উচ্ছন্নে যাওয়াটা একেবারে সন্দেহাতীত হত নিশ্চয়। সেই সঙ্গে হয়তো একটু কৌতুকের খোরাকও মিলত। আমার উচ্ছন্নে যাওয়ার প্রমাণ হল যেখানে বসতাম তার পাশেই রাখা তখনকার একটি বাজার চলতি সিগারেটের প্যাকেট আর কৌতুকের উপাদান হল একটি জিলেপীর ঠোঙা। ঠোঙাটি নেহাত ছোটখাটও নয়। একপো আন্দাজ জিলেপী তাতে থাকত।

এ জিলেপীর ঠোঙা কিনতাম চিড়িয়াখানায় ঢোকবার সময় ডানদিকের একটি দোকানে। সিগারেটের প্যাকেটটাও সেখানেই।

চিড়িয়াখানার প্রবেশমূল্য তখন ছিল মাত্র এক আনা অর্থাৎ এখনকার ছয় নয়া পয়সা, আর জিলেপীর দাম ছিল ছ' আনা সের মাত্র। ছ' আনা সেরের এ জিলেপী সব দিন যে কিনতাম তা নয়, কিনলেও তার পুরো সদ্ব্যবহার কোনদিনই করতে পারতাম না। কিছুটা খেয়ে কিছুটা চারিধারে জড়ো হওয়া কাকেদের জন্যে ছড়িয়ে দিয়ে, বাকিটা বাঁদরের খাঁচায় খাঁচায় বিলিয়ে দিতাম। ছ' আনা সের জিলেপী তখনকার দিনের পক্ষেও অত্যন্ত সস্তা। এত সস্তা হবার কারণ এই যে সেগুলি তেলে ভাজা।

বিশেষ কোন রুচি না থাকলেও তেলে ভাজা এ জিলেপী যেমন কিনতাম অর্থহীন খেয়ালে, সিগারেটের প্যাকেটও তাই। সিগারেট খেয়ে স্বাধীন সাবালক হচ্ছি মনে করার একটা ঝোঁক তখন মাঝে মাঝে হত বটে কিন্তু কেন জানি না এই ধোঁয়ার নেশাটি

কোন কালেই আমার ঠিক মনে ধরেনি। জিলেপীর ঠোঙার মত সিগারেটের প্যাকেটও তাই নিজের ব্যবহারে খুব কমই লাগত। একটা দুটো জোর করে খাবার পর বাকিগুলো ভিখিরী-টিখিরীদের দান করতে কেমন লজ্জা হত বলে বসার জায়গাতেই ফেলে আসতাম বেশীর ভাগ দিন।

সন্ধ্যে হবার আগে বিকেল বেলাতেই বাড়ি ফিরতাম ঠিকই। আমার ওপর দিদিমার কোন অবিশ্বাস ছিল না বলে মিথ্যে কৈফিয়ত দেবার গ্লানিতে কোন দিন পীড়িত হতে হয়নি। তবু অস্বস্তি একটা কোথায় যেন থাকত। নিজের কাছেই কেমন অপরাধী বলে ধরা পড়ার যন্ত্রণা।

অপরাধটা কি তা অবশ্য বুঝতাম না। শুধু একটা অবুঝ অস্পষ্ট ক্ষোভ নিজেকেও যেন আহত করতে চাইত।

ভারতবর্ষে তখন আকাশে বাতাসে দেশের মুক্তি সাধনার উত্তেজনা। সে সাধনার নানা দিক নানা রূপ।

হঠাৎ একদিন মনে হল দেশে কি বিদেশে মামুলী পড়াশোনা করে কোন লাভ নেই। নগরে বন্দরে নয়, আসল চিরন্তন ভারতবর্ষ যেখানে অবহেলায় পড়ে আছে, গ্রামাঞ্চলের সেই চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে। তার জন্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি বিদ্যা শেখা দরকার।

ভাবনাটা নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তাঁর শান্তিনিকেতনেই কৃষি বিদ্যা শেখাবার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবে খোলা হয়েছে শুনে একদিন হঠাৎ প্রায় লোটা কম্বল সম্বল করেই সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। লোটাটা অবশ্য ছিল না, কিন্তু পরে-থাকা জামা কাপড় বাদে আর যা ছিল তা একটি কম্বলে জড়ানো খান দুই ধুতি, দুটি করে পরনের গেঞ্জি আর জামা, একটা মোটা গোছের তোয়ালে আর একটি সাধারণ গরম গায়ের চাদরের বেশী আর কিছু নয়। তখনকার দিনে টুথ ব্রাস, টুথ পেস্টের এত বালাই ছিল না। ও কাজটা খড়ির গুঁড়ো দিয়েই সারা চলত। ক্ষৌর-কার্যের জন্যেও কিছু নেবার দরকার হয়নি। কারণ মাসে বড় জোর বার দুই পোহাবার ও দায়টা তখন নাপিতদের ওপরেই অকুতোভয়ে ছাড়তে পারতাম।

সঙ্গে পয়সা কড়ি যা ছিল তাও অতি সামান্যই। কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে হঠাৎ চাষী হয়ে দেশ সেবার সঙ্কল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হওয়ার পেছনে মহৎ আদর্শের প্রেরণা ছাড়া দিদিমার সঙ্গে একটু মনান্তরের ব্যাপারও ছিল। দিদিমার কাছে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে চাষ শিখতে যাওয়ায় প্রস্তাবটা প্রথমেই একদিন করেছিলাম। অন্য দিকে যত উদারই হোন কলেজ ছেড়ে চাষ শিখতে যাওয়ার

এ খেয়ালে তিনি সায় দেননি। এ ধরনের কাজের যোগ্যতাই যে আমার নেই তাঁর এ ধারণাও স্পষ্ট করেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার চাষী হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে এই সন্দেহেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম সবচেয়ে বেশী। দিদিমার মতের বিরুদ্ধে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতেই তাই শান্তিনিকেতনে গিয়ে উঠেছিলাম।

সালটা ১৯২২। সময়টা পুজোর পর বোধহয় কার্তিক মাসের গোড়ার দিকে। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় আশ্রয় পাওয়া তখন খুব কঠিন ছিল না। আমি অনায়াসেই এক রাত্রের জন্যে সেখানে থাকবার ও কিচেনে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

শ্রীনিকেতনে যাওয়ার আগে একটি বিশেষ কারণে সেবারের অতিথিশালায় থাকাটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সকালবেলা অতিথিশালার একজন পরিচারককেই আমায় শ্রীনিকেতনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী করিয়েছিলাম। যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় তিনজন অতিথি ওপরের ঘর থেকে নেমে এলেন। তিনজনেই তাঁরা ইউরোপীয়। সেটা আমার কাছে কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, কারণ তখন সবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হলেও শান্তিনিকেতন যে অনেক আগে থাকতেই স্বদেশ ও বিদেশের জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে তা আমার অজানা ছিল না।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন সেই ইউরোপীয় অতিথিদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা জিনিসগুলির পরিচয় পেয়ে। ইউরোপীয় বলতেই আমরা তখন বেশীর ভাগ ইংরেজ বা ইংরেজী বলা মার্কিন বুঝতাম। এরা ইংরেজ নন, ওলন্দাজ। এসেছিলেন জাভা আর বালি থেকে। জাভা বালি তখনও ওলন্দাজ সরকারের অধীন। এরা সরকারী কর্মচারী নন প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত ও গবেষক। তাঁদের সেই গবেষণার বিষয়বস্তুই তাঁরা শান্তিনিকেতনে দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

সে বিষয়বস্তু হ'ল জাভা ও বালি দ্বীপে যা ছায়াবাজির পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে অভিনয় করে দেখানো হয় সেই রামায়ণ মহাভারতের সব চরিত্রের ছবি। সে সব ছবি দেখে আর আমাদের রামায়ণ মহাভারত যে সুমাত্রা যবদ্বীপ বালি নিয়ে সমস্ত দ্বীপময় ভারতে প্রচারিত সেদিন প্রথম তার আভাস পেয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তখন অবশ্য নয় কিন্তু পরে সন্ধান নিয়ে জেনেছি যে যবদ্বীপে এ রকম পুতুল নাচের অভিনয়ের নাম 'ওয়াই আঙ পূর্ব'।

সেই সকালে ওলন্দাজ পণ্ডিতেরা আমার জন্যে এসব ছবি অবশ্য খুলে দেখাবার আয়োজন করেননি। রবীন্দ্রনাথের সচিবদের একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতদের সঙ্গে ওই সব

ছবি ও যবদ্বীপ বালির সংস্কৃতির আরো সব নিদর্শন রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে এসেছিলেন। নিচের বড ঘরটিতে এই আলাপের সময় উপস্থিত থাকার দরুন এসব ছবি দেখা ও আলোচনার কিছুটা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়।

রবীন্দ্রনাথের সচিব হিসাবে যিনি এসেছিলেন তাঁকে নেহাত অল্পবয়সী তরুণ বলে মনে হয়েছিল। সুগৌর পরিচ্ছন্ন চেহারা কিন্তু ছোটখাটো ক্ষীণকায় এই বয়সের একজনকে এ রকম একটা দায়িত্বের পদে দেখে বেশ একটু অবাকই হয়েছিলাম। তাঁর নাম যে অমিয় চক্রবর্তী সে কথা অনেক পরে জেনেছি।

শান্তিনিকেতনে সকালের জলখাবারটুকু খেয়ে অতিথিশালার পরিচারককে নিয়ে হেঁটেই সুরুলে শ্রীনিকেতনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল প্রায় দশটা।

শ্রীনিকেতনের চেহারা এতদিনে অনেক বদলেছে কিন্তু সেখানে ঢোকার মুখেই সাবেকী পাকা কুঠিটির বোধহয় খুব পরিবর্তন হয়নি।

আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন নিচের অফিস ঘরের কামরাটিতে কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত। গেট থেকেই শ্রীসন্তোষ মজুমদার মশাই-এর নামটা জেনে এসেছিলাম, জেনেছিলাম যে এখানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তার কাছেই আবেদন করতে হবে।

অফিস ঘরে গিয়ে তাঁর খোঁজ করার কিন্তু দরকার হল না। আমায় ওই বিচিত্র পোঁটলা নিয়ে সেখানে ঢুকতে দেখে সকলেই বোধহয় একটু বিস্মিত। তার মধ্যে একজন আমার আসার উদ্দেশ্য নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম,—এখানে ভর্তি হবার জন্যে।

ভর্তি হবার জন্যে! তাদের একজন একটু অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এখন তো আর ভর্তির সময় নেই। এখানকার পড়াশোনাও অনেকদিন আগে আরম্ভ হয়ে গেছে।

অনেকদিন মানে যে মাস তিনেক তা আমার জানা ছিল। সে কথাটা উল্লেখ না করে সাহস করেই জানালাম যে পড়াশুনা যা এতদিনে হয়ে গেছে তা আমি নিজে নিজে সেরে নিতে পারব। ভর্তি হবার সুযোগটুকু শুধু আমায় দেওয়া হোক।

সাহসের সঙ্গে কাতরতাও একটু আমার নিবেদনে বোধহয় ছিল। উপস্থিত অধ্যাপকদের মধ্যে কর্তৃত্বে যাঁকে প্রবীণ মনে হচ্ছিল তিনিই সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, বেশ যদি পারো মনে কর তাহলে ভর্তি হও। তবে টার্মের প্রথম থেকেই সব ফী দিয়ে ভর্তি হতে হবে।

টার্মের গোড়া থেকে ভর্তির ফী মাইনে ইত্যাদি ধরে কত লাগবে তাও তিনি জানিয়ে দিলেন।

তাঁর কথা শুনে খানিকক্ষণ আমি একেবারে নির্বাক।

তারপর সত্য কথাটা অকুতোভয়ে বলেই ফেললাম, আজ্ঞে, ও সব ফী-টি আমি তো দিতে পারব না।

ফী দিতে পারবে না! তিনি প্রায় হতভম্ব, তাহলে?

আজ্ঞে আমি অমনি এখানে পড়তে চাই।—এবার অকুণ্ঠিত ভাবেই জানালাম আমি।

অমনি পড়তে চাও! তা কি করে হয়—বলে বেশ একটু হতাশভাবে তিনি তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে গেছিলেন পরে তার পরিচয় যথাসময়ে পেয়েছিলাম। তিনিই সন্তোষ মজুমদার।

সন্তোষ মজুমদার মশাই ওই মন্তব্য করে চলে যাবার পর আমার অবস্থাটা বেশ অপ্রস্তুত ও করুণ হবারই কথা। কিন্তু বয়সের আর স্বভাবের গুণে তা খুব হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না।

অমন একটা আজগুবী প্রস্তাব করবার ধৃষ্টতা দেখেই উপস্থিত অন্যান্যরা তখন আমার সম্বন্ধে বোধ হয় একটু কৌতূহলী হয়েছেন। আমি কি করি, কোথায় থাকি, কতদূর পর্যন্ত পড়েছি এই সব কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁদের একজন বেশ একটু গম্ভীর করেই জানতে চাইলেন, সত্যি তুমি মাইনে দিতে পারবে না?

আজ্ঞে না! প্রকাশ্যে জানিয়ে মনে মনে 'ইতি গজ' টুকুও বললাম যে, দিদিমার সঙ্গে মিটমাট হলেই পারব।

বেশ, তাহলে তুমি এক কাজ করতে পারবে? সহানুভূতির সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

কি কাজ বলুন?—সাগ্রহে জানতে চাইলাম।

অধ্যাপক মশাই কাজটা বুঝিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব লম্বা রোগা গোছের একজন সাহেব এদিকে আসবেন। তাঁর নাম এল্মহার্স্ট। তিনিই এ কৃষি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্তা। তাঁকে ঠিক ভাবে কথাটা জানাতে পারলে হয়তো আমার বিনা খরচে এখানে পড়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

আর আমায় কিছু বলতে হয়! খানিক বাদে অফিসের একজন একদিকের জানলা থেকে দূরে একজন রোগাটে লম্বা সাহেবকে মিঃ এল্মহার্স্ট বলে দেখিয়ে দিতেই তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এক ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এল্মহার্স্ট সাহেব

একটু অবাক হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। আমার দিকে চেয়ে চেষ্টা করেও চিনতে না পেরে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নতুন ভর্তি হয়েছ? তোমায় ঠিক চিনতে পারছি না তো! বলো তো কি চাও?

ঠিক কি বেঠিক ভাবে জানি না, কিন্তু তাঁর ওই জিজ্ঞাসার ওপর এক নিশ্বাসে আমার আবদারের কথাটা তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

এল্মহার্স্ট সাহেব কথাটা শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—ঠিক আছে, তোমার এখানকার খরচ লাগবে না।

সেই দিন থেকেই শ্রীনিকেতনের ছাত্র হলাম। আমায় এল্মহার্স্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার পরামর্শ যিনি দিয়েছিলেন তাঁর সাহায্যটুকু শেষ পর্যন্ত কাজে না লাগলেও তাঁর কথা সকৃতজ্ঞভাবে এখনো স্মরণ করি। তিনি হলেন অধ্যাপক কেদারেশ্বর বসু। তার পূর্ববর্তী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষ মজুমদারের মত তিনিও অ্যামেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে দেশ সেবার প্রেরণায় শ্রীনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন।

কেদারেশ্বর বাবু ছাড়া শ্রীনিকেতনের আরো কয়েকজন শিক্ষক অধ্যাপকের কথা এখনো ভুলিনি। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন ছিলেন ডাঃ কাসাহারা।

ডাঃ কাসাহারা জাপানী হর্টিকালচারিস্ট। জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথের ডাকে শ্রীনিকেতনে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। ছোটখাটো শুখনো চেহারার মানুষ। সারা দিন রাত ওই চেহারায় তাঁর পরিশ্রম করা দেখে অবাক হতে হত। ইতুচেন মিচ্চেল বলে ডাঃ কাশাহারার দুটি মেয়ের নাম মনে পড়ছে। মিচ্চেল ছিল ছোট। আমি যখন সেখানে পড়তে গেছি তখন তার বয়স পাঁচ বছরের বেশী নয়। জাপানী চেহারার আদল কিন্তু বাংলা বলত চমৎকার। আমাদের শ্রীনিকেতনের কোন্ একটি উৎসবের জন্যে ঠিক মনে পড়ছে না, তাকে আর অধ্যাপক কেদারেশ্বর বাবুর ওই রকম বয়সেরই একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাদের একটি আবৃত্তি করতে কদিন সাহায্য করেছি মনে আছে। মিচ্চেল নাকি তারপর ছোট বয়সেই মারা গেছে। কেদারেশ্বর বাবুর বাড়ি যে বিক্রমপুরের লাঙলবন্ধের কাছে একটি গ্রামে তা বছর দেড়েক বাদে আকস্মিক ভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল। ঢাকায় পড়বার সময় একবার পুজোর ছুটিতে নৌকো করে লাঙলবন্ধের কাছের একটি গ্রামে কিছুদিন বেড়াতে গিয়ে কেদারেশ্বর বাবুর সেই ছোট ভাইঝিটিকে দেখার পর সে কথা জানতে পারি।

শ্রীনিকেতনে বিনা খরচে পড়া ও থাকার সুযোগ পেয়ে সে সুযোগের অপব্যবহার আমি কিন্তু করিনি। প্রথম থেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সব কিছুতে মন লাগিয়েছিলাম।

চাষ শেখার কাজটা সোজা বা আরামের সত্যিই ছিল না। আমি যখন সেখানে প্রথম ছাত্র হয়েছি তখন অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। তখনই সেখানে বেশ শীত পড়েছে।

সেই শীতের মধ্যে ভোর পাঁচটার মধ্যে আমাদের উঠে প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি সারতে হত। তারপর করতে হত নিজের জমির কাজ। প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে নিজের নিজের আন্দাজ কাঠা তিনেক জমি বরাদ্দ থাকত। সেই জমিটুকুতে একটা কোন ফসল ফলাবার দায়িত্ব তার। সে জমির জন্যে নিজেকেই পুকুর থেকে ভারে করে জল বয়ে আনতে হত, কোদাল দিয়ে জমি খোঁড়া, মাটিতে সার দিয়ে তাতে বীজ লাগানো— সব কাজ একলার, বেলা আটটা পর্যন্ত এ কাজ করার পর জলখাবারের ডাক পড়ত কিচেনে। এই কিচেনের ব্যবস্থাতেই শান্তিনিকেতনের ওপর ছিল শ্রীনিকেতনের জিত।

পোনেরো

শ্রীনিকেতন আর শান্তিনিকেতনের কিচেনের ব্যবস্থার তফাতের কথা লিখেছিলাম। লিখেছিলাম যে সেখানেই শান্তিনিকেতনের ওপর শ্রীনিকেতনের জিত। জিতটা অন্য কিছুতে নয় শুধু নিরামিষ আমিষের ব্যাপারে।

শান্তিনিকেতনের খাওয়া তখন একেবারে নিরামিষ আর শ্রীনিকেতনে আমাদের মাছ মাংস ডিম সবই সচল। আমরা দুধের সঙ্গে সকালে ডিম পেতাম প্রাতঃরাশে, দুপুরে মাছ বা মাংস প্রায় নিত্যই জুটত আর রাতের খাবারেও আমিষ জাতীয় কিছুর অভাব বড় হত না। ব্যবস্থাটা নিশ্চয় এল্মহার্স্ট সাহেবের করা। উন্নতি সঙ্গে আমিষ প্রোটিন যে স্বাস্থ্য শক্তি ও দেহের বৃদ্ধির জন্যে দরকার শ্রীনিকেতনের শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে এ সত্যটা তিনি ভোলেননি

শান্তিনিকেতনের নিরামিষ আর শ্রীনিকেতনের আমিষ নিয়ে একটা মজার ব্যাপারের কথা মনে পড়ছে। প্রতি রবিবার আমাদের শ্রীনিকেতনের ছাত্রদের একটা সভা বসত। সভাটা বসত সন্ধ্যার পরে অফিস বাড়িরই দোতলার একটি ঘরে। সভায় ছাত্ররা ছাড়া অধ্যাপকরা অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। আর কখনো কখনো থাকতেন বাইরে থেকে নিমন্ত্রণ করে-আনা কোন একজন বিশেষ অতিথি। বাইরে থেকে মানে অবশ্য শান্তিনিকেতন থেকে।

সাহিত্য নয়, সভায় অন্য নানা বিষয়েই আলোচনা হত বলে মনে পড়ছে। বিশেষ করে একটি সভার কথা মনে আছে যার আলোচনার বিষয় ছিল আমিষ বনাম নিরামিষ।

সেবারে শান্তিনিকেতন থেকে যাঁকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আনা হয়েছিল, বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে তেমন কিছু বড় ছিলেন না, কিন্তু সেই বয়সেই আমাদের মত চাষা ছাত্রদের কাছে তিনি মান্যগণ্য শুধু নন প্রায় ক্ষণজন্মাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি তখন শুধু শান্তিনিকেতনের পড়াশুনা সেরে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীরই ছাত্র হননি, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বসন্তক'-এ তাঁর লেখাও ছাপা হয়। এসব ছাড়া শান্তিনিকেতনে প্রথমবার আসবার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে কৌতুকের আলাপ করতে করতে একদিনকার একটি সান্ধ্য সমাবেশ থেকে চলে যেতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এ হেন মানুষ সম্বন্ধে ভয় ভক্তি সম্ভ্রম যতখানি থাকা সম্ভব পুরোটাই আমাদের ছিল। আমরা কল্পনায় তাঁর মাথার চারিধারে জ্যোতির্মণ্ডলই তখন প্রায় দেখতে শুরু করেছি।

শান্তিনিকেতন থেকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে তিনি নিরামিষের মাহাত্ম্য আমাদের শোনাতে এসেছিলেন আর সেইটেই হল তার জ্বালা।

ঠিক হয়েছিল যে তিনি নিরামিষের মাহাত্ম্য বোঝাবার পর আমাদের কেউ আমিষের হয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবে। যে কারণে হোক বলার ভারটা আমাকেই দেওয়া হয়েছিল।

ভাগ্যক্রমে আমিষ নিরামিষ সম্বন্ধে আমার কিছু লেখা টেখা পড়া ছিল। আমাদের মান্য অতিথি নিরামিষের মহিমা কীর্তন করবার পর আমার সেই স্বল্প বিদ্যা থেকে বিশুদ্ধ নিরামিষের বিরুদ্ধে আমি কিছু চোখা চোখা বাণ ছুড়তে পেরেছিলাম। নিজেদের 'কোট' বলে আমার সহপাঠী আর অধ্যাপকদের একটু সরব সমর্থনই হয়তো পেয়েছিলাম, তার ওপর নিরামিষ বন্দনাটা যথার্থ আন্তরিক না হওয়ায় মাননীয় অতিথি খুব বেশী সুবিধে করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদে চুবানোর মত বেশ যেন একটু কষ্ট হয়েই চলে গিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে।

সেদিনের সে সভার নিমন্ত্রিত অতিথি পরবর্তী জীবনে সুবিখ্যাত লেখক অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ও তার ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সেদিনকার সেই বাকযুদ্ধ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে আমাকেই সেই চাষা ছাত্র হিসেবে চিনতে পেরে তিনি কৌতুকই বোধ করেছেন।

আমার কাছে সেদিন শ্রীনিকেতনের সেই আলোচনা সভার ঘটনা কিন্তু কৌতুকের বিষয় ছিল না। তার মধ্যে আমি ওখানকার জীবনের বৈচিত্র্য আর উত্তেজনার মসলাই পেয়েছি।

অনেক দিক দিয়েই সে জীবনের স্বাদ ছিল একেবারে আলাদা; মাতিয়ে রাখবার খোরাক তার মধ্যে নানা ভাবেই মিলত।

রাত্রে শুয়ে ঘুমোনোর মত সামান্য ব্যাপারটাও ঠিক ছক বাঁধা মামুলী ধরনের ছিল না। আগেই জানিয়েছি যে একটি সাধারণ কম্বল ছাড়া আর কিছু সঙ্গে নিয়ে আমি সেবার শ্রীনিকেতনে যাইনি। কৃষিবিদ্যার ছাত্রদের থাকবার জন্যে একটি করে গোল মাঝারি মাপের ঘর বরাদ্দ ছিল। এক এক ঘরে দুজন করে ছাত্রের থাকবার ব্যবস্থা। গোলাঘরের চেহারার গোলাকার ঘরগুলির কয়েকটিতে ছিল মাঝখানে চূড়ো তোলা খড়ের ছাউনি। পাকা গাঁথুনির ঘরও যা ছিল সেগুলির আকারও চূড়ো-তুলে-

ছাওয়া গোলাঘরেরই ধরনের। পাকা বা খড়ে ছাওয়া প্রত্যেকটি ক্ষুদে কুটির শুরু হল ভেতরের একটি গোল মাঝারি মাপের ঘরের দেয়ালের চারিধারে একটি ঘেরা বারান্দা মাত্র।

এ ঘরে আরাম আয়েশ করবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। প্রত্যেক ঘরে দুটি করে ফিতেয় বোনা খাট আর দুটি করে জামা কাপড় রাখবার ছোট আলনা। রাত্রে খাবারের জন্যে গেলাস আর একটি বড় জলের কুঁজো আমাদের নিজেদেরই ভরে এনে রাখতে হত।

আমার ঘরের অংশীদার যিনি ছিলেন তাঁর বাড়ি নেপালে। একসঙ্গে পড়লেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা শোনা খুব কমই হত। কারণ আমাদের প্রথম শিক্ষার বিষয় ছিল আলাদা। আমি যখন ডাঃ কাসাহারার কাছে ফুলের বাগানের তালিম নিচ্ছি তখন তিনি ভিন্ন অধ্যাপকের কাছে তরি-তরকারির চাষ শিখতেন। কিচেনে দু'বেলা খাবার টেবিলে ছাড়া এক ঘরের অংশীদার হিসাবে রাত্রেই দেখা শোনা ছিল অবধারিত। কিন্তু মজার কথা এই যে তাও হত না। তিনি যে এ ভাগের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও শুতেন বলে এই অদর্শন তা কিন্তু নয়। তিনি আমাদের এজমালি ঘরেই থাকতেন, তবে ঘরের ভেতরে ছাদের নীচে নয়, ছাদের ওপরে উদোম আকাশের তলায়। হ্যাঁ, সেই পৌষ মাসের শীতেও নেয়ারের খাটিয়াটি ছাদের ওপর তুলে শুধুমাত্র একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে তিনি সারারাত ঘুমোতেন।

সুকুল শান্তিনিকেতনের শীত তখন এখনকার চেয়ে দুঃসহ ছিল বলেই মনে হয়। আমার নেপালী সহপাঠীর দৃষ্টান্ত পুরোপুরি অনুসরণ করতে না পারলেও সেই প্রচণ্ড শীতে দুদিকের জানালা সম্পূর্ণ খোলা রেখে ঘরের ভিতরে আমার সেই কম্বলটি গায়ে জড়িয়ে ফিতের খাটিয়ার উপর শুয়ে রাত কাটাতাম। না ছিল একটা তোশক কিংবা একটা বালিশ। হাড় কনকনে শীতের রাতে পর্যন্ত জানালা দুটোর একটা পাল্লাও বন্ধ করতে লজ্জাবোধ করেছি।

এ রকম কষ্টসহিষ্ণুতা আর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে সত্যিই একটা গর্ব মেশানো উত্তেজনা তখন ছিল। এ বিষয়ে যিনি আমাদের অনেকেরই আদর্শ ছিলেন, আমাদের সেই নেপালী সহপাঠী পরে নেপালে গিয়ে খুব নাম-যশ অর্জন করেছিলেন বলে শুনেছি। পুরনো দিনের কারুর কাছ থেকে তার নাম ধাম পরিচয় এখনো হয়তো উদ্ধার করা সম্ভব।

শ্রীনিকেতনে থাকার মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনার ব্যাপার হল শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা।

অধ্যাপকদের কাছে শুনলাম পৌষমেলায় এবার অভিনয় ব্যাপার হবে

শ্রীনিকেতনের কৃষি বিদ্যালয়ের যোগদান। পৌষমেলায় অনেক দূর-দূরান্তর থেকে অনেক কিছুই প্রদর্শনীর পণ্য হিসেবে আসে। এবার তার মধ্যে শ্রীনিকেতনের ফুল ফল ফসলেরও অনেকগুলি স্টল থাকবে।

সে সব স্টলের দ্রষ্টব্য সঞ্চয় সংগ্রহের জন্যে তো বটেই সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপারের জন্যেও শিক্ষকেরা আমাদের তৈরি হওয়ার জন্যে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ব্যাপারটা হল দৌড় ঝাঁপ খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক পৌষমেলায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা হয়। এবার তাতে শ্রীনিকেতনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কিন্তু করবে কি নিয়ে? ফুটবল বা সে রকম কোন খেলার টিম গড়ে তোলবার মত যথেষ্ট ছাত্রই আমাদের মধ্যে নেই। খেলা টেলা নয়, শুধু দৌড়ের প্রতিযোগিতাতেই যোগ দেবার কথা তাই ঠিক হল।

যোগ দেবার মত দৌড়বাজ বাছাই-এর জন্যে নিজেদের মধ্যেই যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল তাতে প্রথম যিনি হলেন তার পুরো নামটা মনে নেই, পদবীটা ব্যান্যার্জি ছিল বলেই মনে হচ্ছে। ব্যানার্জিকে একাই পৌষমেলার প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে না, তার সঙ্গে দ্বিতীয় একজনও যাবে শুনলাম এবং সেই দ্বিতীয় জন যে আমি একথা জানবার পর বেশ একটু গর্ব যে বোধ করিনি এমন কথা বলব না। কিন্তু সে গর্ব চূর্ণ করবার সুযোগটুকু শেষ পযন্ত ভাগ্যকে দিইনি এই আমার সান্ত্বনা।

পৌষমেলার জন্যে তল্পি তল্পা গুটিয়ে আমাদের শ্রীনিকেতনের দলের শান্তিনিকেতনে গিয়ে ওঠবার দিন তিনেক মাত্র তখন বাকি আছে। শান্তিনিকেতনে কোথায় আমাদের থাকতে দেওয়া হবে, স্টলগুলো কোথায় কেমন ভাবে তৈরি হচ্ছে এই সব দেখার জন্যে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে সেদিন সেখানে গিয়েছিলাম। ওসব দেখা শোনার পর হাতে সময় ছিল বলে শান্তিনিকেতনের খেলার মাঠে একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

বেশীক্ষণ নয়, দাঁড়িয়েছিলাম মিনিট দশেক মাত্র। কিন্তু পৌষমেলায় দৌড়ের পাল্লায় নামবার সব উৎসাহ তখনই গিয়েছিল উবে।

সে মাঠে তখন খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপের এক রকম পরীক্ষা চলছে। তখন হচ্ছিল একশ গজ দৌড়ের পাল্লা। আমরা যেদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেটাই দৌড়ের শেষ সীমা। হুইস্‌ল দেবার পর মাঠের অন্য প্রান্ত থেকে দৌড়বাজেরা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু ছুটে আসছে তো মনে হল একজনই আর সবাই তো তার তুলনায় পিছনে যেন শুধু হেঁটে আসছে!

ঝড়ের মত সকলের আগে দৌড়সীমায় যিনি এসে পৌঁছালেন তাঁর চেহারাটা দেখলাম। শালপ্রাংশু মহাভুজঃ কি একেই বলে। তাঁর নামও সকলের মুখে উল্লসিত কণ্ঠে শুনলাম। মাসোজি! মাসোজি! ইযা মাসোজি কি ফতে! জানলাম উনিই সেই অপরাজেয় বর্গি বীর মাসোজি। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছেন অঙ্কন ইত্যাদি সূক্ষ্ম চারুশিল্প, কিন্তু খেলাধুলার সব প্রতিযোগিতার জয়মাল্য একচেটিয়া করে রেখেছেন শান্তিনিকেতনে পদার্পণের পর থেকে।

শুধু দৌড়ই নয় মাসোজির পোলভল্টও দেখলাম আর সেই মুহূর্তেই শান্তিনিকেতনের মাঠে দর্শক হিসেবে ছাড়া দাঁড়াব না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।

শুধু আমিই নয়, এ প্রতিজ্ঞা ব্যানার্জিও করেছিল এবং খেলায় হার কি জিত বলে কিছু নেই, সেখানে যোগ দেওয়াটাতেই গৌরব ইত্যাদি তত্ত্ব কথা অনেক করে শুনিয়েও তাকে মাঠে নামতে রাজী করা যায়নি।

পৌষমেলার স্পোর্টসে যোগ না দিলেও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রচুর আনন্দ উত্তেজনা উপভোগ করেছি। মাসোজি সেখানে সেবার একেশ্বর। দৌড়-লাফ পোলভল্ট কোন কিছুতেই তার ধারে কাছে কেউ পৌঁছাতে পারেনি।

বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনের আর এক পৌষমেলার অতিথি হিসেবে গিয়ে মাসোজির সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাঁকে সেই পুরানো দিনের কথা বলেছিলাম। মাসোজি শুনে হেসেছিলেন। তাঁকে দেখে কে তখন বলবে যে একদিন তিনি খেলার জগতের এমন রেকর্ড ভাঙা অদ্বিতীয় মল্লবীর ছিলেন যে, এখনকার সময় হলে অর্জুন পুরস্কারের দাবিদার হতেন। দ্বিতীয়বার যখন দেখা ও আলাপ হয় তখন চেহারার বিশাল বলিষ্ঠতাটা লুপ্ত না হলেও শিল্পের কমনীয় আভিজাত্য তার ওপর ভিন্ন ছাপ ফেলেছে। মাসোজি তখন রীতিমত খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী, শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে একটি একানে বাসা নিয়ে থাকেন। সম্প্রতি মানস সরোবর ঘুরে এসেছিলেন বলে সে ভ্রমণ কাহিনী কিছু কিছু শুনিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় বারের পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বর্তমানে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে নাগপুরের একটি শিল্প-শিক্ষায়তনের আচার্য হয়ে আছেন শুনেছি। মাত্র দুবারের দেখা ও স্বল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়েই আমার মনের মধ্যে তিনি বিরল স্মৃতি হয়ে আছেন।

শ্রীনিকেতনের সংক্ষিপ্ত ছাত্রজীবনের কথা রবীন্দ্রনাথকেও বলবার সুযোগ একবার হয়েছিল অনেক পরে। তখন সাহিত্য রচনার জন্যে তাঁর স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্য হয়েছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো কবে কোথায় নিয়েছি সে কথা জানাতে সেই প্রথমবারের পৌষমেলার কথা বলেছিলাম। সে মেলা তখন

শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার ধারেই পর পর আমাদের কয়েকটি স্টল। তাতে আমাদের নিজেদের ফলানো ফুল ফল তরিতরকারীর সব নমুনা সাজানো। একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ সদলে মেলা ঘুরতে বেরিয়ে সে স্টলগুলি দেখে গেছলেন। আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষ মজুমদার মশাইযের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা মনে আছে আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবকেই চোখে পড়েছিল। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম পিয়ার্সন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্টলে টোম্যাটো ইত্যাদির মত সবজি দেখে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দেখিস, লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে ফেলিস না যেন!

সেই সময়ে এই স্নেহের ঠাট্টায় ধন্য হয়ে যারা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনকে দেখে যদি তিনি বেশ একটু অবাক হতেন তাহলে সেটা খুব অস্বাভাবিক হত না। কারণ আর সকলের মধ্যে ওই ছেলেটির পোশাক লক্ষ্য না করে থাকা খুব শক্ত। গায়ের জামাটা এককালে যে সাদা ছিল তা বোঝবার উপায় নেই, পরনের কাপড়টার অবস্থা ততোধিক শোচনায়, তার প্রাথমিক রং খুঁজে বার করা রীতিমত গবেষণার বিষয় বললে বেশী বলা হয় না। শান্তিনিকেতনের রাঙা মাটির ধুলো জামাটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে রঙীন তো করেছেই, কাপড়টিকে করেছে তার চেয়েও বেশী। মাত্র দুটি করে ধুতি আর জামা তো সম্বল। হপ্তায় একদিন পরিষ্কার করার চেষ্টায় যথাসাধ্য সাবান ঘষেও সেগুলির লালিমা দূর করা যায়নি।

চাষা ছাত্র হিসেবে আমার প্রথম প্রণামের বর্ণনা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু হেসেছিলেন। চাষ শেখা কেন যে তারপর ছেড়ে দিয়েছিলাম তা আর জিজ্ঞাসা করেননি। করলে জবাব দিতে একটু বিব্রত হতে হত নিশ্চয়।

কারণ, যেমন হঠাৎ শিখতে গেছলাম তেমনি শ্রীনিকেতনের কৃষি শিক্ষা ভেবে চিন্তে ছাড়ব বলেই ছাড়িনি।

শান্তিনিকেতনের রাঙামাটির ধুলোয় ধূসর জামা কাপড়গুলো সেখানে থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার একটা উপলক্ষ্য ছিল বটে। শ্রীনিকেতনে যখন পড়তে হবে তখন কলকাতায় ফিরে গিয়ে জামাকাপড়ের সঙ্গে দরকারী অন্য কিছু জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি নিয়ে আসব এই ছিল বাসনা।

তখন বড়দিনের ছুটি। পৌষমেলার পর আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে কয়েকদিন কলকাতায় ঘুরে আসবার অনুমতি চাইতেই সন্তোষ মজুমদার মশাই-এর কাছে তা মিলে গেল। কম্বল জড়ানো পুটলিটি নিয়ে কলকতায় এলাম শ্রীনিকেতনে পড়ার ব্যবস্থা পাকা করে সেখানে ফিরে যেতে।

কিন্তু তা আর হল না। আকস্মিক উৎসাহে চাষ শিখতে শ্রীনিকেতনে গিয়ে হাজির হবার আগে স্কটিশ চার্চ ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে আমাদের দক্ষিণ কলকাতারই নাম পাল্টে যা বর্তমানে আশুতোষ হয়েছে তখনকার সেই সাউথ স্বারবন কলেজে নাম লিখিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম নামটা সেখানে তখনও কাটা যায়নি। বাকি পড়া মাসগুলোর ফী মিটিয়ে দিলেই আবার সেখানে পড়াশুনা করতে পারি। কিন্তু শ্রীনিকেতনেও ফেরা হল না, আশুতোষ কলেজে আবার পড়াও। তার বদলে হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে চাঁদপাল ঘাট থেকে দুপাশে দুই তেরপল ঢাকা গাধাবোট-বাঁধা 'সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের' একটি স্টীমারে ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম।

স্টীমারের ইণ্টার ক্লাসের যাত্রী সেখানে একমাত্র সঙ্গী বিমলচন্দ্র ঘোষ, টেনদা বলে যিনি তখনকার দিনে ছোট বড উঁচু নীচু গরীব বডলোক সব মহলে পরিচিত।

হঠাৎ ঢাকা রওনা হবার ও এমন করে এই জলপথে সেখানে যাবার মূল কারণই হলেন ওই টেনদা, শুধু টেনদা, নয়, যেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও যেখান থেকে ঢাকা যাওয়ার পরিকল্পনার সূত্রপাত সেই আটাশ নম্বর গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেস বাডিটিরও এ ব্যাপারে একটু ভূমিকা আছে।

টেনদার সঙ্গে এই মেস বাডিটির প্রসঙ্গ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা বলা যায় না, আর সব ছক উল্টে আমায় হঠাৎ একেবারে ঢাকায় নিয়ে পৌঁছবার রহস্য ব্যাখ্যা করতে এই দুই-এর কথাই সবিস্তারে না বললে নয়।

॥ ষোল ॥

আটাশ নম্বর গোবিন্দ ঘোষাল লেন।

টেনিদার সঙ্গে আমার আলাপ আর আমার ঢাকা যাওয়ার সূচনা ওব ঠিকানার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

যখনকাব কথা বলছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত গলিটার বাইরের চেহারা এমন কিছু বদলায়নি বললেই হয়। একটা দুটো ছোটখাট অদল বদল ছাড়া গলিটা প্রায় এক রকমই দেখতে আছে। বেশীব ভাগ বাড়িই এখনো সেই আগেকার। মাঝে এক আধটা নতুন ছোটখাট দালানকোঠা উঠেও গলিটার সাবেকী আদলটা বদলাতে পারেনি।

বাড়িগুলোর সামনের চেহারা প্রায় এক থাকলেও গলিটা আর সেই এক নেই। তাব চরিত্রটাই যেন আলাদা হয়ে গেছে। এক গভীব রাত্তিরটুকু ছাড়া তা সারাক্ষণ গিজ গিজ করছে বাচ্চা-কাচ্চা থেকে বড় ছোটদের ভিড়ে। দুদিকের বড় রাস্তার জনতা থেকে যেটা একটা পালিয়ে আসবার নির্জন আশ্রয় ছিল, সেইটেই এখন সব বয়সের বিশেষ করে কচি-কাঁচাদের ভিড়ে ঠাসা। পৃথিবীর পপুলেশন্ এক্সপ্লোশন-এর প্রমাণ খুঁজতে আমাদের মত এ গলির পুরানো বাসিন্দারের পরিসংখ্যানের বই-এর পাতা ওল্টাতে হয় না, এ গলি দিয়ে একবার হাঁটাই যথেষ্ট।

আটাশ নম্বর বাড়িটা এ গলিটার ঠিক মূল পথের ওপরে নয়। তা থেকে বেরিয়ে একটা ফ্যাকড়া কানাগলি যেখানে শেষ হয়েছে বাড়িটা সেইখানেই।

ছোটখাট নয়, রীতিমত বিবাট দোমহলা ও দোতলা একটি বাড়ি। বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকবার পর দেখা যেত ভেতরের বেশ প্রশস্ত উঠোনের চারিদিকে ঘিরে ওপরে নীচে, সামনে বারান্দা দেওয়া কম পক্ষে ত্রিশ বত্রিশটি ঘর। ঘরগুলি নেহাত ছোট-খাট নয়, প্রমাণ মাপের।

এই বিরাট বাড়িটা ভাড়া নিয়ে টেনদাই এখানে প্রথম মেস বসিয়েছিলেন। যেমন তেমন মেস নয়, তখনকার সস্তাগণ্ডার দিনেও কলকাতা শহরের বোধহয় সবচেয়ে সস্তা সীটরেণ্টের মেস। কোন ঘরে দুটির বেশী বোর্ডারের খাট পড়ত না, আর তার জন্যে মাথাপিছু মাসিক চার্জ দিতে হত নগদ এক টাকা।

এ অসম্ভব সম্ভব করার পুরো কৃতিত্ব আমাদের টেনদার। অন্য কারুর অনুগ্রহ কি কপাল জোরে নয়, শুধু তাঁর নিজের কাণ্ডজ্ঞান আর সাহসের জোরেই এ কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। সাহসের জোরে সস্তায় বাড়ি পাওয়ার রহস্যটা বলবার মত।

ভাঙাচোরা পোড়ো ভিটে নয়, বেশ মজবুত বাড়ি। তখনকার দিনে কলকাতা শহরে বাড়ির আকাল হয়নি। তবু মাত্র ত্রিশটাকা ভাড়ায় ওরকম একটা বাড়ি পাওয়া তখনও অবিশ্বাস্য ছিল।

টেনদা কিন্তু সত্যিই তাই পেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন বাড়িটার একটা লোমহর্ষণ দুর্নামের জন্যে। সে দুর্নাম এমন যে প্রায় দশ বছর ধরে ও বাড়িতে কেউ বাস করতে সাহস করেনি। ভাড়া দিয়ে তো দূরের কথা, অমনি পেলেও ও বাড়িতে কেউ নাকি থাকতে রাজী ছিল না।

বলাই বাহুল্য, দুর্নামটা ভৌতিক অপবাদের। সে অপবাদের এমন অকাট্য প্রমাণ নাকি ছিল যে, সারা দক্ষিণ কলকাতায় ও বাড়িতে বাস করতে আসার বুকের পাটা কারুর ছিল না।

বাড়িটা সম্বন্ধে যা শোনা যেত তা সম্পূর্ণ অমূলকও নয়। দশ বৎসর ধরে খালি পড়ে থাকার আগে কমবেশী কুড়ি বছরের মধ্যে তিনটি পরিবার এ বাড়িতে বাস করতে গিয়ে প্রায় নির্বংশ হয়ে গেছে। কাছাকাছি পাড়ার বাসিন্দা হবার দরুন ছেলেবেলা থেকে আমি নিজেও এ বিষয়ে কিছু শুনেছিলাম ও জেনেছিলাম। তিনটি পরিবারের অনেকগুলি মানুষের খুব কাছাকাছি পর পর মারা যাওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজলে পাওয়া যেত না এমন নয়। বাড়িটি প্রথমে যাঁদের ছিল তাদের থেকে শুরু করে তৃতীয় ও শেষ পরিবারের অনেকের মধ্যে কেউ কেউ টাইফয়েডের মত রোগে কেউ বা আকস্মিক দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিকভাবে বার্ধক্যের দরুনই গত হয়েছেন, কিন্তু বেশ একটু অল্প সময়ের মধ্যে ঘটায়, ঘটনাগুলি প্রতিবেশী সাধারণের কাছে বাড়িটি অভিশপ্ত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবেই গণ্য হয়েছে।

বাস করা দূরে থাক, যে বাড়ির মধ্যে পা দিতেও কেউ তখন সাহস করে না, সেই অভিশপ্ত বাড়িটি হঠাৎ একদিন নামমাত্র টাকায় ভাড়া হয়ে গেছে। ভাড়া নিয়েছেন টেনদা, ওখানে মেস করবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে।

ও বাড়িতে মেস বসানো খুব সহজ হয়নি অবশ্য। প্রায় নিখরচায় অমন সব ঘরে হাত পা ছড়িয়ে থাকবার সুবিধে থাকা সত্ত্বেও ও বাড়ির অভিশাপের ভয় বেশীর ভাগ হবু বোর্ডারকেই প্রথমে পেছপাও করেছে।

টেনদা তাতে অবশ্য দমেননি। তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত আর মজার যুক্তিতে ধীরে ধীরে খালি সীটগুলো ভর্তি করেছে।

গোড়ার দিকে যখন তাঁর রাখা ঠাকুর চাকরও ও বাড়িতে রাত কাটাতে রাজী হত না, রাত্রের রান্নাবান্না সন্ধ্যের মধ্যেই সেরে ওখান থেকে বেরিয়ে যেত, টেনদা তখন বেশ কিছু দিন একলাই মেসে পরের পর রাত কাটিয়েছেন।

গল্প শুনেছি যে, খুব যারা উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী, সে রকম কেউ কেউ গভীর রাত্রে দূর থেকে বাড়িটাকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছে এবং তাতে মাঝে মাঝে বাড়ির দোতলার এক এক জানলায় ও তেতালার ছাদে রহস্যজনক আলোও নাকি নড়ে বড়াচ্ছে বলে দেখতে পেয়েছে।

টেনদাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাকি জবাব দিতেন যে, তিনিও যেন এক আধবার ঘুম ভেঙে ও রকম আলো গোছের কিছু দেখেছেন। তবে তাতে তাঁর কোন অনিষ্ট যখন হয়নি তখন বোঝা যাচ্ছে আলোটার অপদেবতার অশুভ শক্তি নেই। বরং বাড়িটা পাহারা দেবার কাজই তাকে দিয়ে হয়।

যারা একটু দোনামনা হয়ে মেসের সীটের খোঁজ করতে আসত তাদের তিনি অন্য যুক্তিও শোনাতেন। বলতেন, বাড়ির ওপর অভিশাপ যদি থাকে তাহলে তিন তিনবার এখানে নামবার পর তার ঝাঁঝ মরে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া অভিশাপ থাকলে তা শেকড় গেড়ে যারা এখানে বসতে চায় তাদের ওপর থাকবে, যারা দুদিনের জন্যে ভেসে এসে লেগে আবার ভেসে যায় তাদের ওপর খাটবে কেন!

শুধু তাঁর নিজের সাহসের দৃষ্টান্ত আর এই সব যুক্তি মেলার দরুন নয়, মেসটার সুলভতা আর সুপরিচালনার খ্যাতিও বাড়িটার দুর্নাম ধীরে ধীরে কাটাতে সাহায্য করেছে।

পর পর তিনটি পরিবারের শোচনীয় পরিণামের ব্যাপার ছাড়াও বাড়িটা সম্বন্ধে বেশ একটু ভয়-মেশানো অস্বস্তি জাগবার অন্য কারণও অবশ্য ছিল।

আমার নিজেরই সে রকম একটা আচমকা আতঙ্কের অভিজ্ঞতা ও-বাড়িতে হয়েছে। দিদিমা সে সময়ে কাশীর বাড়িতে গিয়ে কাশীবাস করবেন সঙ্কল্প করবার পর নিজেদের বাড়িটার বেশীর ভাগ ভাড়া দিয়ে আমি যখন ও মেসে গিয়ে উঠেছি তখন মেসটা রীতিমত জমজমাট হয়ে উঠেছে বলা চলে। ওপর নিচের বেশীর ভাগ সাটই তখন ভর্তি। বোর্ডাররা প্রায় সকলেই কাছাকাছি গ্রাম গঞ্জের মানুষ, নেহাত চাকরির দায়ে সোম থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত মেসে থেকে শনিবার দুপুরেই বাড়ি রওনা হয়ে যান। ফেরেন আবার সেই সোমবার সন্ধ্যায় অফিস ছুটির পর।

সেদিন এমনি একটা শনিবারই যেন ছিল মনে হচ্ছে। অন্তত মেসটা একরকম খালি। নিচে ঠাকুর চাকর বাকর ক'জন মাত্র আছে, আর ওপরের এক কোণের ঘরে টেনদা।

কোথায় কার বাড়িতে যেন নেমন্তন্ন ছিল বলে সেদিন আমার একটু ফিরতে রাত হয়েছে। সাধারণত রাত সাড়ে দশটা বেজে গেলেই বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল। এক আধ দিন কোন বিশেষ কাজে কারুর বাইরে থাকবার দরকার হলে আগে থাকতে জানাতে হত। তালা না পড়ে গিয়ে দরজাগুলো তাতে শুধু ভেজানো থাকত। বাইরের লোকের দায়িত্ব ছিল ভেতরে ঢুকে বিশেষ জায়গায় রাখা তালাটা বন্ধ করে চাবিটা আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া।

সেদিন আমাকেও তাই করতে হয়েছিল। রাত একটু বেশী হয়ে গেছল। মেসের কোথাও কারুর একটু সাড়াও ছিল না। আর সাড়া থাকবেই বা কার? টেনদা নিজের ঘরে তাঁর নিয়মমত দশটার আগেই শুয়ে পড়ে নিশ্চয়ই তখন গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছেন, আর নিচের ঠাকুর চাকররা তো সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর ঘুমে একেবারে বেহুঁশ।

প্রকাণ্ড নিস্তব্ধ বাড়িটার ভেতর ঢুকে তাই প্রথমেই কেমন একটু অস্বস্তি লাগছিল। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির পাশে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন রোজ সারারাত জ্বালা থাকে। সেদিনও ছিল। সেটা নিয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্যে ওপরে উঠতে উঠতে নির্জন অন্ধকার বাড়িটার একটা বুক-চাপা প্রভাব যেন আরো বেশী করে অনুভব করলাম।

আমার ঘরটা দোতলার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শেষে। সেখানে পৌঁছে চাবি বার করে দরজার তালা খুলতে খুলতে এতক্ষণের অস্বস্তিটা নেহাত কাল্পনিক বলে প্রায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। আমার কামরায় আমি তখনকার মত একলা। শুধু সেদিন শনিবার বলেই আমার ঘরের অন্য সীটটা খালি নয়, সে সীটের অধিকারী বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়ায় প্রায় হপ্তা দুয়েক ধরে আমি তখন ঘরটা একলাই দখল করে আছি। এই দু-হপ্তার মধ্যে শনি রবিও ছিল। যদি স্বচ্ছন্দে এই ঘরে তখন একলা রাত কাটাতে পেরে থাকি তাহলে হঠাৎ একদিন একটু রাত করে ফেরার দরুন বাড়িটা স্বাভাবিক ভাবে নিস্তব্ধ ও অন্ধকার দেখে অস্বস্তি বোধ করব কেন? সেটা নেহাত ছেলেমানুষী ভয় বলে নিজেকে বুঝিয়ে ঘর থেকে সাবান তোয়ালে বার করে ওই বাতিটা নিয়ে দোতলার খোলা স্নানের জায়গায় গেলাম বারান্দার বাইরের দরজাটা খুলে।

এই খোলা বাথরুমে যাওয়া নিয়ে মনের মধ্যে একটু তোলপাড় অবশ্য এই-টুকুর মধ্যেই করতে হয়েছে। বিরাট চকমেলানো বাড়ি হলেও তার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ছিল সেকেলে। একতলায় পর পর দুটো ছাড়া ওপরে দোতলায় কোন স্নানাদির ঘরই ছিল না, এ অসুবিধে দূর করতে টেনদা নিজেই দোতলায় সিঁড়ির মাথায় দক্ষিণ-পুবের দেয়ালে একটা দরজা ফুটিয়ে বাইরের খোলা ছাদে কল জল সমেত একটা বাথরুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাথরুমটা কিন্তু খোলা ছাদের ওপর। চারিদিকে কোন দেয়াল-টেয়াল বা মাথায় কোন ছাউনির বালাই নেই।

না থাকার জন্যে ক্ষতি অবশ্য কিছু ছিল না। মেস বাড়ির পিছন দিকটা তখন একটা জঙ্গল বললেই হয়। কোন কালে জায়গাটায় হয়তো কারুর বাগানবাড়ি ছিল, কিন্তু একেবারে অনাদরে অযত্নে বেশ কয়েক যুগ পড়ে থাকায় তখন তার একটা ভয়াবহ চেহারা হয়েছে। দিনের বেলা আমাদের পিছনের খোলা ছাদের বাথরুমে দাঁড়ালে দক্ষিণে ও পশ্চিমে যা চোখে পড়ত তা আগাছায় ঢাকা মুখ থুবড়ে পড়া একটা ছোট দালানের ভগ্নস্তূপ, দুটো প্রায় শুকিয়ে আসা পানা আর দামে ঢাকা এঁদো মজে যাওয়া পুকুর, আর বুনো সব গাছ আর লতাপাতার জঙ্গল। দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রায় দুশো গজ ছড়ানো সে জঙ্গল এমন বিশ্রীভাবে ঘন যে তখনকার দিনে ছাগল গরু নিয়েও কেউ সেখানে চরাতে ঢুকত না।

এই জঙ্গলটা থাকার দরুনই দোতলার খোলা ছাদের বাথরুমের কোন আব্রুর দরকার ছিল না। দিনের বেলা এ বাথরুমে দাঁড়িয়ে সামনের জংলা বাগানটাই যে এ বাড়ির ভৌতিক দুর্নামের একটা কারণ তা অনেকবার মনে হয়েছে।

দিনের বেলায় যে ভয়টা অমূলক বলে অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পেরেছি সেদিন রাত্রে সেটাকে অগ্রাহ্য করা কিন্তু সে রকম সহজ হয়নি। নিজের কাছে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে জোর করে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির মাথার বাইরের দরজা খুলে লণ্ঠনটা নিয়ে খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালেও সহজ বা স্বচ্ছন্দ একদমই বোধ করতে পারিনি। তখন গ্যাসের আলোও ও-দিকটাতে কোথাও আসেনি। জঙ্গলের দিকটা একেবারে যেন নিরেট অন্ধকার। কান পাতলে বেয়াড়া গোছের কিছু আওয়াজও হয়তো পাওয়া যায়। কান তাই পাতিনি, চেয়ে দেখবারও চেষ্টা করিনি সেই জমাট অন্ধকারের দিকে। কোন রকমে চোখ বুজে কলটা খুলে সাবান দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাথরুমের কাজ সেরে ভুষো জমা চিমনিতে আলো ঢাকা পড়া লণ্ঠনটা হাতে নিয়েছি ভেতরে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু লণ্ঠনটা সবেগে নামাতে হয়েছে তৎক্ষণাৎ। সেই মুহূর্তেই সমস্ত শরীরের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। তীব্র

আহরণে হাত থেকে সভয়ে সবেগে নামানো লণ্ঠনটা যে ছাদে আছড়ে পড়েনি এইটেই ভাগ্য।

সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা এই ভয়ের মধ্যেই একেবারে বেসামাল কিন্তু হইনি। লণ্ঠনটা নামিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখব কি, ভুষো পড়া লণ্ঠনটার ক্ষীণ আলোয় বাথরুমের কলতলাটাই ভাল করে দেখা যায় না। চারিধারের অন্ধকারের দেয়াল সে আলো একটুও ফিকে করতে পারেনি। নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেছে তার মধ্যে।

কোথাও কিছু না দেখে মনটাকে অনেক কষ্টে শক্ত করে আবার লণ্ঠনটা তুলে নিতে গিয়েছি ফিরে যাবার জন্যে। তখনই আবার সেই বুকের রক্ত জল করে দেওয়া শব্দ।

ঠিক আমার পায়ের কাছে ছাদের মেঝে থেকে ওঠা কি রকম একটা যেন তীব্র হিস্-এর মত আওয়াজ।

অবশ হয়ে যাওয়া শরীরে কোন রকমে কাঠ হয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর প্রাণপণে মনটাকে শক্ত করে নিচের দিকে চাইলাম। না, কোথাও কিছু নেই। চারিদিকে যেটুকুও দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

তাহলে?

পরের মুহূর্তেই বাতিটা তুলে নিয়ে একেবারে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে ভেতরে গিয়ে বারান্দার দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়ালাম। বাতিটা নিয়ে ছুটে পালাবার সময় আর একবার হিস গোছের শব্দটা উঠেছিল। কিন্তু তাতে আমার ছুটে আসাটাই ত্বরান্বিত করেছে। সে আওয়াজ কেন তা দেখবার জন্যে এক সেকেণ্ডও দাঁড়াইনি।

বারান্দার বাইরের দরজাটা বন্ধ করবার পর কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছুটা সামলে লণ্ঠনটা হাতে নিয়েই নিজের কামরার দিকে গেলাম। কিন্তু ঘরে ঢোকবার আগে সেখানে বেশ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। আমার কামরার দরজায় টেনদা খালি গায়ে দাঁড়িয়ে।

খোলা ছাদের কলতলায় প্রথম অদ্ভুত আওয়াজটা শোনার পর সামান্য একটু চিৎকার বোধহয় আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছিল। সেটা না শুনতে পান, আমার হুড়মুড় করে ছুটে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করাটা নিশ্চয়ই টেনদার ঘুম ভাঙিয়েছে। সেইজন্যেই যে ঘর থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভরসা কি সান্ত্বনা দেবার জন্যে যা-ই তিনি এখন বলুন না কেন তাঁর কাছে আমার ভয়টা এভাবে ধরা পড়ার লজ্জায় আমার এ মেসে আর মুখ দেখানো শক্ত হবে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। টেনদা কিছুই বললেন না স বিষয়ে। নিজেই যেন একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, তোকে আবার এত রাত্রে বিরক্ত করতে আসতে হল। তোর দেশলাইটা একবার দে তো। আমারটার কাঠি ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎ দেশলাই চাইবার খোঁড়া অজুহাতটা শুনে একটু অবাকই হলাম। টেনদা বা আমি দুজনের কেউই সিগারেট টিগারেট খাই না। তবে তখনও আমাদের মেসে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। তাই প্রত্যেক ঘরে একটা লণ্ঠন বা মোমবাতির ব্যবস্থা থাকে। রাত্রে শোবার আগে সে বাতি বেশীর ভাগ ঘরে নেভানোই থাকে। টেনদার ঘরে তো বটেই। কোন কারণে তা জ্বালাবার দরকার হলে টেনদার নিজেরই দেশলাইয়ের ব্যবস্থা যে থাকে তা সবাই জানে। বিয়ে-থা করে সংসারী না হলেও টেনদা অত্যন্ত গুছোনো মানুষ। সেই টেনদার হঠাৎ দেশলাইয়ের ছুতো করে আমার ঘরে আসার মানেটা তাই ভাল করেই বুঝলাম।

ঘরের ভেতর গিয়ে নিজের টেবিলের মোমবাতিটা জ্বেলে দেশলাইটা টেনদাকে দিলাম। সেটা হাতে নিয়ে আমার ঘরের অন্য খালি তক্তপোষটা যেন হঠাৎ লক্ষ্য করে টেনদা বললেন, অ্যাঁ, তোর ঘরের অন্য সীটটা তো খালি। বিনয় বাবু তো লম্বা ছুটিতে গেছেন। আজ রাতটা তো এ ঘরে এসে শুলেই পারি। তোর ঘরে বেশ দক্ষিণের হাওয়া আছে।

আমায় সাহস দিতে আসার জন্যে এ খোঁড়া অজুহাতটার মানেটা অবশ্য তখনই বুঝলাম। কিন্তু তখন খোলা ছাদের কলঘরে আমার ভয় পাওয়ার ভেতরকার রহস্য আমি বুঝে ফেলেছি।

না। আপনার এঘরে এসে শোবার দরকার নেই।—বলে একটু হেসে সেই সঙ্গেই অকপটে জানালাম, জানেন টেনদা, খানিক আগে দারুণ ভয় পেয়েছিলাম।

মুখে কিছু না বলে টেনদা যেন একটু অবাক আর উৎসুক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

খোলা ছাদের কলঘরের সমস্ত ঘটনাটা তাঁকে শুনিয়ে তারপর হেসে বললাম, ও আজগুবি হিস্-এর রহস্য কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি এখন।

কি বুঝেছিস? জিজ্ঞাসা করলেন টেনদা।

ওটা, তেতে আগুন হয়ে থাকা লণ্ঠনটার মাথায় হাত ধোয়ার পর আমার হাতের

জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ। নিশুতি রাত্রের নিস্তব্ধতায় ওটা অশরীরী সাপের হিস্-এর মত অমন বিদঘুটে শুনিয়েছে।

টেনদা আর আমি দুজনেই তারপর আর হাসি থামাতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত হাসি থামাবার পর টেনদা আমার দেশলাইটি আমাকেই ফেরত দিয়ে শুধু বলে গেল, যাক্ দেশলাইটায় আর দরকার নেই।

টেনদার সামান্য একটু পরিচয় এই।

॥ সতেরো ॥

দু' দিকে দুটো ঢাউস মাল বোঝাই তেরপল ঢাকা গাধাবোট বাঁধা তখনকার দিনের সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের স্টীমার। তার ইণ্টার-ক্লাসের যাত্রী আমরা দুজন—টেনদা আর আমি।

ইণ্টার-ক্লাসে আর কোন যাত্রী নেই। খোলা ডেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীও আছে মাত্র কয়েকজন চাষী পুরুষ মেয়ে। তারা কেউ কেউ ডায়মণ্ড হারবারে, আর বাকী সবাই মাতলার পর নেমে যাবে।

আমাদের সামান্য তল্পিতল্পা নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে স্টীমারে এসে ওঠবার পর স্টীমারটা ঘুরে-টুরে এসব খবরাখবর নিয়েছি।

স্টীমারে উঠতে হয়েছিল বেলা তিনটের মধ্যেই। দুদিকে দুই ঢাউস গাধাবোট থাকা সত্ত্বেও লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে সারেঙের টঙের কেবিন পর্যন্ত গিয়ে চারপাশের নদীর দৃশ্য দেখে বেশ একটা উত্তেজনা আর উল্লাসই মনের মধ্যে জেগেছিল। এ রকম একটা লম্বা জলপথের পাড়ি আমার এই প্রথম। ছেলেবেলায় নৌকায় চড়ে গঙ্গা-সাগরে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে যাওয়ার স্বাদ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

স্টীমারে করে যাওয়ার যে উৎসাহ উত্তেজনা দুপুরবেলা বোধ করেছিলাম স্টীমার ছাড়বার সময় সেটা কিন্তু আর রইল না।

স্টীমার ছাড়ল মাঝ রাত্রে। স্টীমারের ভেতর আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। দুদিকে ক্যানভাসের পর্দা ঝুলিয়ে আমাদের জন্য ইণ্টার ক্লাস বলে যেটুকু জায়গা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে একটা খুব কম পাওয়ারের বাল্ব মিট-মিট করে জ্বলে শুধু নিজের অস্তিত্বটুকু কোন মতে ঘোষণা করছে, ভেতরে যখন আলোর এই দুরবস্থায় মনটা দমে আছে তখন বাইরে যে নদীর দৃশ্য দেখে স্টীমার ছাড়ার ব্যাপারটা উপভোগ করব তারও উপায় নেই। দু দিকে বাধা দুই বিরাট গাধাবোট সেখানে পাহাড়ের মত দৃষ্টি আড়াল করে আছে। অত রাত্রে তো আর সারেঙের কেবিনে গিয়ে ওঠা যায় না। সে অনুমতি চাইতে যাবার মত উৎসাহ আর নেই।

কলকাতা ছেড়ে জলপথে দীর্ঘ পাড়ি দেওয়ার প্রথম রাতটা তাই অত্যন্ত বিষণ্ণ বিস্বাদই লেগেছিল। মনটা এমন দমে গিয়েছিল যে নেহাত টেনদা সঙ্গে না থাকলে

পরের দিনই স্টীমার যেখানে বাঁধবে সেখান থেকে বোধহয় ফিরে আসবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠতাম।

টেনদার জন্যেই এ জলপথের পাড়ি। পাড়িটা দেবার অবশ্য দরকার ছিল না। আসল উদ্দেশ্যটা হল টেনদাকে তাঁর ঢাকার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাবটা আমি নিজে থেকেই করেছিলাম। কোথাও কখনও কারুর সাহায্য নেওয়া টেনদার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ হলেও এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাবটা তিনি খুশি মনেই মেনে নিয়েছিলেন। মেনে নেওয়ার কয়েকটা কারণও ছিল। প্রধান কারণ হল কিছুদিন আগে তাঁর রীতিমত সাংঘাতিক ধরনের অসুখ হওয়া। একটু হাঁচি কাশিও যাঁর কখনও দেখিনি সেই লোহার শরীরের মানুষ হঠাৎ একদিন মেসে এসে একেবারে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে এত রক্ত পরীক্ষা টরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। অসুখটা কি তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু সেটা যে সাধারণ কিছু নয় তা জ্বরের চাল চলন দেখেই বোঝা গেছল। দু' হপ্তারও বেশী প্রায় বেহুঁশ হয়ে কাটাবার পর নেহাত লোহার শরীর বলেই শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর সুস্থ হবার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তখন তাঁর চেহারা দেখলে আর চেনা যায় না। যেমন শীর্ণ তেমনি দুর্বল।

মনের দিক দিয়ে কিন্তু টেনদার কোন পরিবর্তন নেই। দু'দিন একটু পথ্যি পেয়ে বিছানায় উঠে বসতে না বসতেই বললেন, আর এখানে নয় রে। ক'দিন দেশে ঘুরে আসতেই হবে।

দেশে মানে ঢাকা শহরে। আর মুখ দিয়ে কথাটা যখন বেরিয়েছে তখন আর দেরী-টেরী নয়। ঢাকা রওনা হতে চান তখুনি। এই শরীরে যাওয়ার ধকলটা বড় বেশী হবে বলে ক'টা দিন অপেক্ষা করে যাওয়ার অনুরোধ উপরোধ যখন শুনলেন না তখন আমিও জেদ ধরে বললাম, বেশ এখন যেতে হলে আমিও তোমার সঙ্গী হব।

ভেবেছিলাম রাগ করবেন, কিন্তু তার বদলে খুশিই হলেন আর তাইতেই ঠিক করলেন, শিয়ালদা থেকে ট্রেনে-ফ্রেনে নয়, চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমারেই যাওয়া হবে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। সেখান থেকে ঢাকা বলতে গেলে দু-পা-র বেশী নয়। ঢাকা কেন, পূর্ববঙ্গের কোথাও যাওয়া আমার এই প্রথম, স্টীমারে এত দূর পাড়ি দেওয়াও তাই।

প্রথম রাত্রে মনটা একেবারে দমে গেলেও তারপর সমস্ত পাড়িটা একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে সেই স্টীমার যাত্রা থেকেই আমার জীবন যেন এক নতুন পাতা উল্টেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

জলপথের অভিজ্ঞতা যা হয়েছিল তা সত্যিই বিচিত্র। ওই সামান্য ক'দিনের পাড়ি এত রকম নতুন অজানা অভিজ্ঞতায় যে ঠাসা হতে পারে তা আগে কল্পনাই করিনি।

বৈশাখ মাস। ভাগীরথী বেয়ে ডায়মণ্ড হারবার পার হবার পর মাতলার মোহনায় পৌঁছে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছে স্টীমার। নদীর মোহনা শেষ হয়ে যেখানে সমুদ্র শুরু হয়েছে, চারিদিকে জল ছাড়া ডাঙার চিহ্নই যেন নেই। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে কালাপানির সাইক্লোনের বর্ণনা পড়বার সৌভাগ্য তখনও হয়নি, কিন্তু সামান্য হলেও তার তীব্র একটু আভাস সেই দিনই আমি পেয়েছি। বিকেল নাগাদ মাতলার মোহনা পার হবার সময় তুফানটা ওঠে। আমাদের দু'দিকে দুই বিরাট গাধাবোট বাঁধা থাকার দরুন খুশিমত ঝড়ের তাণ্ডব দেখবার সুযোগ ছিল না। সে সুযোগ থাকলেও তা উপভোগ করার মত মনের অবস্থা থাকত কি না সন্দেহ। দুটো গাধাবোট আর স্টীমারটা নিয়ে তুফান আর সাগর মোহনার উদ্দাম ঢেউ যে রকম মাতামাতি করছিল তাতে মনে হচ্ছিল দু'দিকের দুটো গাধাবোটই বুঝি স্টীমারটার ঘাড়ের ওপর উল্টে পড়বে।

স্টীমারের অবস্থা যে সত্যি কি হয়েছে কিছুই তখন বুঝতে পারছি না। ঝড়ের গর্জনের ওপর সারেঙ-সাহেবের নির্দেশ জানাবার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি আর মাঝে মাঝে দু-একজন মাল্লা খালাসীর অস্থির ছোটাছুটিতে স্টীমারের সঙ্গে তলিয়ে যাবার আতঙ্ক যে খানিকক্ষণ দারুণ ভাবে জেগেছিল এ কথা অস্বীকার করবার নয়।

জনাতিনেক চাষী মেয়ে পুরুষ যাত্রী যা ছিল তাদের ভয়ে ছাই-মেড়ে-দেওয়া মুখের চেহারা দেখে নিজেরটা অনুমান করতে বোধহয় পারতাম। কিন্তু তখন ও রকম ভাবে কিছু লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

টেনদা কি করছিলেন তখন? একেবারে কি নির্বিকার নির্লিপ্ত? না, তা তো নয়। ঝড়ের তাণ্ডব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথম আমাদের যৎসামান্য মাল-পত্রের ঝোলাঝুলি বাক্স গুছিয়ে একদিকে লোহার রডের সঙ্গে বেঁধে সেখানে বসে ছিলেন। প্রথমটায় একটু উঠে হেঁটে এদিক ওদিক ঘুরে দেখবার ভীত চেষ্টার পর আমিও সেইখানেই তাঁর কাছে গিয়ে রডটা ধরে বসে ছিলাম।

খানিকক্ষণ ওইভাবে বসে থাকবার পর টেনদা যা বলেছিলেন ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে তা অবশ্য এখন বলতে পারব না। কিন্তু তার সারটুকু যা মনে আছে তা হল এই যে, অসীম আনন্দের মত গভীর দুঃখ কি দারুণ ভয়ও কখনো-সখনো পেতে হয়। সেটা শেষপর্যন্ত লাভ বই লোকসান নয়।

উপদেশ কি বাণী দেবার মত করে নয়, ঠোঁট টেপা যেন একটু হাসি মিশিয়েই কথাগুলো বলেছিলেন। সেই সঙ্গে আরো বলেছিলেন, আমাদের ঝড়ের সঙ্গে চেনা শোনা একটু বেশী, বুঝেছিস! খোঁজ নিয়ে দেখিস। কারণ যা-ই হোক, পূর্ববাংলায় গড়পড়তা ঝড় তুফান পশ্চিমের চেয়ে বেশীই হয়। তাই এ ভয়টা আমাদের একটু গা সওয়া।

টেনদার কথাটা যে ভুল নয় পরে খোঁজ খবর নিয়ে তাই অবশ্য জেনেছি।

সেদিনকার ঝড় স্টীমার আর দুই গাধাবোটকে যথাসম্ভব নাকাল করে রাত্রের দিকে থেমেছিল। পরের দিন সকালে সাগর মোহনা পেরিয়ে আবার এক গাঙের পথে স্টীমার ঢুকেছে।

সুন্দরবন শব্দটা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি। কিশোর বয়সে গঙ্গাসাগর যাওয়ার সময় তার কিছু আভাসও পেয়েছিলাম। কিন্তু এইবারে সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের স্টীমারে সুন্দরবনের ভেতর দিয়েই পশ্চিম থেকে পূবে অখণ্ড বাংলার দক্ষিণমুখী সব নদীর ধারা পার হয়ে যেতে যেতে সুন্দরবনের সত্যিকারের চেহারা যা দেখলাম তা কোনদিন কল্পনাতেও ছিল না।

কোথাও সমুদ্রের মত দু'কূল হারানো বিরাট গাঙ, কোথাও দু'দিকের জঙ্গল প্রায় গায়ে এসে লাগা সরু সব জলপথের ভেতর দিয়ে আমাদের স্টীমার যাবার সময় মনে হচ্ছিল এ যেন সম্পূর্ণ অজানা অনাবিষ্কৃত এক জলজঙ্গলের জগৎ, যেখানে আমরাই প্রথম দুঃসাহসী আগন্তুক। হপ্তায় দু'বার করে এই পথেই যে আমাদের মত মালবাহী স্টীমার যাতায়াত করে তা যেন ভাবতেই পারছিলাম না।

ইতিমধ্যেই স্টীমারের সারেঙ সাহেবের সঙ্গে বেশ একটু ভাব সাব হয়ে গেছে। দিন রাত্রে বেশির ভাগ সময় তাঁর টঙের কণ্ট্রোল-কেবিনেই তাঁর সঙ্গে গল্প করে আর অবাধে চারিদিকের দৃশ্য দেখে কাটাই।

সারেঙ সাহেব প্রৌঢ় হয়েছেন, কিন্তু মেদহীন শক্তসমর্থ, যেন ইস্পাতে গড়া চেহারা। চট্টগ্রামের মানুষ। এককালে অনেক বড় জাহাজে সত্যিকারের বার-দরিয়ায় নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রৌঢ় বয়সে চাকরি নিয়েছেন এই স্টীমার সার্ভিসে। তা এ চাকরিও করছেন প্রায় আট দশ বছর। এসব নদীপথ প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে বলা চলে।

তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়ে তাঁর মুখেই শুনলাম যে, মাতলার মোহনায় যে ঝড়ে আমরা পড়েছিলাম তা নাকি সত্যিই বেশ গুরুতর ব্যাপার। এই জলপথে এতদিনের যাওয়া-আসায় এ রকম ঝড়ে তিনি নাকি আগে কখনও পড়েননি।

আমাদের বরাতেই বোধহয় তাঁর এবারের পাড়িতে আরেকটা অসাধারণ আশাতীত ব্যাপারও ঘটে গেল। ঘটল একটু নাটকীয় ভাবেই।

নাম-ধাম মনে নেই। মাতলার মোহনা দূরে ফেলে এসে খুব একটা বিরাট গাঙের ভেতর দিয়ে তখন আমরা যাচ্ছি। একদিকে ছাড়া আর তিনদিকেই অকূল জল। একদিকে শুধু আদিম গহন বন গাঙের কিনার পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এ জলপথে আসতে এর মধ্যেই অনেক জায়গায় কিছু কিছু বুনো হরিণ আমরা দেখেছি। কিন্তু আর কোন কিছু নয়। সারেঙ-সাহেব সে রকম কিছু দেখেছেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর এতদিনের পাড়িতে একবার মাত্র বাঘের সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প বলেছিলেন। তাঁর বাঘ দেখার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। এই পথে একটা গাঙের বাঁক ঘুরতেই স্টীমার থেকে একটা বাঘকে তিনি সাঁতরে গাঙ পার হতে দেখেন। বাঘটাকে কিছুই করবার উপায় ছিল না সে তখন তীরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে। তবু সারেঙ সাহেব স্টীমারের মুখটা একটু ঘুরিয়ে সমানে ভোঁ দিতে শুরু করলেন। বাঘটা তারই মধ্যে ডাঙায় গিয়ে ওঠে। তারপর স্টীমারের ভোঁ-এর সঙ্গেই পাল্লা দেওয়া সে কি তার গর্জন!

সারেঙ সাহেব হাসতে হাসতে বাঘের এ নিষ্ফল আক্রোশের বর্ণনা দেবার মধ্যেই টেনদা হঠাৎ বলে ওঠেন, আরে ওটা কি দেখুন তো সারেঙ সাহেব? ওই বনের পাড়টায়, হরিণ-টরিণ তো মনে হচ্ছে না!

তাহলে বাঘই বোধহয়।—বলে হেসে উঠেও সারেঙ সাহেব তৎক্ষণাৎ চুপ করে যান।

আমাদের এ মজলিশে সারেঙ সাহেবের সেকেণ্ড মেটও ছিলেন। তিনিও হঠাৎ একাগ্র হয়ে দূরের জংলা তীরের দিকে চেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, হাঁ সাব, বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে।

বাঘের গল্প করতে করতে সুন্দরবনের জলপথে সত্যি-সত্যি বাঘের দেখা পাওয়ার মত অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্যিই তখন ঘটেছে। উপস্থিত আর সকলের চেয়ে আমার দৃষ্টি একটু ক্ষীণই ছিল। সেই ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়েই সুঁদরী আর গরান গাছের জঙ্গল যেখানে গাঙের কিনারে এসে পৌঁছেছে সেখানে একটি জলজ্যান্ত ডোরাকাটা কেঁদো বাঘকে রাজকীয় ভঙ্গিতে জলের ধার দিয়ে ঘুরে যেতে তখন আমিও দেখতে পেয়েছি। কি কারণে কে জানে জলের ধার পর্যন্ত এসে সে আবার তখন বনের ভেতরে চলে যাচ্ছে। গাঙের তীরটা শ' দেড়েক গজের বেশী দূর হবে না। সকালের আলোয় বাঘটাকে তাই বনের মধ্যে চলে না যাওয়া পর্যন্ত স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলাম। বনের

মধ্যে সত্যিকার রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে স্বাধীনভাবে ফিরতে দেখার কল্পনাতীত সৌভাগ্যে অভিভূতও যে হয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য।

সেবারের স্টীমার যাত্রায় মাতলার মোহনায় ঝড় আর তারপর স্বাধীন বাঘের বিচরণ দেখা, এই দুটোই অসামান্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু শুধু সেইজন্যেই নয়, আপাতঃ তুচ্ছ আরো কিছু ব্যাপারের জন্যে জলপথের সে পাড়ি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রথম ব্যাপারটার কথা লিখতে গেলে হাসি পায়, কারণ সেটা ক্ষিদে পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

হ্যাঁ, ক্ষিদে যে অমন প্রচণ্ড, অমন অদম্য হতে পারে আমার তখনকার সতেরো বছরের জীবনে আগে কখনো জানতে পারিনি। আর আমার না হয় সতেরো, টেনদার বয়স তো তখন প্রায় ত্রিশ ছুঁই ছুঁই করছে। অমন ক্ষিদের জ্বালা তিনিও আগে কখনো পাননি বলেই স্বীকার করেছিলেন।

স্টীমারে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা আমরা নিজেরাই করব বলে তৈরি হয়ে গেছলাম। আমাদের সঙ্গে স্টোভ ছিল, ইকমিক কুকার ছিল, ছিল ফ্রাই প্যান, আর চাল ডাল নুন তেল আলু পেঁয়াজ-লঙ্কা হলুদ ইত্যাদি তো ছিলই। এ-সব নিয়ে রান্নার ভার সামলাবার দায় অবশ্য টেনদাই নিয়েছিলেন। ক'টা দিনের তো ব্যাপার। চাল ডাল আলু পেঁয়াজের সঙ্গে ডিমও কয়েকটা নেওয়া হয়েছে, আর দরকার হলে স্টীমার যে সব জেটিতে বাঁধবে সেখানেও তরি-তরকারির সঙ্গে মাছ উচ্ছেও পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস পেয়েছেন টেনদা।

আমাদের সমস্ত অনুমান কল্পনা আর আয়োজনই যে অসম্পূর্ণ প্রথম দিনের পরই তা টের পেলাম করুণভাবে। স্টীমার ছাড়বার রাত্রে বাইরে থেকেই খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিলাম। সেদিন রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করতে হয় ভেবে। সে ব্যবস্থা করতে হল পরের দিন সকাল থেকে। সকালে স্টোভে চা তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে আসা বিস্কুট সহযোগে তা খেয়েছিলাম, গাঙের হাওয়া তখন সবে মাত্র লেগেছে। তাতেই বিস্কুটের টিনটায় দুবারের পর তিনবার হাত বাড়াবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কোন মতে সেটা দমন করে ছিলাম।

দুপুরের খাওয়ার সময় আত্মসম্বরণ করা কিন্তু অমন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে ভাবতে পারিনি। আমি তো মোটের ওপর স্বল্পাহারী, টেনদাও বড় খাইয়ে নন, সকালের চায়ের অভিজ্ঞতাটা স্মরণ করে তবু তিনি ইকমিক কুকারে একটু বেশী করেই চাল দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ডাল আর আলু পেঁয়াজের তরকারির ব্যবস্থাও করেছিলেন

বেশ দরাজ হাতে। বলেছিলেন যে ভাত তরকারি কিছু বাঁচলে রাত্রের জন্যে রেখে দেবেন।

খেতে বসবার পর কুকারের ভাত তরকারি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হওয়ার ধরন দেখে প্রথমে বিস্মিত তার পর একটু ভীতই হয়ে পড়লাম। বাঁচবে কি! ভাত তরকারির বাটিগুলো চেটে পুটে খেয়েও আশ মেটে না—এ রাক্ষুসে ক্ষিদে কোথা থেকে এল আমাদের মধ্যে!

দ্বিতীয় দিনই সেই ঝড়ের অভিজ্ঞতা। ঝড় আসবার পরে টেনদা কুকারে চালে ডালে চাপিয়ে একটু বেশী করেই খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ঝড়ের আলোড়নের দরুনই কি না কে জানে সে খিচুড়ির একটি দানাও আর অবশিষ্ট থাকেনি।

তৃতীয়দিন থেকেই সমস্যাটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। কুকারের বড় বাটিটার সঙ্গে আর একটা বাটিতে চাল দিয়ে ও সেই পরিমাণে তরকারি ও ডিম ভাজার ব্যবস্থা করেও কুকারের বাটি-টাটি সাফ করার পর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিস্কুটের টিনে যখন হাত ঢোকাতে হল তখন রাক্ষুসে ক্ষিদের রহস্যটা বুঝতে আর বাকি নেই। এ সবই জলা জংলার রাজ্যের নোনা হাওয়ার গুণ। এ হাওয়া অসাধ্য সাধন করে দিতে পারে। মুখে যার কিছু রোচে না তার পেটেও জ্বালিয়ে তুলতে পারে বিশ্বগ্রাসের আগুন।

এ ক্ষিদে সামলাবার মত রান্নার দায় নিতে টেনদাও আর চাইলেন না। খালাসী-দের এক রসুইকরকেই পয়সা কড়ি দিয়ে আমাদের খাওয়াবার ভার দেওয়া হল। প্রথম দিনের মেনু অতি সাধারণ, ভাত আলু ভাতে আর শুধু পেঁয়াজ বেগুনের একটা ঝোল। ঝোল নয়, অমৃত। তার স্বাদ এখনও পর্যন্ত মুখে লেগে আছে।

আজকের দিনে অনেকের মত দুনিয়ায় দেশী বিদেশী কিছু সেরা রান্না চাখবার বিরল সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। পেঁয়াজ লঙ্কা বাটা দিয়ে লম্বা ফালা ফালা করা সে বেগুনের ঝোলের কাছে সে সব রান্না দাঁড়াতেই পারে না।

পারবে কি করে! প্রথম যৌবনের ক্ষিদের সঙ্গে সুন্দরবনের গাঙের রাজ্যের নোনা হাওয়ার মাতলানি তারা পাবে কোথায়?

॥ আঠারো ॥

খালাসী রসুইকরের রান্নার হাতের যাদু আর তারই সঙ্গে বিচিত্র জল-পথে প্রায় গোটা বাংলাদেশটাই পশ্চিম থেকে পুবে পার হওয়ার বিস্ময়কর উত্তেজনা। বাকি ক'টা দিন তাইতেই খুব ভাল ভাবেই কেটে যাবার কথা।

কিন্তু ভাগ্যে অত সুখ নেই। দিন দুই তিন পরমানন্দে কাটবার পর সারেঙের কাছেই একটা খবর শুনে একটু অস্বস্তিই হল। খালাসীদের একজন নাকি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অসুখের লক্ষণগুলো শুনে অস্বস্তি হবারই কথা, কিন্তু স্টীমারের কাউকে বিশেষ বিচলিত হতে দেখলাম না। একটু অস্থির হয়ে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে 'ও কিছু নয়' বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই পেলাম।

আমাদের পরের স্টীমার ঘাঁটি ছিল চাঁদপুর। সেই চাঁদপুরে পৌঁছবার আগেই 'ও কিছু নয়' ব্যাপারটা কেমন একটু বেয়াড়া হয়ে উঠল। চাঁদপুরে খালাসীটিকে হাসপাতালে পাঠাতে হল আর সেখানে জেটিতে মাল খালাস আর নতুন বোঝাইয়ের জন্যে দু'দিন থাকার মধ্যেই খবর পাওয়া গেল যে খালাসীটি হাসপাতালেই কলেরায় মারা গেছে।

অবস্থাটা কি দাঁড়াল তা আর বোঝাবার দরকার নেই। খালাসীর মৃত্যুসংবাদটা চাঁদপুর থেকে স্টীমার ছাড়বার পরই পেয়েছিলাম। আগে পেলে এ স্টীমার ছেড়ে ঢাকা যাবার অন্য কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করা যেত কি না জানি না, কিন্তু তখন আর কোন কিছু করার উপায়ই নেই। ওই সাংঘাতিক রোগের ছোঁয়াচ-লাগা স্টীমারে অসহায়ভাবে এক রকম বন্দী হয়েই কাটাতে হবে যতদিন পরের ঘাঁটিতে না গিয়ে পৌঁছই।

অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে একটু বেশী অস্থির হওয়া আমার চিরকেলে স্বভাব-দোষ। এই ব্যাপার নিয়ে আমার ভয় ভাবনা উদ্বেগ টেনিদার অগোচর থাকে নি। কিন্তু তিনি উপদেশ বা কোন রকম অভয় দেবার চেষ্টাও করেননি। শুধু খালাসী রসুইকরের কাছ থেকে রান্নার ভারটা নিজেই নিয়েছিলেন আর ইকমিক কুকারের রান্নার সঙ্গে খাবার জলটাও ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপরে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে আমাদের নামবার কথা। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি। তার আগে মানিকগঞ্জই বোধহয় কিছু মাল বোঝাই আর খালাসের জন্যে স্টীমার থামাতেই তা থেকে মালপত্র নিয়ে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

এভাবে যাবার প্রস্তাবটা আমায় করতে হয়নি। আমায় সে লজ্জাটুকু থেকে বাঁচিয়ে টেনদাই নিজে উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করেছিলেন যেন নিজেরই গরজে। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা আর সেখান থেকে ঢাকার বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়িতে টেনদাদের বাড়ি।

জীবনের কত কিছুই তো স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। চাপা পড়ে যায় দিনের পর দিনের নতুন অভিজ্ঞতার স্তূপে। কিন্তু তখনকার ঢাকা শহরের সাধারণ একটি বাড়ির ঠিকানা মনের মধ্যে যেন গাঁথা হয়ে আছে।

এগারো নম্বর কাগজিটোলা, সূত্রাপুর। ক'টা দিনই বা সে ঠিকানার সঙ্গে যোগাযোগ। একই বছরে বারতিনেক ঢাকা যাওয়ার মধ্যে সবশুদ্ধ দিন পঁচিশ ত্রিশের বেশী নয়। কিন্তু তাইতেই এখনো চোখ বুজে চেষ্টা করলে সমস্ত বাড়িটা তার লোকজন সমেত মনের মধ্যে যেন কালকের দেখা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

এগারো নম্বর কাগজিটোলায় সে বাড়ি নিশ্চয় এখন নেই। কি পরিবর্তন যে সেখানে হয়েছে জানি না, জানবার ইচ্ছেও নেই। কারণ আমার ক'দিনের পরিচয়ের সে-বাড়ির স্মৃতিটুকু আমি মনের মধ্যে অক্ষয় করে রাখতে চাই।

বাড়িটা তা বলে আহা মরি কিছু নয়। সূত্রাপুরের কাগজিটোলা তখন একটা ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত পাড়া। বেশীর ভাগ বাড়িরই পুরনো জীর্ণ চেহারা। বাড়ির সামনের রাস্তাটা কোন রকমে গলি আখ্যা পাবার দুর্নামটা কাটাবার মত শুধু সংকীর্ণ নয় রাস্তাটা নোংরাও যথেষ্ট। তার দুধারেই খোলা নর্দমা।

রাস্তা থেকে খানিকটা খোলা জমি পার হবার পর পুরনো একতলা বাড়িটা ঠিক জরাজীর্ণ না হলেও সময়ের ছাপ পড়ে বেশ শ্রীহীন দীন চেহারার। বাইরের দেয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে অনেক জায়গাতেই শ্যাওলার ছোপ ধরেছে। দরজা জানালাগুলোয় রং পড়েনি বহুদিন। ভেতরে চুনকামেরও সময় পেরিয়ে গেছে অনেক দিন।

এই বাড়িরই ভেতরে ঢুকে সেই প্রথম দিনই কিন্তু মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ দুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে এগারো নম্বর কাগজিটোলার এইটি না হয়ে টেনদার বাড়ি যদি অন্য কোথাও হত তাহলে কলকাতার একটা শহর-

তলির সামিল তখনকার ঢাকা শহরের সঙ্গে আমার অমন গভীর একটা প্রাণের টান গড়ে উঠতেই পারত না। আমার জীবনের ধারাটাও একটু অন্য পথে বইত বলেই মনে হয়।

টেনদার পৈতৃক বাড়িতে প্রথম ঢুকেই যা দেখে অবাক আর মোহিত হয়েছিলাম, তা হল সেই বাইরের ঘরটির দু'দিকে সারি সারি অন্তত গুটি দশেক আলমারি। সস্তা কাঠের নেহাত সাধারণ আলমারি, কিন্তু সবগুলি বইয়ে একেবারে ঠাসা। আর বইও বিশেষ কোন একটি বিষয়ের নয়, হরেক রকম। এরপরে কয়েক দিনে টেনদার পরিবারের লোকের সঙ্গে সম্বন্ধটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবার পর ঘুরে দেখেছিলাম যে শুধু বাইরের ঘরটাতেই নয়, বাড়ির অন্য সব কামরাতেও এমনি সব বইয়ের আলমারির ছড়াছড়ি। ওই একটা পুরনো নেহাত সাধারণ একতলা বাড়ির সে সব আলমারিতে হেন বিষয় নেই যার ওপর একটা আধটা বই অন্তত না পাওয়া যেত বলে আমার ধারণা।

আমার সেই বয়সের মনে এই সব আলমারি ভরা বইয়ের রাশই একটা মোহ ধরিয়ে দিয়েছিল। এ যেন ভুলে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া একটা ঐশ্চর্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করা। এগারো নম্বর কাগজিটোলার বাড়িটা তাইতে অত ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল ঢাকা শহরটাই।

কাগজিটোলার বাড়ির আলমারির বইগুলো খুব বেশী দিন আমি ঘেঁটেছি বা পড়েছি তা নয়, তবে সে আলমারিগুলো আমিই প্রথম বোধহয় অনেকদিন বাদে স্বাতি হিসেবে খুলেছিলাম। যত্ন করে ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রাখলেও সে সব আলমারির বই সম্বন্ধে সে বাড়ির কারুর বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে পড়ে না।

এ সব আলমারি ভরা বই টেনদার বাবারই ছিল। জীবনে ধনী হবার সুযোগ তাঁর কিছু ছিল কিন্তু তা তিনি হয়নি। লেখাপড়াই ছিল তাঁর প্রধান নেশা। সারা জীবনের সেই বইপত্রের সঞ্চয়ই শুধু তিনি তাঁর পরিবারের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন।

টেনদার বাবার নাম ছিল রাধারমণ ঘোষ। এ নামটাই আমার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার, কারণ আমার দাদামশাইয়ের নামও ছিল তাই। বাড়ি ভর্তি আলমারির বইপত্তর দেখে টেনদার বাবার সম্বন্ধে বেশ একটু সম্ভ্রম বোধ করলেও তাঁর ঠিকমত পরিচয় তখন কিন্তু পাইনি। কাগজিটোলার বাড়িতে শুধু জেনে ছিলাম যে তিনি প্রথমে শিক্ষাজগতের মানুষ ছিলেন। তারপর কোন এক স্কুলের হেডমাস্টারী করার সময় ত্রিপুরার তখনকার মহারাজের আহ্বানে তাঁর প্রধান সচিব হয়ে অনেকদিন কাজ করেন। তাঁর সে প্রধান সচিব হওয়ার মূল্য ত্রিপুরার পক্ষে যে কি তার প্রকৃত বিশদ

পরিচয় পেলাম ঠিক তিপ্পান্ন বছর বাদে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ডাকে ১৯৭৪-এ মূল সভাপতি হয়ে আগরতলায় যেতে হয়েছিল। সেখানেই সে গৌরবময় ইতিহাস জানতে পারলাম।

বাংলা ভাষার প্রচার ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সাদর স্বীকৃতির ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিকা আমাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞভাবে স্মরণীয়। তখনকার ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের গভীর সৌহার্দ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটা মধুর ও মূল্যবান অধ্যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের মূলে যে তখনকার প্রধান সচিব রাধারমণ ঘোষের একটা বড় ভূমিকা ছিল আগরতলায় গিয়েই সে কথা জানতে পারলাম। রাধারমণ ঘোষেই ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। বাঙলায় ভাগবত পুরাণের অনুবাদের জন্যে রাজকোষ থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করার ব্যবস্থাও তাঁরই উদ্যোগে হয়।

ঘটনাচক্রে আমি যে এই মানুষের স্মৃতিজড়িত বাড়িতে গিয়েই উঠেছিলাম এ ব্যাপারের মধ্যেও নিয়তির হাত কিছু ছিল বলতে ইচ্ছে করে। ওই বাড়ি ভাল লাগার সঙ্গে ঢাকা শহরটাই আমার ভাল লেগে গেল। কলকাতা অনেক বড়, অনেক তার ঐশ্বর্য আড়ম্বর। কিন্তু তখনকার ঢাকা ছোট বলেই যেন অনেক বেশী অন্তরঙ্গ।

প্রথমবারে কিছুদিন থাকার পর কলকাতায় ফেরার মাস কয়েক বাদেই আবার ঢাকা যেতে হল টেনদা ও তাঁর আরো দুই ভাইয়ের একসঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে। সেবারে একসঙ্গে একটু বেশী দিনই সেখানে ছিলাম। তারপর মাসখানেক বাদেই একেবারে কায়েমী ভাবেই থাকবার ব্যবস্থা ক'রে সেখানে গেলাম।

কলকাতায় আর নয়, ঢাকাতেই এবার পড়ব। আর পড়ব অন্য কিছু নয়, ডাক্তারী। কলেজ নয়, ঢাকায় যা আছে তা কলকাতার তখনকার ক্যাম্বেলের মত মেডিকেল স্কুল। সেখান থেকে পাশ করলে এম. বি. নয়, এল. এম. এস. উপাধি মেলে। এম. বি.র চেয়ে তার মর্যাদা অনেক কম। তা হোক। এল. এম. এস.ই সই। উপাধির মর্যাদা দিয়ে তো নয়, আসলে চিকিৎসার কৃতিত্ব দিয়ে শেষ বিচার হয়। সুতরাং মেডিকেল স্কুল বলে নাক সিঁটকোবার কোন কিছু নেই।

নিজের মনকে ঢাকায় যাবার সপক্ষে এই সব যুক্তি দিয়েই তখন বুঝিয়ে ছিলাম। আসল আগ্রহ কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে পড়বার। মনের সঙ্গে এমন কিছু বোঝাপড়া তাই করতে হয়নি।

ঢাকায় মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়া কিন্তু আমার হল না। প্রথমে গিয়ে এগারো নম্বর কাগজিটোলাতেই উঠেছিলাম। সে বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তার চেয়েও অন্তরঙ্গ একটা সম্বন্ধ তখন আপনা থেকে গড়ে উঠেছে। টেনদা তখন কলকাতায়। তাঁর ভাইয়েরা কিন্তু সাহায্যের ত্রুটি করেননি। তাঁদের চেষ্টায় মেডিকেল স্কুলে যথাসময়ে যথোচিত দরখাস্ত দিতে পারলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নম্বরগুলো ভালোই ছিল। প্রবেশ প্রার্থীদের তালিকায় একেবারে ওপরের জন কয়েকের মধ্যেই নামটা জায়গা পেল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তখন সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছে। আমি কলকাতা থেকে পাশ করেছি বলে ঢাকার ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেবার জন্যে আমাকে অপেক্ষমানদের দলে ফেলা হল।

অপেক্ষা করবার ধৈর্য থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ভর্তি হতে পারতাম। কাগজিটোলার পরিচিত একজন ডাক্তার শিক্ষক সেই ভরসাই দিয়েছিলেন। কিন্তু কে অমন অনিশ্চিতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কলকাতা নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ছাপ দরকার। বেশ, তাই থাকবে। ঢাকার কলেজেই পড়ব। আর ডাক্তার হওয়াই যখন উদ্দেশ্য তখন আর্টস নয় সায়েন্স।

পড়বার জন্যে জগন্নাথ কলেজটাই পছন্দ হল। কিন্তু সেখানে ঢোকারও হাঙ্গামা একেবারে নেই এমন নয়। ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর আর্টস থেকে সায়েন্স বদল করা। কাগজিটোলার বাড়ি থেকেই কে একজন বললেন—জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সত্যেন ভদ্রের সঙ্গে দেখা করতে পারলে সব সমস্যা মিটে যেতে পারে। আমি তা পারব কি?

পারলাম। গেলাম এক ই, অঞ্চলটার নাম নয়াবাজারই বোধহয়। সেখানে পুরনো ধাঁচের একটি বেশ বড় বাড়ি। সেই বাড়ির বাইরের গেটের কাছে সত্যেন ভদ্র মশাইয়ের দেখা পেলাম। নেহাত ছোটখাটো রোগা পাতলা একরত্তি মানুষ, ব্যবহার অমায়িক এবং মধুর। কিন্তু তার ভেতর থেকেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বটা প্রথম থেকেই চোখে না পড়ে পারে না।

বেশী কিছু তাকে বলতে হল না। সামান্য দু-চার কথা শুনেই আমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করে দিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি তাঁর কলেজে ভর্তি হতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয় বদলের মাইগ্রেশন ফি টাও তিনি মাফ করে দিলেন।

জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলাম সেইদিনই। থ করবার জন্যে কাগজিটোলার বাড়ি থেকে লক্ষ্মীবাজারের অক্সফোর্ড মিশনে গিয়ে উঠলাম। মনে মনে তখন সঙ্কল্প কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় পড়তে আসাটা নেহাত খামখেয়ালী যে নয় ভাল করে তা প্রমাণ

করতেই হবে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছি এরপর ডাক্তারী পড়বই আর তখন এল. এম. এস. কেন এম. বি-ই বা কেন নয়!

সঙ্কল্পটা প্রথম দিকে খুব অটলই ছিল। মন দিয়ে পড়াশুনা করেছি। ক্লাসের প্রথম সারিতে অধ্যাপকদের কাছাকাছিই বসতাম। গল্প কবিতা লেখার বাতিক প্রায় কাটিয়ে উঠেছিলাম। কখনো-সখনো এক-আধটা কবিতা ছাড়া অন্য আর কিছু লেখবার চেষ্টাই করিনি। কবিতা লেখার একটি বাঁধানো খাতা কেমন করে হারিয়ে যাওয়ায় সদিকেও যেন ভাগ্যের ঘা খেয়ে নিরুৎসাহ হয়েছিলাম।

কলকাতার বাড়িটার একটা ছোট অংশ বাদে বাকি সবটাই তখন ভাড়া দেওয়া। সেই ভাড়ার টাকা তখনকার হিসেবে খুব কম নয়। আমার ঢাকার সবকিছু খরচ খরচা মিটিয়েও তাতে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকবার কথা। তা যে থাকত না সেটা আমার বেহিসাবী খরচার হাতের দরুন।

উদ্বৃত্ত না থাক অভাব কিছুর ছিল না। দিদিমা তখন কাশীর বাড়িতেই থাকেন। গ্রীষ্ম আর পূজার ছুটিতে কলকাতায় গেলে আমি গোবিন্দ ঘোষাল লেনের সেই মেসেই গিয়ে উঠি। টেনদার প্রশ্রয়ে জায়গার অভাব হয় না।

ঢাকার ছাত্রজীবনটা সব দিক দিয়ে সার্থকই হয়ে উঠতে পারত। অবস্থা ও পরিবেশ তারই অনুকূল ছিল প্রায় সব দিক দিয়েই। প্রিন্সিপ্যাল সত্যেন ভদ্রের তো বটেই, ভাগ্য গুণে কলেজের আরো কয়েকজন অধ্যাপকদের বিশেষ স্নেহভাজন হতে পেরেছি। নিজের ডাক্তারী জীবনের ভবিষ্যৎটা এক রকম ছকেই ফেলেছি মনে মনে। জগন্নাথ কলেজ থেকে পাশ করে মেডিকেল স্কুল নয় কোথাও কলেজে ঢোকবারই চেষ্টা করব। সেখান থেকে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে কলকাতা নয়, এ দিকেই কোথাও শুরু করব প্র্যাক্‌টিশ। তবে ঢাকায় নয়, নারায়ণগঞ্জে। কাগজি-টোলার বাড়ির সকলের সঙ্গে ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ থেকে গহনার নৌকোয় লাঙ্গলবন্ধের মেলা যেখানে হয় তারই কাছাকাছি বরেপাড়া গ্রামে গিয়ে কয়েকদিন কবে থেকেছি। যাওয়া আসার পথে ধলেশ্বরীর ধারে বড় ভাল লেগেছে নারায়ণগঞ্জ শহরটা। ডাক্তারী পেশার সঙ্গে সাহিত্যের নেশা মিশিয়ে থাকবার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা বলে মনে হয়েছে।

জীবনের ধারাটা এই পথেই হয়তো বইত। কিন্তু এরই মধ্যে একবার গরমের ছুটিতে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে এসে ওঠার পর সব বাঁধা ছক অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেস্তে যাবে তা কি তখন ভাবতে পেরেছি।

এমনিতেই টেনদার মেস শনি রবিবার খালি হয়ে যায়। নিকট মফস্বলের বাসিন্দা

বোর্ডাররা শনিবার মেস থেকে অফিস যাবার পর ফেরেন সেই সোমবার সন্ধ্যায় অফিসের চাকরি সেরে। শনিবারের অর্ধেক আর গোটা রবিবারটা তাঁরা নিজেদের গ্রামের বাড়িতেই কাটান।

কি একটা ছুটি এই শনি রবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেবারে প্রায় দিন চারেকের জন্যে মেসটা একেবারে খালি ছিল। এ ক'দিনের একটা কামরায় আমি পুরোপুরি একাই থাকি। আমার সেই নিঃসঙ্গতার সুযোগ নিয়ে ভাগ্য আমার জীবনের ধারাটা আবার পাল্টে দিলে।

॥ উনিশ ॥

সেই গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেস। আব তেমনি ছুটির ক'টা দিন।

একবার এমনি ছুটিব কয়েকটা দিনের ফাঁকা মেস বাড়িতে গভীর রাত্রে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম। এবাবেব ঘটনও গভীব বাত্রের, আব এমনি একটা ক'দিনের ছুটিব দরুন ফাঁকা মেসে। তবে ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের।

এবাবে ঢাকা থেকে গ্রীষ্মেব ছুটিতে এসে মেসের আগেব কামরাটা পাইনি। তার বদলে যে কামরাটা পেয়েছিলাম সেটাও খারাপ কিছু নয়। তেমনি দক্ষিণ-মুখো প্রশস্ত ঘর। দক্ষিণ দিকের দুটি জানলার প্রত্যেকটির মুখোমুখি দুটি তক্তপোষ পাতা। একটিতে একজন নির্বিরোধী আমাদের তখনকার দৃষ্টিতে একটু বযস্ক গোছের ভদ্রলোক থাকেন। দ্বিতীয় সীটটির বোর্ডার কিছুদিন আগে বদলীর চাকরিতে বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁর সীটটি আমি পেয়েছি।

এমনিতে সারাদিনই মেস বাড়িটা প্রায় খালি পাই। বোর্ডাররা বেশীর ভাগই কেরানী। তার মধ্যে দু-একজন মাত্র কাছাকাছি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দিনের বেলা নেহাত অসুখ বিসুখ না হলে কেউই তাঁরা মেসে থাকেন না। ছুটির ক'টা দিনে রাত্রেও মেস একেবারে খালি।

মেসের এমনি একটা নিঃসঙ্গ রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একটা ইংরেজী বই পড়ছিলাম মনে নেই। পড়ছিলাম ইলেকট্রিক আলোতেই।

এ মেস ছেড়ে আমার ঢাকা যাওয়ার মধ্যে এ বাড়ির এ উন্নতিটুকুও হয়েছে।

বইটা ভাল না লাগায় সেটা মুড়ে রেখে আলো নিভিয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে হঠাৎ জানলার মাথায় কুলুঙ্গিটার দিকে নজর পড়ল। দুটো জানালার মাথার কুলুঙ্গিতেই বোর্ডারদের নানান রকম খুচরো মালপত্র রাখা। আমার জানালার মাথার খোপটা আবার বেশ কয়েকটা ভারী ভারী কাগজের বাণ্ডিলে ঠাসা। পুরনো ঝুল পড়া বিবর্ণ হয়ে আসা ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের বাণ্ডিল। তার মধ্যে একটা বাণ্ডিল কেমন করে যেন আলগা হয়ে তাক থেকে একটু ঝুলে এসে পড়ো পড়ো হয়েছে।

এই সামান্য ব্যাপারটা এত খুঁটিয়ে বর্ণনা করাটা নেহাত অকারণ নয়। আপাত তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনায় জীবনের মোড়ই যে একেবারে ঘুরে যেতে

পারে, জানালার খোপ থেকে পড়ো পড়ো একটা পুরনো কাগজের বাণ্ডিল ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে যাওয়ার স্বাভাবিক চেষ্টাই তার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাগজের বাণ্ডিলটা ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে না দিলে হয়তো রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমার মাথাতেই পড়তে পারে সেটা তাই একটু সরিয়ে দিতে গেলাম। তাতে বেশ কিছু দিনের জমা যে ধুলো উড়ল রাত্রে চোখে দেখতে না পেলেও নাকে তার গন্ধ পেলাম। আর দেখতে পেলাম একটি পোস্টকার্ড। ঠেলে দেওয়া আলগা কাগজের বাণ্ডিল থেকে সেটা তখন পাক খেয়ে নিচের মেঝেতে পড়ছে।

বাণ্ডিলটা ঠেলে দিয়ে মেঝে থেকে পোস্টকার্ডটা কুড়িয়ে নিলাম। কিন্তু জানালার মাথার বাণ্ডিলে সেটি গুঁজে দেওয়া আর হল না। সেটি হাতেই রইল, আর অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়া যে অন্যায় সে নীতিবাক্য কিছুক্ষণের মত অনায়াসে ভুলে গিয়ে চিঠিটা পড়েই ফেললাম আদ্যোপান্ত।

অদম্য কিছু অবশ্য নয়, কিন্তু ওই পুরনো ধুলো মাখা পোস্টকার্ডটা পড়বার মৃদু যে কৌতূহলটুকু হয়েছিল তার কারণ বোধহয় সে চিঠির হাতের লেখা। আঁকা বাঁকা বড় বড় অক্ষরের বাহার আর বানান ভুলের ঘটা দেখে তখনকার দিনে সেটি যে মেয়েলী হাতের লেখা তা বোঝা যায়।

চিঠির ভাষা এতদিন বাদে অবশ্য মনে পড়ে না কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে, চিঠির সম্বোধন আর তার বক্তব্য থেকে সেটি কোন নববিবাহিতা গ্রাম্য বধূর স্বামীর কাছে লেখা বলে অনায়াসে বুঝেছিলাম।

পোস্টকার্ডে লেখা বলেই কি না জানি না, চিঠিতে প্রণয় সম্ভাষণ কিছু ছিল না। যা ছিল তা আগের হপ্তায় স্বামীর গ্রামের বাড়িতে না আসার জন্যে অনুযোগ, সামান্য কিছু সাংসারিক খবর আর দু-একটি নিতান্ত সাধারণ ফরমাস।

হাতের লেখা আর চিঠির ভাষা একটু কৌতুকই মনে জাগিয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে একটু মাধুর্যের মাদকতা আমার সে রাত্রের ঘুমটাই দিয়েছিল ঘুচিয়ে।

শ্বশুর বাড়িতে নতুন সংসার করতে আসা বড় জোর দ্বিতীয় ভাগ পড়া গ্রামের সেই স্নিগ্ধ সলজ্জ বধূটিকে আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে রাখতে হবে সেটা উনিশশো বাইশ সাল। আমি যে মেয়েটিকে কল্পনায় দেখেছিলাম তার মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন, চলনে বলনে সব কিছুতে একটা স্নিগ্ধ মধুর লজ্জার জড়িমা।

চিঠিটিতে তারিখ-টারিখ কিছু দেওয়া ছিল না। কবে কতদিন আগে সেটি লেখা তা বোঝবার উপায়ও নেই। তবে এ ঘরে যাঁর সীট তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি দখল করেছি এ চিঠির সঙ্গে তাঁর যে কোন সম্পর্ক নেই তা পিছনের নাম ঠিকানা দেখেই

বোঝা গেছিল। নাম ঠিকানা মেয়লী কাঁচা হাতের নয়, সম্ভবত যাঁর উদ্দেশ্যে চিঠিটি লেখা তাঁর নিজেরই হস্তাক্ষর। ঠিকানা লেখা অমন খাম পোস্টকার্ড বাড়ির অল্পশিক্ষিত মেয়েদের সুবিধের জন্যে লিখে রেখে আসা তখনকার দস্তুর ছিল।

আমার দখল করা সীটের আগেকার বোর্ডার আমার অচেনা ছিলেন না। পোস্টকার্ডের নাম তাঁর তো নয়ই তা ছাড়া তিনি রীতিমত বয়স্ক, প্রায় প্রৌঢ় বললেই হয়। ও রকম চিঠি পাবার দিন তাঁর অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। চিঠিটি সুতরাং আমার সম্পূর্ণ অজানা কাউকে লেখা। কে জানে কেমন করে পোস্টকার্ডটা এই পুরনো কাগজপত্রের বাণ্ডিলের মধ্যে থেকে গেছে।

চিঠিটি কার তা জানতে না পারলেও সে চিঠির একটা মুগ্ধ আচ্ছন্নতার ঘোর সে রাত্রে আমি আর কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

অনেক রাত পর্যন্ত আপনা থেকেই জেগে কাটিয়েছি, তারপর কি রকম যেন একটা অস্থিরতায় কাগজ কলম নিয়ে এক সময়ে হঠাৎ লিখতে বসে গেছি।

যা লিখেছি তার সঙ্গে ও চিঠির সম্পর্ক মাত্র এইটুকু যে আমার সে রাত্রের লেখা গল্পের পাত্র পাত্রী নতুন বিয়ে হওয়া একটি ছেলে আর মেয়ে। একদিকে তারা বিশেষ আবার অন্য দিক দিয়ে এত সাধারণ যে তাদের নিজস্ব নাম পর্যন্ত গল্পে নেই। তারা শুধু ছেলেটি আর মেয়েটি। আর গল্পের নাম হল শুধু কেরাণী'।

সঠিক হোক আর বেঠিক হোক অলস ও দীর্ঘসূত্রী বলে একটা সুনাম আমি অর্জন করেছি। সেদিন কিন্তু কাজের ভূত আমার ওপর ভর করেছিল।

গল্প কবিতা লেখা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। অন্তত চল্লিশ বছর বয়সের আগে কোন কিছু প্রকাশ করবার চেষ্টা করব না বলে একটা পণ থাকা সত্বেও বছর চোদ্দ বয়স থেকে সমানে গল্প কবিতা লিখে আমি অনেক খাতা ইতিমধ্যে ভরিয়ে তুলেছি। ঢাকায় যাবার পর এ উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়লেও লেখা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সে-রাত্রে কিন্তু আমার পক্ষে অসাধ্য সাধনই কেমন করে সম্ভব হয়ে গেল। শুধু একটি নয়, প্রথম গল্পটির পর আরেকটি গল্পও সম্পূর্ণ লিখে ফেললাম।

দ্বিতীয় গল্পটি যখন শেষ হল তখন ভোর হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ছে তারপর আর ঘুমোইনি। আর সমস্ত রাত জেগে দু-দুটো গল্প লেখার উত্তেজনাতেই যা করে বসেছি কোনদিন তা কল্পনাতেও ছিল না।

তখন আমাদের পাড়ার ভবানীপুর পোস্ট অফিস ছিল হরিশ পার্কের উল্টো দিকে, রাস্তার পশ্চিম পারে। পোস্টাফিস খোলবার পরই বড় খাম জোগাড় করে ডাকটিকিট লাগিয়ে তার মধ্যে গল্প দুটি ভরে ঠিকানা লিখে চোখ বুজে ডাক বাক্সে ফেলে দিয়েছি।

নিজের ঠিকানা যা দিয়েছিলাম তা গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসের নয়, নিজের বাড়ির, আর পাঠ'বার ঠিকানা ছিল 'প্রবাসী' অফিসের।

হ্যাঁ, অন্য কোথাও নয়, তখনকার সব কাগজের যা সেরা সেই 'প্রবাসী'তেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। হেঁজিপেঁজি যার তার কাছ থেকে নয়, লেখা ফেরত পাবার লজ্জাটা যেন সেই কাগজ থেকেই পাই এক শরৎচন্দ্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সব পয়লা নম্বরের লেখকের লেখা যে কাগজে বার হয়। সে কাগজে একটা লেখা ছাপা হওয়া মানেই তখনকার দিনে গায়ে কৌলিন্যের ছাপ পড়ে যাওয়া।

ডাকটিকিট দেওয়া আছে যখন তখন লেখাটা ফেরত যে আসবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই আর মাথাই ঘামাইনি। যথা সময়ে ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলাম আর কোন এক রাত জাগা সকালের খামখেয়ালী আহাম্মকির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম।

মাস তিনেক বাদে আমার সেই বীরু মামার একটা অদ্ভুত চিঠি পেয়ে সত্যিই তাই বেশ একটু বিমূঢ়ই হলাম।

শুধু বিমূঢ় নয় সেই সঙ্গে দ্বিধা সংশয় নিয়েও অস্ফুট ভাবে একটু বুঝি উৎসুক। বীরুমামা নানান্ আজে বাজে খবরের সঙ্গে লিখেছে, তোর 'প্রবাসীটা এলে আমি দু-দিন রেখে পড়ে নিয়ে তারপর পাঠিয়ে দেব।"

এ আবার কি অদ্ভুত আজগুবি কথা!

আমার প্রবাসী এলে দু-দিন রেখে পড়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে এ কথার মানে কি? আমার নামে প্রবাসী হঠাৎ আসতে যাবে কেন? আমি তো প্রবাসীর গ্রাহক ট্রাহক কিছু নেই।

তাহলে? তাহলে যা মানে হতে পারে তা বিশ্বাস করা দূরে থাক ভাবতেও তখন ভরসা হচ্ছে না।

বীরুমামাকে তাই যথাসাধ্য অন্য আজে বাজে কথার মধ্যে তুচ্ছতার সুর লাগিয়ে লিখলাম, আমার প্রবাসী আসবার কথাটা আবার কি! আমার আবার প্রবাসী আসবে কোথা থেকে!

বীরুমামার চিঠি তারপর এল। তাতে সংক্ষিপ্ত উত্তেজনাহীন একটা উক্তি,—ও তোকে বুঝি আগে লিখিনি। তোর নামে প্রবাসী থেকে একটা ছাপা পোস্টকার্ড এসেছিল। তাতে তোর কি না কি দুটো গল্প মনোনীত হয়েছে জানিয়েছিল। সময় মত সে লেখা ছাপাবেও লিখেছিল।

সময় মত প্রবাসী আমার গল্প ছাপবে! সে সময়টা হবে কবে! কাউকে কিছু

বলবার নয়। আর বলবই বা কাকে। আমার যে একটু-আধটু কলম ঘষার বাতিক আছে আমার ঢাকার বন্ধুদের কেউ তখনো জানেই না।

আমাদের অক্সফোর্ড মিশনের ওপরের রীডিং রুমে অন্যান্য কাগজের মধ্যে প্রতি মাসের গোড়ার দিকে প্রবাসী এলেই রীতিমত বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে সমস্ত কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখি। কই, কোথায় আমার গল্প? মাসের পর মাস যায়—আমার লেখার কোন নামগন্ধই সেখানে নেই।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বীরুমামা খবরটা আমায় ভুল দিয়েছে কি না! প্রবাসীর, চিঠি পাওয়ার কথা সে যে লিখেছে তা অবশ্য ভুল নয়। চিঠি একটা সেখান থেকে না পেলে সে ও রকম কথা লিখবে কোথা থেকে।

কিন্তু চিঠির ভাষায় সে ভুল বুঝেছে কিনা কে জানে। চিঠিতে গল্প ছুটির কথা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে যা লেখা ছিল তা মনোনীত তো না-ও হতে পারে। মনোনীতর আগে একটা অ ছিল কি না তার ঠিক কি। বীরুমামার পক্ষে অমন একটা হেলা-ফেলার ভুল করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রবাসীতে লেখা পাঠাবার সময় বাড়ির ঠিকানাটা কেন যে দিয়েছিলাম তাই নিযেই তখন আফশোস হচ্ছে। কলকাতার বাড়ির বদলে ঢাকার অক্সফোর্ড মিশনের ঠিকানাটাও তো দিতে পারতাম। লেখা ফেরত আসার লজ্জাটা হোস্টেলের সহপাঠীদের সামনে পেতে চাই না বলেই অবশ্য বাড়ির ঠিকানাটাই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে এই সংশয় উদ্বেগের যন্ত্রণা পেতে হবে তখন কি জানতাম।

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়ির ভেতরের অংশটা তখন ভাড়া দেওয়া। দিদিমা তখন কাশীর বাড়িতে থাকেন আর কলকাতার বাড়ি ভাড়ার সবটাই আমার কাছে ঢাকায় যায় আমার খরচের জন্যে। বাড়িটা ভাড়া দিলেও দিদিমার ইচ্ছামত আসা যাওয়ার জন্যে, বাড়িটার বাইরের অংশের দুটি ঘর তখন আমাদের নিজেদের জন্যে খালি রাখা ছিল। আমি নিজে কলকাতায় গেলে তখন গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসেই গিয়ে উঠতাম। আর দিদিমাও তখন কলকাতায় আসতেন না বললেই হয়। আমরা কেউ গিয়ে থাকি না থাকি বীরুমামা দরকার হলেই সেখানে এসে আস্তানা পাতে। তার সেই রকম এক খেয়ালী শুভাগমনের দরুনই আমার এই উদ্বেগের দুর্ভোগ। প্রবাসীর পাঠানো চিঠিটাও যদি তার কাছ থেকে পেতাম। কিন্তু বেশ একটু চাপ দিয়ে চিঠি লিখেও কোন ফল হয়নি।

সে অম্লানবদনে আমায় বরং একটু ভৎর্সনাই করেছিল, প্রবাসীটাই তো পাবি। সে চিঠির আবার কি দরকার? আমি কি সে চিঠি তুলে রেখেছি নাকি!

এরপর নীরব আশা আর উদ্বেগ নিয়ে প্রতি মাসের প্রবাসীর জন্যে অপেক্ষা করা আর তা হাতে পড়লে আদ্যোপান্ত উল্টে পাল্টে হতাশ হয়ে চলে আসা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

প্রতি মাসে অত অস্থির ঔৎসুক্য নিয়ে প্রবাসীর জন্যে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও বুক কাঁপিয়ে তোলা খবরটা প্রথম অন্যের মুখ থেকেই পেলাম।

পেলাম আমার সহপাঠী ও অক্সফোর্ড মিশনেরই বোর্ডার বিজয় বোসের কাছে। রাত্রে একসঙ্গে একদল আমরা ডাইনিং হলের মেঝেতে খেতে বসেছি। বিজয় বসেছে আমার উল্টো দিকের সারিতে আমার মুখোমুখি। হঠাৎ পরিহাসের স্বরে সে আমায় বললে, তোমার যে একটা গল্প বেরিয়েছে এবারকার প্রবাসীতে।

আমার গল্প! এবারকার প্রবাসীতে! এ দুটো কথা স্পষ্ট মুখ থেকে বোধহয় উচ্চারিত হয়নি। আমার মুখের চেহারাটাও কেউ লক্ষ্য করেনি বোধহয়। বিজয় নিজে থেকেই তারপর হেসে উঠে বলেছিল না না, তোমার নয়, এ মাসের যে প্রবাসীটি আজ বিকেলে এসেছে, কাল সকালে রীডিং রুমে দেখো। একটা গল্পের লেখকের নাম হুবহু তোমার যা তাই।

॥ কুড়ি ॥

প্রবাসীতে সত্যিই আমার একটা গল্প ছাপা হয়েছে শুনে সে রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলাম কি ! উদ্বেগে উত্তেজনায় না পারবারই কথা। কিন্তু উত্তেজনা থাকলেও উদ্বেগ কিছু ছিল না বলে বেশ একটু পবিতৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম মনে আছে। উদ্বেগ থাকবেই বা কেন ?

প্রবাসীতে আমার নাম দেওযা লেখকের গল্প বার হবার কথাটা আপনা থেকে কাকুর পক্ষে আমায় পরিহাস কবার জন্যে বানিয়ে বলা তো সম্ভব নয়। আব সম্ভব হলেও কথাটা যে শুনিযেছে সেই বিজয় বোসেব মুখ দিয়ে অন্তত অমন মিথ্যে ঠাট্টা কখনও বার হবে না। বিজয় বোসের পবিচয়টা পবে যথাস্থানে দেওয়া যাবে। আপাতত গল্প বাব হওয়াব প্রসঙ্গটাই চালাই।

পরের দিন সকালে দোতলার বিডিং রুম খোলাব পবেই অবশ্য সেখানে গিয়ে ঢুকেছিলাম। সেটা অবশ্য নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধাবণত প্রতিদিনই ওই রকম সময়ে রীডিংরুমে গিযে বসা আমাব অভ্যাসই হয়ে গিযেছিল। কাগজপত্র খুব বেশী যে সেখানে পেতাম তা নয়। তবে আমাব লোভ ছিল প্রবাসী-ভাবতবর্ষ মাসিক আব **Illustrated London News** বলে সাপ্তাহিকটির ওপব। সে পত্রিকারও **Our note book** বলে অভিনব সম্পাদকীয লেখার পাতাটিই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। জি. কে. চেস্টারটন নামটা সেই আমি প্রথম আবিষ্কার করি বলা যায। তিনিই তখন ছিলেন কাগজটিব সম্পাদক আর প্রতি সংখ্যায় ওই 'আওযার নোট বুক'-টি ছিল তার সাংবাদিকতাব একটি নমুনা।

ছেলেবেলা থেকে ভালমন্দ যা পাই নির্বিচাবে পড়া আমাব একটা রোগ হওয়ার দরুন চেস্টারটনের দু-একটা বই আগেও আমার উদরস্থ হয়েছে। তাব একটি ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাস আর অন্যটি চার্লস ডিকেন্স সম্বন্ধে একটি সমালোচনা গ্রন্থ। তাই নতুন ধরনের লাগলেও চেস্টাবটনের লেখাব আসল ধাতু তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারিনি। ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজের আওয়ার নোট বুক-এ চেস্টারটনকে স্বমহিমায় চিনতে পারাব পর আগেব সেই প্রায় ভুলে যাওয়া নাম আবার নতুন করে স্মরণ করেছি।

মিশন হোস্টেলের রিডিং রুমে গিয়ে প্রথমেই লণ্ডন নিউজটা দখল করাই ছিল আমার দস্তুর। অন্য বোর্ডার বন্ধুদের কাছে তাতে বাধাও পাইনি কখনো।

সেদিন কিন্তু সেই পুরনো দস্তুর বজায় রাখা বেশ একটু কঠিন হয়েছে। কাউকে কিছু বুঝতে দিতে চাই না, তাই প্রথম গিয়ে লণ্ডন নিউজ নিয়েই বসেছি। কিন্তু চেস্টারটনের কলমের যাদুও সেদিন বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি।

ভাসা ভাসা ভাবে লেখাটায় চোখ বুলিয়েই প্রবাসীটার দিকে হাত বাড়িয়েছি। ভাগ্য ভাল যে সে কাগজের দাবিদার আর কেউ তখনো রিডিং রুমে এসে পৌছয়নি। কাগজটা তাই নির্বিঘ্নে দেখবার সুযোগ পেলেও কোন রকমে ধরা পড়বার ভয়ে নিজের লেখাটা ও ছাপার অক্ষরে নাম একটু দেখেই পাতা উল্টে অন্য লেখায় মনোযোগ দেওয়ার ভান করেছি। এইটুকু শুধু দেখে নিয়েছি যে পাঠানো দুটি গল্পের মধ্যে 'শুধু কেরাণী' গল্পটাই সেখানে প্রকাশিত হয়েছে আর আমার নামটা ঠিকমত ছাপাতে এবার কোন ভুল হয়নি।

এবার কথাটা নেহাত কলম ফস্কে লিখে ফেলিনি। ছাপার অক্ষরে আমার একটি লেখা এর আগে সত্যিই বার হয়েছিল। আর বার হয়েছিল ওই প্রবাসী পত্রিকাতেই। লেখক হিসেবে আমার নামটা শুধু সেখানে ভুল ছাপা হয়েছিল। মিত্র-র বদলে পদবীটা ছাপার অক্ষরে হয়েছিল 'মিশ্র'। লেখার ভেতরকার অন্য একটি ছাপার ভুলের সঙ্গে আমার নামের পরিবর্তনটুকুর সংশোধন চেয়ে যে চিঠি লিখেছিলাম প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগ তা অগ্রাহ্য করেনি। পরের সংখ্যায় আমার সঠিক নামের সঙ্গে সংশোধনটুকু ছাপা হয়েছিল। ছাপার অক্ষরে নাম দেখাটা তাই আমার কাছে একেবারে নতুন কিছু নয়।

নতুন না হোক আগের সঙ্গে এবারের ব্যাপারটার কোন তুলনাই হয় না। আগের বারে ছাপা হয়েছিল ছোট একটি প্রবন্ধ গোছের রচনা। প্রবন্ধের বদলে সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক পরিচিতিই বলা উচিত। স্পেনের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক 'জাসিন্তো বেনাভান্তে'-কে নিয়ে লেখা।

লিখেছিলাম আমার সেই স্কটিশ চার্চ কলেজ পালানো দিনগুলির মধ্যে। কলেজ পালিয়ে তখন শুধু চিড়িয়াখানাতেই দিন কাটাতাম না, সেই সঙ্গে আরেকটি নেশা ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে এসে হরেকরকম বই কাগজ ঘাঁটা আর পড়া। পড়ার চেয়ে ঘাটাই অবশ্য বেশী হত। আর সেই রকম ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোন একটি বিদেশী পত্রিকায় সে বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাসিন্তো বেনাভান্তে সম্বন্ধে একটি লেখা পেয়ে যাই।

এখনকার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীরই তখন নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটা ছিল চৌরঙ্গী রোডের ওপর। জাসিন্তো বেনাভান্তে সম্বন্ধে লেখাটি সেখানে বসে পড়তে পড়তে কি খেয়ালে তার একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ সেখানে বসেই সেদিন লিখে ফেলি। তারপর লেখাটা ওইখানেই এক পোস্টাপিস থেকে খাম কিনে ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

জাসিন্তো বেনাভান্তে সম্বন্ধে লেখাটা পাঠাবার পরই ছাপা হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সত্যি সত্যি একটা গল্প ছাপা হওয়ার উল্লাস-উত্তেজনার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়?

আনন্দ-উত্তেজনা যতই হোক তা কিন্তু গোপন রাখতে হবে এ সঙ্কল্প তখনই করে ফেলেছি। এ রকম একটা আত্মগোপনের পিছনে শুধু লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ই ছিল তা কিন্তু বলতে পারছি না, হয়তো সেই সঙ্গে ধরা না দিয়ে অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার অন্য এক রকম বাহাদুরীর লোভও ছিল।

ধরা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সত্যিই দিইনি। সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রবাসী পত্রিকা পড়ে নামের মিলটা লক্ষ্য করে তা নিয়ে মন্তব্যও করেছে। আমি যেন তাদের মতই ব্যাপারটা নেহাত মজার বলে ঠাট্টা তামাশা করে উড়িয়ে দিয়েছি।

এ চালাকী কিন্তু বেশী দিন চলেনি। কয়েকজনের কাছে একেবারেই নয়। সে কয়েকজনই হল ঢাকার কলেজ জীবনে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোন এক প্রচ্ছন্ন চৌম্বক ধর্মের টানে ঠিক ওই ক'জনের সঙ্গেই আমি কখন যে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছি আমি নিজেও তা বুঝতে পারিনি।

আমাদের সনাতনী ধারণায় বদ্ ছেলে যাকে বলে তারা তা কেউই নয়, চেহারা চরিত্রেও তারা আলাদা। মিল তাদের মধ্যে যেটুকু তা শুধু এই যে তারা প্রত্যেকেই ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় সেই বাঁধা ছকের একটু বাইরে।

আমাদের এই দলটির মধ্যে পাঁচজন আমরা ছিলাম প্রায় অবিচ্ছেদ্য নিত্যসঙ্গী। আমি বাদে আরো চারজন ছিল—অনিল ভট্টাচার্য, সুধীর ঘটক, ক্ষিতীন্দ্র সাহা আর ... গুহঠাকুরতা। ও রকম নিত্যসঙ্গী না হলেও দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল আরো কয়েকজনের। তাদের মধ্যে হিমাংশু সোম, প্রতাপ রায় আর সোমেন ঘোষের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে।

এদের কথা মনে হলে গ্যাণ্ডেরিয়া, সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, আর্মানিটোলা উয়ারী, টিকাটুলি ইত্যাদি পাড়া সমেত বুড়িগঙ্গার ঘাট আর রমনার মাঠ নিয়ে আমার সেই সেদিনকার ঢাকা তার এক নিজস্ব রহস্যমায়া ছড়িয়ে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এক

দিক দিয়ে কিছুটা কলকাতার ছেলে হয়েও শহর হিসেবে প্রথম এই ঢাকাকেই ভালবেসেছিলাম। আমার সেই বয়সের মনের কাছে বিশাল বিচিত্র জটিল কলকাতা যেন ঠিক ভালবাসার মাপের ছিল না। ঢাকা-ই সেদিক দিয়ে ছিল আপনার করে নেবার মত সুষম সীমার। সে ঢাকার কোন কিছুই যেন খুব দূরের নয়। সমস্ত শহরটাকে তার সমস্ত জীবন-স্পন্দন সমেত যেন একত্রে পাওয়া যায়। কাছেরই এক পাড়ায় হয়তো সোহং স্বামী আর মল্লশ্রেষ্ঠ পার্শ্বনাথের স্মৃতি তখনও ম্লান হয়ে যায়নি। আরেক রাস্তার সাঁকোতে পুলিন দাসের একা লাঠি ধরে দুর্বৃত্ত বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার বীরত্ব তখনই এক আশ্চর্য কিংবদন্তী। মন চাইলে ভগবান সেতারীর বাজনা শুনে আসতে পারো যেমন, তেমনি যেতে পারো হরেক নাম করা হালুইকরের দোকানে পরোটা থেকে ঢাকাই মিষ্টান্নের সেরা নমুনা চাখতে। কলকাতার খেলার মাঠ যারা পরে মাৎ করবে নামী সাহেবের মত সেই সব উঠতি খেলোয়াড়ের উদয় পর্ব দেখবার সুযোগও আমাদের মত উৎসাহীদের তখন ছিল।

তখন এই ঢাকা শহরে আমাদের বন্ধুদের রঙও ছিল যেন আলাদা। অন্তত আমার মনে তখনকার দিনের স্মৃতি সেই ছাপই রেখে গেছে।

এই বন্ধু কয়েকজনের মধ্যে অনিল ভট্টাচার্য প্রথম ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল বলে মনে আছে। সন্দেহ-টন্দেহ নয় তার, একেবারে সোজাসুজি আক্রমণ। প্রবাসীতে গল্প বেরিয়েছে তবে সে কথা জানাইনি কেন এই তার অভিযোগ।

প্রবাসীতে গল্প!—বলে যেন আকাশ থেকে পড়ার ভান করে কথাটা অস্বীকার করার চেষ্টায় কোন ফল হয়নি। ঢাকাই ইডিয়মে একটা গাল দিয়ে ব্যাপারটা চালিয়াতি বলেই ধরে সে বেশ এক হাত আমায় নিয়েছিল।

এরপর বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যাই। 'শুধু কেরাণী'র পর আমার পাঠানো দ্বিতীয় গল্প 'গোপনচারিণী'ও পরের মাসে তখন প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় গল্প প্রবাসীর যে সংখ্যায় বেরিয়েছিল ঢাকায় সেটা আমি দেখে আসিনি। কলকাতায় আসবার পর স্কুলের বন্ধু অচিন্ত্যই সে সংখ্যাটা এনে দেখিয়েছিল আর তার সঙ্গে এমন কিছু খবর দিয়েছিল যা আমার কাছে তখন অবিশ্বাস্য ও আশাতীত।

আমার গল্প দুটি বার হবার পর 'কল্লোল' বলে একটি কাগজে পর পর দু'মাসে দুটি গল্পেরই নাকি রীতিমত প্রশংসা ভরা আলোচনা বেরিয়েছে।

কল্লোল কাগজটির তখন নাম শুনলেও ঢাকা থেকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। অচিন্ত্যর কাছে কাগজটির বিস্তারিত খবর পেলাম। সে কিছুদিন আগে থেকে কল্লোলের অফিসে যাওয়া আসা করে তাদের দলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

অচিন্ত্যর কাছে কল্লোল সম্বন্ধে যা জানলাম তা বেশ কৌতূহল আর উৎসাহ জাগাবার মতো। কল্লোলের সম্পাদনা করেন দীনেশ দাশ আর গোকুল নাগ। ঠিক আমাদের বয়সী না হলেও তাঁরা মনে প্রাণে তরুণ আর নবীনদেরই প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল দিয়ে তাঁরা নতুন যৌবনের জোয়ার আনতে চান। মাত্র দু' বছর পত্রিকাটি বার হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নাম করা নতুন লেখক অনেককেই এই পত্রিকা আপনার করে পেয়েছে। শুধু নতুনদের সমর্থন নয়, পূজনীয় প্রবীণদের স্নেহদৃষ্টি থেকেও কল্লোল বঞ্চিত হয়নি।

ছাপার অক্ষরে প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ হেন কাগজের স্বতঃস্ফূর্ত তারিফ পাওয়া সৌভাগ্য সন্দেহ নেই। অচিন্ত্য কল্লোল কাগজের অফিসের অন্তরঙ্গ আড্ডার যে বর্ণনা দিলে তাও লোভনীয়। এরপর কল্লোল অফিসে একদিন দেখা করতে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অচিন্ত্যের পেড়াপীড়িতেও কি এক সঙ্কোচে কিছুতেই কল্লোল অফিসে একদিন নিজে থেকে যাবার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না।

কল্লোলের সঙ্গে যোগাযোগ তখন না হলে জীবনটা ঠিক কোন রাস্তায় চলত বলতে পারি না। বড়দিনের ছুটির পর ঢাকায় ফিরে যেতাম যথাসময়েই আর প্রবাসীতে ছাপা গল্প কল্লোল-এর মত একটি কাগজের প্রকাশ্য প্রশংসা পেয়েছে বলে মনে মনে যতই খুশি হই সাহস করে আবার প্রবাসীতে গল্প পাঠাতে পারতাম কি না সন্দেহ। পাঠালেও তা যে মনোনীত হয়ে ছাপা হত তারই বা ঠিক কি? আমার সাহিত্য-চর্চা সুতরাং পেশার বদলে অবসরের বিলাস মাত্রই হয়তো হয়ে থাকত। কিন্তু আমার নিয়তি তখন অলক্ষ্যে আবার আমার জীবনের ঘুটি নতুন করে চালবে বলে ঠিক করেছে।

'কল্লোল' অফিসে নিজে থেকে না গেলেও বড়দিনের ছুটির মধ্যে একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আশাতীত যোগাযোগ ঘটে গেল।

শীতের সকাল। বেলা দশটা আন্দাজ হবে। অচিন্ত্যের সঙ্গে বাড়ির কাছের হরিশ মুখার্জী রোড ধরে হরিশ পার্কের ধার দিয়ে গল্প করতে করতে উত্তরমুখো যাচ্ছিলাম। স্কুল থেকেই সাহিত্য-চর্চার ব্যাপারে অচিন্ত্য সেনগুপ্তই ছিল আমার প্রধান সহচর। আর কেউ না পড়ুক নিজেরা দুজনেই পরস্পরের লেখা পড়েছি। আমার তখনকার সেই অস্থির জীবনের মধ্যে দুজনে মিলে একটা উপন্যাসও লিখে ফেলেছিলাম। উৎসাহ ও অধ্যবসায় বেশীর ভাগই ছিল অচিন্ত্যের। পালা করে দুজনে একটা করে পরিচ্ছেদ লিখব এই ছিল আমাদের শর্ত। আমি আমার বরাদ্দটুকু

লিখেই খালাস। অচিন্ত্য নিজের যা লেখবার তাতো লিখতই সেই সঙ্গে আমার লেখাটারও নতুন করে কপি করত তার নিজস্ব নিখুঁত হাতের লেখায়। সমস্ত উপন্যাসটা লেখা হয়ে যাবার পর সে গোটা পাণ্ডুলিপিটাই দু'বার করে পুরো কপি করেছিল।

সেদিন সাহিত্য না হোক অচিন্ত্যের ও আমার আর যা নেশা সেই খেলা নিয়েই বোধহয় আলোচনা করতে করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ অচিন্ত্য আচমকা থেমে গিয়ে উত্তেজিত গলায় বললে, ওই দেখ, গোকুল নাগ আসছে।

গোকুল নাগ কে তা আর বলে দেবার দরকার ছিল না। কল্লোলের সংযুক্ত সম্পাদনা আর সে কাগজেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'পথিক' উপন্যাসটির জন্যে তার নাম তখন আমাদের মত উৎসাহীদের মুখে মুখে ফেরে।

অচিন্ত্যের কথায় সামনের দিকে চেয়ে তিনজনকে একসঙ্গে আসতে দেখলাম। আলাপ না থাকলেও পাড়ারই ছেলে বলে তাদের মধ্যে একজন আমার চেনা। সে ধীরাজ ভট্টাচার্য। ধীরাজ কি একটা বড় বাঁধানো খাতা গোছের খুলে সঙ্গের দুজনকে দেখাতে দেখাতে আসছে।

সেই দুজনের মধ্যে কে গোকুল নাগ তা বোঝবার আগেই অচিন্ত্য উৎসুক ভাবে বলে উঠল, ডাকব গোকুল নাগকে?

ডাকবে? এই রাস্তার মাঝে ডেকে আলাপ করতে হবে? কথাটা ভেবেই সভয়ে সজোরে আপত্তি জানালাম, না না, ডাকতে হবে না। কিছুতেই না।

অচিন্ত্যকে ডাকবার সুযোগ না দেবার জন্যে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। ধীরাজের সঙ্গে তার সঙ্গীরাও বাঁধানো খাতাটির দিকেই চোখ রেখে আমাদের লক্ষ্য না করেই আমাদের পেরিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলে অচিন্ত্যকে অন্তত চিনতে পেরে একটু নিশ্চয়ই দাঁড়াতেন।

ওই অগোচরে পার হয়ে যাওয়াতেই ব্যাপারটা শেষ হল না। অচিন্ত্য হঠাৎ নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, গোকুলদা!

ধীরাজ ও তার সঙ্গীদের ফিরে দাঁড়াতে হল। আমাদের সঙ্গে তাদেরও আসতে হল এগিয়ে। কাছে যেতে অচিন্ত্য পরিচয় করিয়ে দিলে,—গোকুলদা, এই প্রেমেন।

প্রেমেন!—গোকুলদা বলে যাঁকে সম্বোধন করেছিল অচিন্ত্য, তিনি নয়, তাঁর সঙ্গীই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে 'তুমিই প্রেমেন!' বলে এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে অবাক করে দিলেন।

গোকুল নাগকে তো দেখছি। এক মাথা রুক্ষ কোঁকড়া বন্য উদ্দাম গোছের চুল

আর শীর্ণ কিছুটা রুগ্ন শরীর নিয়ে স্থির গম্ভীর স্বল্পবাক্ মানুষ। অন্যজন গোকুল নাগেরই কতকটা বিপরীত। মাথায় তখনকার দিনের রেওয়াজ-মাফিক মাঝখানে সিঁথি কাটা কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো কোঁকড়ানো বাবরী চুল আর নায়কপ্রতিম সবল সুঠাম চেহারা নিয়ে এই রীতিমত সুপুরুষটি আবার কে? মানুষটি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন, আমি শৈলজা! শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে নির্মল সরল যে হাসিটি তিনি হাসলেন তাতেই কিনে নিলেন আমাদের।

গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলেও তাঁর সঠিক মূল্য সেদিন ঠিক বুঝিনি। তাঁর মধ্যে বরং একটু উন্নাসিক দরত্বের আভাসই যেন পেয়েছিলাম। শৈলজানন্দ কিন্তু এক মুহূর্তে আমাদের একেবারে অন্তরঙ্গ আপন হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে মণীন্দ্রলাল বসুর মধুর মসৃণ নবনী কোমল কাহিনীগুলির পর যথার্থ মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে তুলে আনা যার কয়লা কুঠির গল্প সাহিত্যসমাজকে তখন সচকিত করে তুলেছে এই সেই শৈলজানন্দ তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আলাপ পরিচয় হয়ে যাবার পর শৈলজানন্দই প্রস্তাব করলে, চল, সকলে মুরলীদার বাড়ি যাই।

মুরলীদা! তিনি আবার কে?

মুরলীদাকে চেন না! শৈলজার সঙ্গে গোকুল নাগও হাসলেন।

শৈলজানন্দ হেসে বললে, চিনবে! চিনবে! চল।

॥ একুশ ॥

মুরলীদাকে তারপরে সত্যিই চিনেছিলাম'। চেনবার মত মানুষই বটে। শুধু চেনবার নয়, চিনে মুগ্ধ বিস্মিত কৃতার্থ হবার। শৈলজানন্দ 'চিনবে! চিনবে!' বলে মুরলীদা মানুষটার নামের চারিধারে যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টনী দিয়েছিল সেটা নেহাত নিরর্থক নয়।

মুরলীদার মত মানুষ সর্বকালে সাহিত্যের শোভাযাত্রায় নেপথ্যে থেকে যান। তাঁর কোন লেখার ভেতর দিয়ে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এমনও নয়। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে তাঁর মত বিরল মানুষেরা শিল্প সাহিত্যের নতুন পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়ার অভিযানে প্রায় নীরব যে ভূমিকাটি নিয়ে থাকেন ইতিহাসে তাব মূল্য সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করবার। কল্লোল কালিকলমের সময়ে সাহিত্যের সার্থক বিকাশের আন্দোলন যেখানে যতটুকু হয়েছে তার বিবরণ থেকে মুরলীদার নাম কোথাও বাদ দেবার নয়। সামনেব সারির ঋত্বিকদের একজন না হয়েও তিনিই ছিলেন যেন সাহিত্যের সেই পর্বের গূঢ় প্রাণমন্ত্রের প্রধান ধারক।

শৈলজানন্দ, গোকুল নাগেব সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উত্তেজনা নিয়ে অত উৎসাহ করে মুবলীদার বাড়ি গেলেও সেদিন তাঁব সঙ্গে দেখা হয়নি। রূপনারায়ণ মুখার্জি লেনের একটা পুরোনো বাড়ি। গিয়ে শুনলাম মুরলীদা বাড়ি নেই। শীগগিরই আসতে পারেন আশা কবে বাড়িটির বাইরের কাঁচা উঠোনে মাটিব ওপরই উবু হয়ে বসে আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। শেষ পযন্ত তাঁর দেখা না পাওয়ায় উঠোনের মাটিতে লাঠি দিয়ে বড বড হরফে আমাদের সকলের নাম লিখে রেখে আসা হযেছিল। লেখার এ বুদ্ধিটা গোকুল নাগের। তিনিই তাঁর লাঠিটা কলম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

মুরলীদার বাড়িতে অপেক্ষা করতেই বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। গোকুল নাগের হাতে তখন তাঁর **Soul of a slave** ছবি তোলার কাজ। আমায় কল্লোল অফিসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আমাদেরও তখন যে যার বাড়ি গেলে হয়। কিন্তু তা কি আর পেরেছিলাম! দলে তখন আমরা মাত্র তিনজন। শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য আর আমি। তিনজনের বাসার মধ্যে মোট এক মাইলের ব্যবধানও নয়।

কিন্তু পরস্পরকে এগিয়ে দেবার উৎসাহে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গিয়েছিল অমন কত মাইল পরিক্রমায়।

প্রথমেই গিয়েছিলাম শৈলজার বাসা দেখতে। বাসা মানে মেস বাড়ি। চক্র-বেড়ে রোডের ওপর এক জরাজীর্ণ, ওপরের চিলকোঠা নিয়ে আড়াইতলা বাড়ি। তখনকার অতি দরিদ্র প্রায় নিচের ধাপের কেরাণী, স্কুল মাস্টারের মত চাকুরেদের আস্তানা। শৈলজানন্দই সেখানে ব্যতিক্রম। চাকরি-বাকরিহীন লেখক মাত্র। শৈলজানন্দ দোতলায় তার সীট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। সীট মানে একটা নিচু কাঠের তক্তপোশ। তার পাশে একটা বই কাগজের ছোট শেল্ফ। এ রকম সীট সে কামরাটিতে আরো তিনটি। সে সব সীটের বোর্ডারদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ছুটির দিন নয় বলে দেখা হয়নি মেসের বিশেষ কারুর সঙ্গেই। কিন্তু নিজের মেস দেখিয়ে আমাদের একটু এগিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে যেতে যেতে শৈলজানন্দ তাদের যে বর্ণনা দিয়েছিল তাতে যেন চোখে দেখার চেয়েও তাদের পরিচয় আমাদের কাছে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

আজকের দিনের পাঠকও একটু কষ্ট করলে সেদিনকার সেই মেসের মানুষ আর তাদের জগতের প্রত্যক্ষ জীবন্ত পরিচয় পাওয়ার আনন্দ বেদনা বিস্ময় বিহ্বলতার স্বাদ পেতে পারেন। পেতে পারেন শৈলজানন্দের তো বটেই বাংলা সাহিত্যেরই একটি অবিস্মরণীয় গল্প খুঁজে বার করে, 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' নাম নিয়ে ১৯২৩ এরই কোন মাসের প্রবাসীতে বেরিয়ে সেদিনকার সাহিত্যরসিক মাত্রকেই যা সত্যি সচকিত করে তুলেছিল। 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' শৈলজানন্দের সেই চক্রবেড়ে রোডের মেসের সহ-বাসিন্দাদেরই গল্প। কালাকুঠির আঞ্চলিক গল্প লিখে পাঠক সাধারণকে যে চমৎকৃত আর মোহিত করেই এসেছে সেই শৈলজানন্দের নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ মানুষের ছেঁড়া-খোঁড়া তালি-মারা রঙচটা জীবন নিয়ে লেখা এই চক-ভাঙা গল্প যত না মধুর তার চেয়ে যেন কেমন একটু তিক্ত আর অস্বস্তিকর। বাঁধা রাস্তা ছেড়ে নতুন কালের সাহিত্য সৃষ্টির সে গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি প্রথম সাহসী পদক্ষেপ।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা সেদিন শৈলজানন্দের সঙ্গে আসতে আসতে তার মেসের নানা বাসিন্দার চরিত্র বর্ণনা মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে একটা কথা বলেছিলাম বলে মনে আছে। শৈলজানন্দ তখনও তুমি হয়ে ওঠেনি। তাই তখনকার মত যথোচিত সম্বোধন করে বলেছিলাম, আপনি যেন লেখা গল্প শোনাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

আমার সেই মন্তব্যটুকুই শৈলজানন্দের মনের মধ্যে বীজের কাজ করে থেকে শেষে

এই গল্পে অঙ্কুরিত হয়েছে ভেবে নিয়ে যদি একটু আত্মপ্রসাদ পেতে চাই তাহলে সে কল্পনাবিলাসের দুর্বলতাটুকু বোধহয় ক্ষমা পেতে পাবে।

শৈলজানন্দের কাছে সেদিন শুধু তার মেসের বিবরণই নয় আরো অনেক কিছুই শুনেছিলাম। বলেও ছিলাম তাকে অনেক কিছু। এত কিছু বলাবলির সময়ের অভাবও হয়নি। কারণ শৈলজানন্দের এগিয়ে দিতে আসাটা তো একতরফা হয়নি। আমরাও তারপর তাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছি। এই ত্রিকোণ পরিক্রমায় কখন সকালের সূয একেবারে মাথার ওপব উঠেছে তা টেরই যেন পাইনি। এইভাবে আলাপ হবার পরদিনই শৈলজানন্দের মেসে যাব বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। কিন্তু তা আর যেতে হয়নি। শৈলজানন্দ আমাব বাড়িতে সাত সকালে এসে হাজিব। হাজিব একা নয়, সঙ্গে আবাব অপবিচিত আবেকজন। সেই অপরিচিত আরেকজন হলেন মুবলীদা মানে মুবলীধর বসু। শৈলজাব কাছে আগেব দিন সন্ধ্যাতে আমাদেব সঙ্গে পরিচয়ের কথা শুনে আজ সকাল হতে না হতেই দুজনে মিলে আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করবেন বলে ঠিক করেছেন। সেই ব্যবস্থা মতই প্রথমে এসেছেন আমার কাছে। আসা নেহাত সাহিত্য প্রীতিবই আকর্ষণে। এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করাব অবস্থা বা ব্যবস্থা আমাব ছিল না। তখনকাব দিনে দবকাবও ছিল না এসব কিছুব।

মুরলীদার নামটা আগেই শুনেছিলাম, এবাব চেহারাটা দেখেছি। স্থিব ধীর একটু গম্ভাব প্রকৃতিব মানুষ। চেহাবা দেখে যা মনে হয় তিনি সত্যিই তাই। আমাদের ভবানীপুরেরই মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুলে মাস্টাবী করেন।

কিন্তু সেটা তাঁর নেহাত আংশিক পবিচয় মাত্র। আসল ধ্যানজ্ঞান তাব সাহিত্য চচা। ক্ষমতা ও সুযোগ থাকলেও স্রষ্টা বা সমালোচক হিসেবে নাম করবার বিন্দুমাত্র মোহ থেকে মুক্ত সাহিত্যেব প্রতি এমন নিষ্কাম ভালবাসা আব সেই সঙ্গে গভীব সাহিত্য বোধ আর কজনেব মধ্যে দেখেছি মনে পড়ে না।

একদিনেই মুরলীদাকে এতখানি অবশ্য চিনিনি। তবে ওই ধীর গম্ভীব স্কুলমাস্টাব ছাপ মারা মানুষটিব সামান্য দু চাবটি কথাবার্তাতেই সাহিত্য চিন্তার যেন ভিন্ন এক স্তবের আভাস পেয়েছিলাম। খুব বেশীক্ষণ মুরলীদা শৈলজানন্দের সঙ্গে আমার বাড়িতে সেদিন কাটাননি। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই মুরলীদা আমাব কিছু অপ্রকাশিত লেখার খাতা চেয়ে নিয়ে উল্টেপাল্টে একটু দেখেছিলেন।

আমার সাহিত্য জীবনেব ইতিহাসে মুরলীদার সেই দেখাটুকু একটা তুচ্ছ সাময়িক ঘটনা নয়। তাঁর একটা বড ভূমিকা আছে সাহিত্যে নিজেকে প্রকাশ করবাব পথ

আমার জন্যে মুক্ত করবার ব্যাপারে। মুরলীদা সেদিন নিজে থেকে চেয়ে আমার লেখাগুলি না দেখে গেলে আমার প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' এত তাড়াতাড়ি সাদরে প্রকাশিত হবার সুযোগ নিশ্চয় পেত না।

'পাঁক' ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হযেছিল 'সংহতি' নামে জ্ঞানাঞ্জন পাল সম্পাদিত একটি পত্রিকায়। যত দূর জানি ছাপাখানার কম্পোজিটব থেকে সবচেয়ে নিচের তলায মিস্ত্রী মজুর শ্রমিকদের জন্যে সেইটেই প্রথম সার্থক সমাজনীতি ও সাহিত্যের কাগজ। তাব সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য দেশনায়ক বিপিন পাল মশায়ের এক পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল।

আমার বাড়িতে এসে খাতাপত্র দেখে যাবাব কদিন বাদেই মুবলীদা 'পাঁক' লেখাটিব পাণ্ডুলিপি নিয়ে সকালে তাঁব বাড়িতে যেতে বলেন। মুরলীদা ও শৈলজানন্দেব সঙ্গে তখন রোজই প্রায দু' বেলা দেখা হয়। তারই মধ্যে পাঁক-এর পাণ্ডুলিপি নিযে তাঁর বাড়ি যাবার কথাটা মুবলীদা একটু রহস্যমণ্ডিত করেই বলেছিলেন। কেন, কি কাবণে তা কিছু না বললেও কাউকে দেখাবার জন্যেই যে এই আহ্বান সেটুকু অবশ্য অনুমান করেছিলাম।

কিন্তু দেখাবেন কাকে আব দেখিয়ে হবেই বা কতটুকু? পাঁক তো তখন সমাপ্তই হয়নি। বছব চৌদ্দ বয়সে আবম্ভ করা উপন্যাসটা তখন মাঝপথে এসেই থেমে আছে। স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবার পর তাতে আব হাত দিইনি।

সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়েই মুরলীদার বাড়িতে গেলাম। শৈলজানন্দ সেখানে উপস্থিত আর সেই সঙ্গে অন্য একজন। তিনিই জ্ঞানাঞ্জন পাল, সংহতির প্রধান সম্পাদক। মুরলীদার কাছে পাঁক লেখাটির বিষয়ে কিছু শুনে তাঁর কাগজে ছাপাবার জন্যেই সেটি চান। যতদূর লিখেছি তা আপাতত তাঁকে দিযে উপন্যাসটি তাঁর কাগজে আমায় শেষ করতে হবে।

পাঁক লেখাটির এ রকম ভাগ্য হবে তা ভাবতে পারিনি। পাণ্ডুলিপি দেওয়ার সঙ্গে সংহতি কাগজটির কয়েকটি সংখ্যা উপহার পেযে উল্টোপাল্টে দেখলাম। সত্যিই সাধারণ সাহিত্য পত্রিকা থেকে ভিন্ন জাতের। শৈলজানন্দের 'বাঙালী ভেইয়া' নামে যে ধারাবাহিক উপন্যাসটি সেখানে বার হচ্ছে সেটিই কাগজটির একটি গৌরব।

কল্লোল থেকে সাদর আহ্বান পেলেও প্রবাসীর পব আমার লেখা প্রথম সংহতি কাগজেই প্রকাশিত হল। কল্লোল-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তারপর যেমন হয়েছে সংহতির সঙ্গে সম্বন্ধও তেমনি থেকেছে অটুট।

সংহতি পত্রিকাটির সঙ্গে যোগ আর তাতে আমার প্রথম উপন্যাস পাঁক প্রকাশ

করাব ব্যাপারে যেমন, ছাপার হরফে প্রথম, আমার কবিতা বার কববার বেলাতেও তেমনি, মুরলীদার সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে আমার লেখা ঘাঁটাঘাটি অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রযোজনার কাজ করেছে।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে সেটা প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের দিন। নজরুলেরই নিমন্ত্রণে নৈহাটি থেকে কল্লোল-এর কয়েকজন মিলে গঙ্গার ওপারে নজরুলের হুগলীব বাড়িতে গিয়েছিলাম তার প্রথম সন্তানের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে

সারাদিনের হৈ হল্লা উৎসবের পর রাত্রে খেতে বসবার আগে খোলা ছাদেব ওপব সকলে কিছুক্ষণ জড়ো হয়েছিলাম। গান বাজনা নয়, গল্প গুজব আব আবৃত্তি কবেই সময কাটছিল। সকলেই আমরা তখন কিছু না কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছি। নজরুল তার নিজেব আর বাকি আমরা ববীন্দ্রনাথের বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। এবই মাঝে মুরলীদা হঠাৎ আমাকে কবিতা আবৃত্তি কবতে বললেন। বললেন, তোমাব নিজের কবিতা আবৃত্তি কর।

নিজের কবিতা! অন্যদের চেয়ে আমিও খুব কম অবাক হইনি। আমি যে কবিতা টবিতা একটু আধটু লেখাব চেষ্টা কবি তা মুরলীদা জানলেন কি কবে? সেই সেদিনেব খাতাপত্র ঘাঁটাঘাটিব মধ্যেই তাহলে জেনেছেন।

নজরুলও তখন জিজ্ঞাসা কবছে, প্রেমের কবিতা লেখে?

হ্যা লেখে। শোনই না। বলে উৎসাহ জানালে শৈলজানন্দ।

কল্লোল এ তখনও পযন্ত যা লিখেছি সবই গল্প। নজরুল বা অন্যদের পক্ষে আমার নিজেব কবিতা আবৃত্তিব কথায় বিস্মিত হওযাও অস্বাভাবিক নয।

এই অবস্থায় কবিতা আবৃত্তি কবতে গিয়ে একটু পবীক্ষা দিতে যাওয়াব মত সঙ্কোচ আব আড়ষ্টতা বাধ করতে পারতাম। কিন্তু আমাদেব সে সময়কার মেলামেশাব বং সত্যিই বুঝি ছিল আলাদা। বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ না কবে অতি সহজেই কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। অসুবিধা যা হয়েছে তা আবৃত্তি করবাব কবিতা নিযে। নিজেব কবিতা আমার সাধারণতঃ মুখস্থ থাকে না। ওরই মধ্যে যেটা মনে পড়েছিল সেইটিই সকলকে শুনিয়েছি। কাজ যেটুকু হবার তাতেই হয়েছে। শুধু আমি নয, আমার সঙ্গে নিজেব কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে অচিন্ত্যও। নজরুল সব শুনে কল্লোলেব সম্পাদক দীনেশদার বিরুদ্ধেই নালিশ জানিয়েছে,—তুমি এদেব কবিতা ছাপো না দীনেশদা?

দীনেশদা যথাযথ উত্তরই দিযেছেন। বলেছেন, ছাপব কি করে? আমি কি জানি ওরা কবিতা লেখে!

স্বয়ং নজরুলের কাছে পাশ মার্ক পেয়ে কবিতার জন্যে সাহিত্যের দরজা আমাদের কাছে খুলে গেছে। এ দ্বারোদ্ঘাটনের আসল যন্ত্রী কিন্তু মুরলীদাই। তিনি সেদিন আমার খাতাপত্র এমন করে ঘেঁটে না দেখলে কতদিনে এ রকম সুযোগ আসত কে জানে?

নজরুলের হুগলীর বাড়িতে দল বেঁধে নিমন্ত্রণে যাওয়ার এ ঘটনা অবশ্য অনেক পরের। তার অনেক আগেই বড়দিনের ছুটির পর পড়াশোনার জন্যে আমায় আবার ঢাকায় ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু যা নিয়ে এসেছিলাম সে মন নিয়ে আর ফিরে যেতে পেরেছি কি!

তা বোধহয় পারিনি। সাহিত্যের চেয়েও কলকাতার সাহিত্য জগতের হাওয়াই মনে কেমন যেন একটা ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে তখন।

এ সাহিত্য জগৎ অবশ্য আমাদের বয়সী নতুনদের। কল্লোল সেই তাদেরই যেন মৌচাক। মৌচাক উপমাটা ঠিক হল না। মৌচাকে মৌমাছির এসে মধুর যোগান দেয়। এ মৌচাকে দিতে হয় না কিছু। যখন ইচ্ছে এসে যতক্ষণ খুশি কাটিয়ে প্রাণের উত্তাপ কিছু নিয়ে যাওয়া যায়

মৌচাকের ছোট ঘরের আড্ডা মনে রঙ লাগিয়েছে। মনে নেশা ধরিয়েছে সংহতির রাস্তায় পার্কে চা, চায়ের দোকানে বসে আলাপের আসর, সেই সঙ্গে শৈলজানন্দের 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা'র মেসবাড়ির আস্তানা আছে, আছে অচিন্ত্যের সঙ্গে আর কিছু না হয়তো আউটরাম ঘাট থেকে স্টীমারে চেপে বোটানিক পার হয়ে শেষ স্টীমারঘাটায় নেমে হেঁটে মৌরীগ্রাম বা আন্দুলে এসে ট্রেন ধরা। মনের এই ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও ঠিক মত পড়াশোনা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ঢাকায় ফিরে গেলাম।

অক্সফোর্ড মিশনে কিন্তু এবার আর জায়গা হল না। জায়গা যে হবে না তা অবশ্য আগেই আঁচ করেছিলাম। মিশন বোর্ডিং-এর তখনকার পরিচালক ফাদার ফনেট একদিক দিয়ে অতি চমৎকার মানুষ ছিলেন। সাদা লম্বা যাজক যেন স্নেহ করুণা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। আমার প্রতি তাঁর একটু অতিরিক্ত স্নেহই যেন ছিল। দোতলার একটি সারির শেষের যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন তাতে কিছুদিন আমাকে বাইবেলের কিছু বাছাই করা অংশ পড়িয়েছেন। টমাস এ কেম্পিসের 'দ্য ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' বইটিও তিনিই আমায় পড়তে দিয়েছিলেন। তার বদলে আমার তাকে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'র ইংরেজী অনুবাদ পড়াবার চেষ্টাকে তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। কোন রকম ধৃষ্টতা মনে করেননি।

এ হেন মানুষের আমার প্রতি বিরূপ হওয়া, আর বিরূপ যদি না-ই হয়ে থাকেন আমাকে দ্বিতীয় টার্মে মিশন বোর্ডিং-এ থাকবার জন্যে আহ্বান না জানানো, একেবারে অকারণ অবিচার নয়। বোর্ডিং-এর নিময় কানুন রক্ষার ব্যাপারে আমি দুটি বেশ গুরুতর অপরাধই করেছিলাম।

প্রথম অপরাধ : অক্সফোড মিশন হোস্টেলে সেই বৃটিশ রাজত্বের কালেই একদিন ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা তুলতে বাধা দেওয়া।

দ্বিতীয় অপরাধ : যে যার নিজের কামরায় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়াই যখন নিয়ম সেই দশটার পর একরাত্রে একটি বোর্ডিং-এর ছাত্রের আর্ত চিৎকারে প্রায় সমস্ত হোস্টেলেরই সচকিত হয়ে জেগে উঠে আমাকে তারই কামরায় তার বুকের ওপরে চেপে বসে থাকতে দেখা।

॥ বাইশ ॥

অক্সফোর্ড মিশনে জায়গা না পাওয়ায় একটু দুঃখ অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু নিজের অপরাধ দুটোর সম্বন্ধে ভাল ভাবেই সচেতন ছিলাম বলে কোন ক্ষোভ মনের মধ্যে প্রশ্রয় পায়নি।

অপরাধ দুটোর কথা মনে পড়লে এখন বেশ একটু কৌতুকই বোধ করি। সত্যি সত্যি জোর করে হোস্টেলের নিয়ম ভাঙার কোন মতলব তো আমার ছিল না। ফাদার ফসেটের প্রতি আন্তরিক যে শ্রদ্ধাটুকু ছিল তাতে তাঁকে জেনে শুনে কোন ভাবে ব্যথিত করতেও চাইনি, তবু পাকেচক্রে দুটো ব্যাপারই আপনা থেকে যেন ঘটে গেল।

ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা তুলতে না দেওয়ার ঘটনাটা ঠিক কি উপলক্ষ্যে হয়েছিল খুব স্পষ্ট মনে নেই। বৃটিশরাজের সেটা একটা কোন গৌরবের দিন ছিল নিশ্চয়। হোস্টেলে বরাবর যেমন হয়ে এসেছে তেমনি ভাবে নেহাত রুটিন মাফিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক-পতাকা তোলবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এ রকম পতাকা উত্তোলন ব্যাপারটায় হোস্টেলের বোর্ডার হিসেবে আমাদের যোগদানের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ইচ্ছে হলে কেউ থাকত, না হলে নয়। ফাদার ফসেটের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সকলের সিনিয়র বোর্ডার একজন অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করতেন, উপস্থিত সকলের তিনবার হিপ হিপ হুর্‌রে বলেই ছুটি মিলে যেত।

সেদিন কিন্তু গোড়াতেই ব্যাপারটায় কেমন খিচ্‌ বেধে গিয়েছিল। উনিশ শো' কুড়ির অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপ তখনও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। বারুদ যেখানে যতটুকুই থাক সামান্য একটু ঠোকাঠুকিতে কিছু স্ফুলিঙ্গ অন্তত তা থেকে ছিট্‌কে বার হতে পারে।

দিনটি ছিল ছুটির। হোস্টেল থেকে সকালের জলখাবার সেরে বন্ধুদের নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে আসবার জন্যে বার হতে গিয়ে ওই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানটা চোখে পড়লেও তা অগ্রাহ্য করে চলে যাবার কথা। কিন্তু তা আর হল না। হল না তখনকার হিসেবে নেহাত তুচ্ছ একটা ব্যাপারেই বলা যায়। ফাদার ফসেট তখনও

সেখানে আসেননি। আমাদের সিনিযার বোর্ডাব কি যেন একটা কারণে আমাদের হোস্টেলেরই একজন সহপাঠীকে খুব তীব্র ভাবে বকাবকি করছেন।

সিনিয়ব বোর্ডার এমনিতে লোক খারাপ ছিলেন না। স্বভাবে নিরীহ ভালমানুষ গোছের। তবে বড যেন একটু বেশী হাত-কচলানো বশংবদ ভাব দেখা যেত ফাদার ফসেটের সামনে থাকলে। হোস্টেলের নিয়মকানুন মানার ব্যাপারে সামনে কিছু না বললেও বোর্ডাবদেব দোষত্রুটি তিনি গোপনে ফাদার ফসেটেব কানে তুলতেন বলেই সকলেই ধারণা। নামে সিনিয়র বোর্ডার হলেও আমাদেব মত তিনি কোন কলেজেব ছাত্র-টাত্র ছিলেন না। এই হোস্টেলে থেকেই পডাশুনা সাঙ্গ করে তখন তিনি তার ছাত্রাবস্থার আনুগত্য নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদির গুণেব পুরস্কাব হিসেবে একটু আবটু তদাবকীব ভার সমেত নিখরচায় হোস্টেলে থাকবাব অধিকাব পেযেছেন। সে তদাবকীর ভাব নিযে গোপনে সত্যিই তিনি বোর্ডাবদেব নামে লাগান বা না লাগান, সামনা সামনি কাউকে এভাবে বকাবকি কবতে তাকে এই প্রথম দেখলাম।

তাব দিক থেকে ক্ষুব্ধ বিচলিত হবাব কারণটা হযেছিল অবশ্য গুরুতব। আব খানিক বাদেই ফাদাব ফসেট নেমে আসাব পরই পতাকা উত্তোলনেব যে অনুষ্ঠানটি হবে আমাদেব একজন বোডাবের আহাম্মকীতে তা তখন একেবাবে ভণ্ডুল হবাব অবস্থা। বাহাদুবী কবে পতাকা তোলবাব খুঁটিতে বশি খাটাতে গিযে সে ভুল পাক দিযে এমন জট পাকিযে ফেলেছে যে পতাকা আর তোলাই যাচ্ছে না। এখন সব জট টট্ কেটে নতুন কবে রশি না লাগালে অনুষ্ঠানটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু নতুন বশি লাগাবাব সময় কোথায়? ফাদাব ফসেটের নামতে আব দেরী নেই। তাকে দাড করিয়ে রেখে নতুন দডি যোগাড কবে এনে আবাব খাটাবাব ব্যবস্থা কবা হবে না কি! তাতে যে কত সময় লাগবে তাই বা কে জানে!

যত না বাগে তাব চেয়ে বেশী নিজের অসহায ক্ষোভে আব হতাশাতেই সিনিযব বোডার তখন আমাদের সহপাঠীটিকে বকাবকি কবছেন।

তার এ রকম বকাবকি কবাটা অস্বাভাবিক বলেই প্রথম বোধহয সেখানে দাডিয়ে পডেছিলাম, তাবপব সব কিছু মিলে কি যেন হয়ে গেল। ব্যাপাবটা ইউনিয়ন জ্যাক নিশান তোলা নিয়ে হওযাতে হঠাৎ কি ভাবে যেন একটা জোবালো প্রতিবাদ আপন থেকেই গলায ঠেলে উঠল। সেটা আব চাপতে পারলাম না।

প্রতিবাদটা কি ভাষায় করেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে তার বক্তব্যটা ছিল এই যে, নিশানেব বশি জডিয়ে ফেলেছে তো হযেছে কি? নিশানের দডি খাটানো আমাদের কারুর কাজ নাকি?

এক কথা থেকে আর এক কথায় যেতে কতক্ষণ! বকাবকির প্রতিবাদ থেকে একেবারে পতাকা তোলাতেই আপত্তিতে পৌঁছতে বেশীক্ষণ লাগেনি। আপত্তিটা শুধু আমার একার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছিল, এমন নয়। যোগ দিয়েছিল তাতে আরো কেউ কেউ। কিন্তু দল পাকাবার চাঁই হিসেবে আমিই রইলাম চিহ্নিত হয়ে।

পতাকা তোলায় বাধা দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে ছিল এই। মাঝ রাতে আর এক ছাত্র বোর্ডারের কামরার সামনের বারান্দায় তার বুকের ওপর চড়ে বসে থাকার ব্যাপারটা আসলে নেহাত ছেলেমানুষী ভাবে হাস্যকর।

যাদের কথা লিখছি তাদের কারুরই আপত্তির কোন কারণ নেই জেনেও নামধাম একটু গোপন করেই ব্যাপারটা জানাচ্ছি। আমাদের হোস্টেলে শারীরচর্চায় সব চেয়ে উৎসাহ ছিল সৌভিকের। তা ওইটিই ধ্যানজ্ঞান করে শরীরটা সত্যিই সে গড়ে তুলেছিল দেখবার মত করে। লম্বা নয়, মাঝারি মাপের চেহারা, কিন্তু গা খুলে দাঁড়ালে তার সুঠাম দেহের পেশীগুলোর ঢেউ খেলানো সঞ্চালনে মুগ্ধ হতে হত।

কিন্তু কোন কিছু নিয়েই অতিরিক্ত মাতামাতির বোধ হয় একটা বিপদ আছে। সব দিকের পাল্লা তাতে ঠিক থাকে না। শরীর-সর্বস্ব হতে গেলে মনের কোন কোন দিক একটু শুকিয়ে কাঠ হবার ভয় থাকে।

সৌভিকের বিরুদ্ধে সেইরকম নালিশই ছিল আমার আর এক সহপাঠী রাতুলের। রাতুল ছেলেটা স্বভাবে চেহারায় তার নামটার মতই যেন নরম আর দুর্বল। দেখতে যেমন নিরাহ গোবেচারা, স্বভাবে তেমনি ভীরু ও লাজুক। সে সৌভিকের সঙ্গে এক গ্রাম থেকেই স্কুলের পড়া শেষ করে ঢাকার কলেজে পড়তে এসেছে। গ্রাম সম্পর্কের জোরেই সৌভিক তার ওপরে কারণে অকারণে জুলুম জবরদস্তি করে—এই হল রাতুলের অভিযোগ। জুলুম জবরদস্তিগুলো সংঘাতিক কিছু নয়। এটা আনো, ওটা করো এই ধরনের ফাই-ফরমাশ খাটানোই বেশীর ভাগ। কিন্তু সময় অসময়, কি নিজের সুবিধা অসুবিধা থেকে এ সব হুকুমের কোন প্রতিবাদ যে সৌভিকের কাছে চলে না, রাতুলের পক্ষে সেইটই সবচেয়ে মর্মান্তিক অপমান মনে হয়।

কেন জানি না, আমাকেই দরদী ভেবে তার দুঃখের কথা আমায় জানাতে জানাতে রাতুল তার অক্ষম আক্রোশের জ্বালাটা একদিন আর লুকোতে পারেনি। বলেছিল, ওই রকম একটা অসুরের মত শরীর তাই, নইলে ইচ্ছে করে একদিন ওর নাকটা এক ঘুসিতে থেবড়ে দিই। কিন্তু ঘুসি তুলতে না তুলতেই আমার হাতটা যে দুমড়ে পাটকাঠির মত ভেঙে দু টুকরো করে দেবে!

রাতুলের কথা শুনতে শুনতে একটু মজা করেই বলেছিলাম, তুমি সৌভিককে জব্দ করতে চাও তো! কাজে লাগাতে পারো তো একটা উপায় বলতে পারি। রাতুল উদ্‌গ্রীব হয়ে উপায়টা জেনে নিয়েছিল আমার কাছে। তারপর সুযোগ মত কাজেও লাগিয়েছিল ফন্দিটা।

ফন্দিটা আর কিছু নয়, সৌভিককে একটু ভয় দেখানো। অতি বড় বীর মাত্রেরই বুঝি অ্যাকিলিস-এর গোড়ালি থাকে। সৌভিকেরও ছিল। সেটা তার ভূতের ভয়। রীডিং রুমেই বোধহয় কথায় কথায় কি ভাবে সে কথাটা একদিন জেনে ফেলেছিলাম। রাতুলকে তাই পরামর্শ দিয়েছিলাম রাত দশটার পর সব আলো নেভা-টেভার পর সৌভিকের কামরার পিছনের জানালার খড়খড়ি তুলে তার ভেতর দিয়ে কিছু কাঁকর ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে বেড়ালের ঝগড়া বা ওই ধরনের কিছু বিদঘুটে আওয়াজ করা।

এ দিকে নরম নিরীহ গোছের হলে কি হয় রাতুলের অন্য দিকে সাহস-টাহস একটু ছিল। অন্তত সৌভিকের জুলুমবাজির শোধ নেবার আগ্রহেই হয়তো ওই রাত্রে একা একা তার কামরার পিছনের অন্ধকার বাগানে দাঁড়িয়ে আমার ফন্দিটা খাটাবার সময় ভয়ের কথা সে ভুলে গেছে। সৌভিক, রাতুল আর আমি, আমাদের তিনজনের কামরাই হোস্টেলের নিচের তলায়। কামরাগুলো ঘোড়ার নালের মত অর্ধ বৃত্তাকারে সাজানো। আমার কামরাটা বাঁদিকের হাতার মাঝখানে, সৌভিকের ওপরে ওঠবার সিঁড়ির ডান পাশে আর রাতুলেরটা ডান হাতায় প্রায় শেষাশেষি। আমাদের অর্ধবৃত্তাকার কামরার সারির পিছন দিকে বাগান গোছের জমির একটা সরু ফালিও এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে গিয়েছে।

আমার ফন্দিটা আগ্রহভরে জেনে নিলেও রাতুলের তা কাজে লাগাবার সাহস হবে কি না সে বিষয়ে আমার বেশ একটু সন্দেহই ছিল। হঠাৎ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটা অস্ফুট চিৎকার আর তার পরেই সশব্দে দরজা খুলে দুড়দাড় করে একজনের বারান্দায় বেরিয়ে আসার ব্যস্ততা দেখেই সে সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল।

কামরা থেকে পড়ি কি মরি সৌভিকই যে বেরিয়ে এসেছিল তা বলাই বাহুল্য। তার সে অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকার শুনে আর নাড়িছাড়া অবস্থা দেখে রাতুলের সব আক্রোশ মিটে গিয়েছিল নিশ্চয়।

ফন্দিটা ভাল ভাবেই খাটলেও নিজের অসাবধানতায় আমিই কিন্তু তখন ধরা পড়ে গেছি। নিজের কামরায় অন্ধকারে বসে ফন্দির ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সৌভিকের চিৎকার আর অস্থির হয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনে উত্তেজনায় ব্যাপারটা ভাল করে দেখবার জন্যে কামরার বাইরে ছুটে না বেরিয়ে

এসে পারিনি। নিজের কামরার বিশেষ প্যাচের কথাটা ভুলে যাওয়ায় ধরা পড়ে গছি তাতেই।

সমস্ত হোস্টেলের মধ্যে সারারাত দরজা খুলে যে দু-একজন মাত্র শুতো তাদের একজন হলাম আমি। দরজা খোলা থাকলেও আমার কামরায় আবার এমন একটা প্যাঁচ করা থাকত যে বাইরে থেকে অন্ধকারে কেউ না জেনে ঢুকতে গলেই কামরার আলো জ্বলে উঠবে। প্যাঁচটা অবশ্য নেহাত ছেলেমানুষী ব্যাপার। লাইটের সুইচের সঙ্গে দরজা খাট সবকিছু জড়িয়ে কয়েকটা সুতো এমন ভাবে এদিকে ওদিকে কায়দা করে বাঁধা যে কোথাও একটু ছোঁয়া লাগলেই আলোর সুইচ অন্ হয়ে যাবে।

বাইরে থেকে আসতে গেলে যেমন, অসাবধানে ভেতর থেকে বার হতে গেলেও যে তেমনি একই প্যাঁচ খাটবে সেই কথাটাই উত্তেজনার মাথায় ভুলে গিয়েছিলাম। নিজের কামরা থেকে সৌভিকের ভয়ার্ত নিষ্ক্রমণ দেখতে আমি যখন দরজার বাইরে গিয়ে দাড়িয়েছি আমার কামরার আলো তখন সবকিছু ফাঁস করে জ্বলছে।

প্রায় নাড়ি-ছাড়া অবস্থায় বাইরে এসে দাঁড়াবার পর সে আলো জ্বলতে দেখে সৌভিক প্রথম একটু চমকেই গেছল বোধহয়। তারপর ভয়টা নিশ্চয় রাগ হয়ে মাথায় চড়েছে। সেই অবস্থায় প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমার কামরা পর্যন্ত সবেগে এগিয়ে এসে দাড়িয়ে সে বলেছে, তুমি! তুমি!

রাগের জ্বালার প্রায় তোৎলা হয়ে যাওয়া মুখ থেকে এ দুটো কথাই যেন হল্কার মত ছিট্‌কে বেরিয়েছে। মুখে ওইটুকু বলেই সে থামেনি, হঠাৎ সজোরে আমায় একটা ধাক্কা দিয়েছে।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে সামলাতে না পেরে আমি বারান্দার ওপর পড়ে গেছি। কষ্ট উঠে দাঁড়াবার আগেই অবাক হয়ে দেখেছি আমাকে ধাক্কা দিয়েই সৌভিক প্রাণপণে তার নিজের কামরার দিকে ছুটছে। ছুটে নিজের কামরায় ঢোকা আর হয়নি। তার দরজাতেই তাকে গিয়ে আমি জাপটে ধরেছি। তারপর যা ঘটেছে তা যেমন আচমকা, তেমনি আজগুবী। ওই জাপটে ধরায় বেশী কিছু আমায় করতে হয়নি। হঠাৎ কি ভেবে জানি না সৌভিক নিজে থেকেই মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আর্ত চিৎকার শুরু করেছে আর আমি বিনা চেষ্টাতেই তার বুকের ওপর সমাসীন হয়ে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে তার আর্তনাদ শুনেছি।

এই অবস্থায় প্রায় সমস্ত হোস্টেলই আমায় সে রাত্রে দেখেছে। ফাদার ফসেট ওপর থেকে দেখলেও নীচে নামেননি। সরেজমিনে এসে চাক্ষুষ বিবরণ নিয়ে গেছেন

আমাদের সিনিয়র বোর্ডার। অপরাধের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে আমার কামরার আলোটাই তখন জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

পরের দিন এ ব্যাপার নিয়ে প্রকাশ্য ভাবে খুব বেশী একটা নাড়াচাড়া হয়নি। আর্তনাদটা তীব্র হলেও তার সমর্থনে আঘাতের চিহ্ন টিহ্ন না থাকায় সাধারণ ভাবে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃদু একটু ভৎর্সনা করেই ফাদার ফসেট ব্যাপারটা যেন চুকিয়ে দিয়েছেন।

আসলে তা যে দেননি পরের বছর আমার কাছে হোস্টেলে থাকবার ডাক না আসাই তার প্রমাণ। অক্সফোর্ড মিশনে আর থাকবার অনুমতি না পেয়ে মন বেশ একটু খারাপ হলেও সৌভিকের ওপর কোন ক্ষোভ কিন্তু অনুভব করিনি। আসল ব্যাপারটা এই যে এ ঘটনার কিছুদিন পরেই সে আমার রীতিমত বন্ধুই হয়ে উঠেছে। সে বন্ধুত্ব অটুট থেকেছে পরবর্তী জীবনেও। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাকে যতখানি জেনেছি তাতে হোস্টেলে থাকবার সময় তার বিরুদ্ধে রাতুলের কাছে শোনা অভিযোগগুলো একটু নতুন দৃষ্টিতে না দেখে পারিনি। বাইরে থেকে দুর্বল অসহায় মনে হলেই নির্বিচারে তার পক্ষ নিতে গিয়ে ভীরু কপটতা ও নীচতাকেই কখনো কখনো প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা এ প্রশ্নও মনে জাগেনি এমন নয়। তার মত সত্যিকার ব্যায়ামবীরের আমার মত একটা সাধারণ ছেলের কাছে চড়াও না হতেই হাত পা ছেড়ে দিয়ে আর্তনাদ করার রহস্যও তারপর পরিষ্কার হয়ে গেছে। শারীরচর্চা যতই করুক বুদ্ধিতে স্বভাবে সৌভিক নেহাত সরল ভালমানুষ। ঢাকা শহরে ছেলেদের ঝগড়া মারামারিতে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার তখনই একেবারে অজানা ছিল না। আমি তার ওপর চড়াও হয়ে যাবার সাহস সে রকম কোন অস্ত্র-টস্ত্রের জোরেই করেছি বলে ধরে নিয়ে সে অতখানি ভয় পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বছর অক্সফোর্ড মিশনে জায়গা না পাওয়াটা দুভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু সেই দুভাগ্যটুকুর আমার জীবনে দরকার ছিল। ও দুভাগ্যটুকু না হলে অনেক মহামূল্য অভিজ্ঞতা থেকেই আমায় বঞ্চিত থাকতে হত। ১১নং কাগজিটোলার মত ৩৫ নং টিকাটুলি আমার কাছে একটা অবিস্মরণীয় ঠিকানা হয়ে থাকত না। অনিল ভট্টাচার্যের মত বন্ধুর সঙ্গে তার সহোদরের আদর নিয়ে তার জননীর অনর্জিত স্নেহের ভাগীদার হতে পারতাম না। জানতে পারতাম না অনিলের বাবা গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যের মত মানুষকে।

॥ তেইশ ॥

ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। সেখান থেকে ফেরবার সময়ই কোথায় গিয়ে উঠব সেই ভাবনায় অস্থির হবার কথা। কিন্তু তা হয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ে না। না হবার কারণ এই যে, যখনই যাই একটা সাময়িক আশ্রয় তো বাঁধা হয়েই আছে। সেখানে উঠে তল্পি-তল্পা নামিয়ে তারপর যা ভাববার ভাবা যাবে।

ঢাকা স্টেশনে নেবে তাই করলাম। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সটান সেই এগারো নম্বর কাগজিটোলার বাড়িতে।

সবাই খুব অবাক হল কি? না, তা বিশেষ নয়। বিরক্ত কি একটু, এমন হুট করে না বলে কয়ে অনাহূত এসে পড়ায়? না, তা মোটেই নয়। অনাহুত যে কারুর জন্যে যখন তখন সাদর অভ্যর্থনা প্রসারিত করে রাখা সে বাড়ির দস্তুর না হলেও বিমলদার স্নেহের পাত্র হিসাবে সেখানে কোন অলিখিত নিয়মে আমার সর্বদাই ছিল অবারিত দ্বার।

অক্সফোর্ড মিশনের বদলে আমার অন্য একটা ভাল আস্তানার ভাবনাও সেই এগারো নম্বর কাগজিটোলার ওপরই ছেড়ে দিলাম। হয়েও গেল একটা ব্যবস্থা। বয়েজ হোম নামে ছাত্রদের একটি নতুন হোস্টেলে বেশ ভাল ভাবে জায়গা পেলাম। হোস্টেলটি খুলেছেন একজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী দেশসেবক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজের ছাত্রেরা সেখানো থাকতে পাবে বলে হোস্টেলটি অনুমোদনও পেয়েছে। অক্সফোর্ড মিশনের মত অত সুখ সুবিধা সেখানে ছিল না। তবু যে ক'দিন ছিলাম সে হোস্টেলে থাকতে আমার খারাপ লাগেনি।

হোস্টেলের খারাপ ভাল বিচার করবার মত মনের অবস্থাও আমার নয়। প্রবাসীতে গল্প দুটি বার হবার পর আমি তখন নতুন নেশায় মেতেছি।

কলকাতায় স্কুলের পর কলেজ পর্ব শুরু হবার সময়েই আমি আর অচিন্ত্য একটা নতুন সাহিত্যের বৈঠক শুরু করেছিলাম। তার নামটা দিয়েছিলাম ছেলেমানুষী ভাবে জমকালো। নাম ছিল 'আভ্যুদয়িক'। আভ্যুদয়িক-এর বৈঠক অবশ্য নিয়মিত ভাবে বসত না। মাঝে মাঝে হঠাৎ আমাদের নিজেদেরই এক একজনের বাড়িতে সভ্যদের ডাক পড়ত বিকেল বেলা জড়ো হয়ে কবিতা গল্প প্রবন্ধ পড়ার। আভ্যুদয়িক-এর চাঁদা-টাদা কিছু ছিল না। ইচ্ছে করলে ভর্তিও হতে পারত না যে কেউ।

আমাদের নিজেদের পছন্দমত কয়েকজন মাত্র মিলেই আমরা এই অনিয়মিত সভা জাগিয়ে রাখতাম।

এতদিন বাদে আজ সেই স্বনির্বাচিত সভ্যদের নামগুলো স্মরণ করতে গিয়ে বেশ একটু অবাকই হচ্ছি। সভ্য সংখ্যা বেশী যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। মোটমাট জনা দশেকের বেশী নয়, কিন্তু সেই কয়েকজনের মধ্যে কারুর নামই তো দেখছি জনারণ্যে হারিয়ে যায়নি তারপর। নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে দু-একজন রীতিমত ভাস্বর। যেমন চিত্ত চট্টোপাধ্যায়। দেশসেবা ও রাজনীতিতে নিজের একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে যিনি দুবার করপোরেশনের মেয়র পদ অলঙ্কৃত করেছেন সেই চিত্ত চট্টোপাধ্যায় অভ্যুদয়িক-এ রীতিমত প্রতিশ্রুতি ভরা তখনকার দিনের পক্ষে আধুনিক গল্প পড়েছিলেন একদিন এ কথা সহসা যেন বিশ্বাসই হয় না।

শুধু চিত্ত চট্টোপাধ্যায় নয়, আমি আর অচিন্ত্য ছাড়া শিশির বসু, বিনয় চক্রবর্তী, মনোমোহন সান্যাল, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমীর মুখার্জি, যে গোণাগুণতি কয়েকজন নিয়মিত সভ্যকে নিয়ে অনিয়মিত আভ্যুদয়িক এর আসর তখন বসত, তারা প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে স্মরণীয়ভাবে কৃতী হয়ে উঠেছে।

কলকাতার আভ্যুদয়িক-এর মত ঢাকাতেও ওই নামেই একটা সাহিত্যের বৈঠক বসাবার ব্যবস্থা করেছিলাম এই সময়ে। বৈঠক কিন্তু দু-চারটের বেশী হয়নি। হবে কি করে? সভ্য তো আমাদের সেই গোণাগুণতি ক'জন। বৈঠক বসাবার মত জায়গা জোটানোই তার ওপর বেশ কঠিন। মোটমাট তিনটি আসরই বোধহয় বসেছিল আর তার দুটিই বন্ধু অনিল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। আর কারুর না থাক অনিল ভট্টাচার্যের মায়ের এ রকম ছেলেমানুষী ব্যাপারে প্রশ্রয় ছিল।

আভ্যুদয়িক-এর সূত্রেই অনিলের বাড়ি গিয়েছিলাম। সে বাড়ির হাওয়াতেই এমন একটা সহজ আন্তরিকতা ছিল যে, একবারের পরিচয়েই আপনজন হয়ে উঠতে এতটুকু দেরী হয়নি।

আভ্যুদয়িক-এর বৈঠকের পর সে রাত্রে অনিলদের বাড়িতেই খেয়ে যেতে হয়েছিল। অনিল আর আমাকে বসিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে অনিলের মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার অনেক খবরই গল্প করতে করতে জেনে নিয়েছিলেন। সে জানাটা যে নেহাত অলস কৌতূহলের ব্যাপার নয়, ও বাড়িতে দ্বিতীয় অধিবেশনের পরই তা বোঝা গেল।

সেবারও রাত্রের খাওয়াটা অনিলদের ওখানেই সারতে হল। এবারে শুধু অনিল আর আমি নয়, আমাদের সঙ্গেই বসে খেলেন অনিলের বাবা গুরুবন্ধুবাবু। দীর্ঘদেহ

পাতলা রোগা চেহারা মাথায় স্বল্প টাক নিয়ে ঈষৎ শীর্ণমুখে প্রসন্ন গাম্ভীযময় একটা বিরল ব্যক্তিত্বের ছাপ। গুরুবন্ধুবাবু তখন ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। সেখান থেকে বরোদা রাজ্যের আমন্ত্রণে তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। দেশবরেণ্য সেই রমেশ দত্ত মশায়ের সময় থেকে বরোদা রাজ্যে বাঙালীর যে বিশিষ্ট যোগ্যতা সমাদৃত হয়ে আসছে গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য তারই ঐতিহ্য সার্থক ভাবে রক্ষা করে সেখানকার দেওয়ান পদে সাদরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে পদে নিজের কৃতিত্ব দেখাবার সময় তিনি পাননি। ও পদ পাবার কিছুদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ভাবে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

গুরুবন্ধুবাবুকে প্রথম যখন দেখি তখন সামান্য না হলেও এমন কিছু বড় কাজ তিনি করতেন না। তাঁর ভেতর সে কাজের গণ্ডি ছাড়ানো কি ক্ষমতা যে প্রচ্ছন্ন আছে তা তখন বোঝবার যোগ্যতা অবশ্যই আমার ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত স্বল্পভাষী ধীর গম্ভীর প্রকৃতির এ মানুষটি যে ঠিক সাধারণ মাপের নয় এইটুকু সত্যিই কি করে যেন অনুভব করেছিলাম।

সেদিন সেই একসঙ্গে খেতে বসার সময়ই অনিলের মা হঠাৎ আমার ওই বাড়িতেই এসে থাকার কথা পাড়লেন। বয়েজ হোম-এর মত জায়গায় আমার থাকাটা যে তাঁর পছন্দ নয় এব আগেই দু-একটা মন্তব্যে তিনি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে মন্তব্য যে এই প্রস্তাবের ভূমিকা হতে পারে তা কিন্তু ভাবতেই পারিনি। প্রস্তাবটা করেই অনিলের মা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কি বল গো!

সত্যিই বেশ সসঙ্কোচে সভয়ে গুরুবন্ধুবাবুর দিকে এবার তাকালাম। ওই নিতান্ত স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি কি বলবেন এ রকম অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে? কেন অনিলের মা আচমকা এ রকম একটা বেয়াড়া ইচ্ছা জানিয়ে আমাকে এমন অপ্রস্তুত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেললেন? গুরুবন্ধুবাবু এখন যদি অন্য মত জানান বা সায় দিলেও নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে যে দিচ্ছেন তার আভাসটুকু পাওয়া গেলেও আমার যে লজ্জার অপমানের সীমা থাকবে না।

অনিলের বাবা কিন্তু আমায় দু-এক মুহূর্তের বেশী উদ্বেগের যন্ত্রণায় রাখলেন না। গম্ভীর মুখেই তিনি আমার দিকে ফিরলেন, কিন্তু প্রস্তাবটার জন্যে যেন তিনি অপেক্ষাই করছিলেন এমনি ভাবে সংক্ষেপে বললেন, ভাল কথা তো। অনিলের অন্তত কিছু উপকার হবে!

এরপর বয়েজ হোম-এর তল্পিতল্পা গুটিয়ে এ বাড়িতেই এসে উঠলাম। তাতে অনিলের কিছু উপকার হয়েছিল বলে তো জানি না। অন্তত পড়াশোনার দিক

দিয়ে নয়। আমি এ বাড়িতে এসে থাকায় ফল যেটুকু হয়েছে তা অনিলের পড়াশুনা করার ব্যাপারে নয়, তা ছাড়ার ব্যাপারে। আমার মত বিজ্ঞানের ছাত্র হলে কি হয়, অনিল মনে প্রাণে একেবারে অন্য জাতের। সে তখনকার দিনেই লম্বা চুল রাখে, আড়বাঁশি বাজায় আর ছবি আঁকে।

এই ছবি আঁকাটাই তার আসল নেশা বললে কম বলা হয়। এই তার ধ্যানজ্ঞান। বিজ্ঞান-পড়া-টড়া ছেড়ে শুধু ছবি আঁকাই সে সার করতে চায়। তার জন্যে অঙ্কন বিদ্যা শিখতে চায় কলকাতার আর্ট কলেজে।

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? গুরুবন্ধুবাবুর মত প্রসন্ন গম্ভীর অথচ শৃঙ্খলা নীতির ব্যাপারে বজ্রকঠিন মানুষের কাছে সে কথা পাড়বে কে? অনিল কেন তার মায়েরও সে সাহস ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমাকেই সে সাহস করতে হল। গুরুগম্ভীর মানুষ এমনিতে বেশ একটু দূরত্বের বেড়াতেই ঘেরা থাকতেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর যে একটা পৃথক নীরব প্রশ্রয় ছিল তা আমি বুঝে ফেলেছিলাম কিছু দিনের মধ্যেই।

সে প্রশ্রয়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি হয়তো বুঝলেও একদিন সাহস করে তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা পেড়ে ফেললাম। কি কি বলেছিলাম, কি যুক্তি দিয়েছিলাম তা সঠিক মনে নেই, তবে আমার ছেলেবেলার বন্ধু দেবীপ্রসাদের কথা যে তুলেছিলাম এটুকু ভুলিনি।

গুরুবন্ধুবাবু গম্ভীর মুখে আমার আবেদনের কথাগুলো শুনেছিলেন। কি তিনি ভাবছেন তাঁর মুখ দেখে তা বোঝা যায়নি। শেষ পর্যন্ত শুনে যে ভাবে 'আচ্ছা' বলে প্রসঙ্গটায় তিনি দাঁড়ি টেনে দিলেন তাতে আমার দৌত্যের সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হয়েই চলে এসেছিলাম তাঁর ঘর থেকে। কিন্তু আমার আর্জি সত্যি সত্যিই মঞ্জুর হয়েছিল। অনিল অনুমতি পেয়েছিল চিত্রশিল্পী হবার।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া অনিলের তাই আর হয়নি। সে চিত্রশিল্পীই হয়েছে। প্রথম জীবনে এ ভাবে সাধনার লক্ষ্য বদল করে ভুল সে কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না। দেবীপ্রসাদের সারিতে সে অবশ্য পৌঁছায়নি, কিন্তু তার আলফা বিটা স্বাক্ষরটা বাংলা চিত্রশিল্পের জগতে একেবারে অপরিচিত বোধহয় নয়, বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ আঁকায় সে অন্তত নতুন আধুনিক ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বই 'কঙ্কাবতী'র প্রথম সংস্করণের জন্যে আঁকা আলফা বিটা চিহ্নিত অনিল ভট্টাচার্যের প্রচ্ছদ এ বিষয়ে অকাট্য সাক্ষ্য দেবে।

অনিলের বিজ্ঞান পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হয়নি, আমারও হয়নি বিজ্ঞানের পাঠ

নিয়ে ডাক্তার হওয়া। মত ও পথ বদলে আমিও চলে এসেছি কলকাতার সাহিত্য জগতের টানে। প্রলোভনটা সে বয়সের পক্ষে একটু বেশী প্রবলই অবশ্য ছিল। কল্লোল-এ গল্প শুধু নয় কবিতা তো ছাপা হচ্ছেই, অন্য বড় কাগজ থেকেও ডাক আসছে লেখবার।

আগের বার কলকাতায় গিয়ে কল্লোল দল, মুরলীদা আর শৈলজানন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে; তারপর সংহতি কাগজের সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল শুধু নয়, তখনকার সাহিত্যের জগতের আর একটি মনে রাখার মত চমৎকার মানুষের সঙ্গে মুরলীদা ও শৈলজানন্দের মারফত পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। মানুষটির নাম সুবোধ রায়। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি কিন্তু সাহিত্য নিয়ে অফুরন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার যেন একটি নিত্যসজাগ বিদ্যুৎ কুণ্ডলী।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে নৈহাটির রেলওয়ে ব্রীজের নিচে পথের বাঁকে প্রথম যে দেখা হয়েছিল তার মূলে এই সুবোধদার একটা ভূমিকা ছিল। সুবোধদাদের বাড়ি চুঁচড়োয় কিন্তু তাঁর বাবা তখন নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহের কয়েকটি দিনে রোগী দেখতে আসতেন। তাঁর এ দাতব্য চিকিৎসার জন্যে বরাদ্দ একটি দিনেই নৈহাটি থেকে হুগলিতে নজরুলের বাসায় যাওয়ার সুবিধে হবে বলে সুবোধদা তাঁর বাবাব ডিসপেনসারীতে আমাদের জড়ো হতে ডেকেছিলেন। তাঁর আহ্বানে নৈহাটিতে সেদিন গিয়ে জড়ো না হলে রেলওয়ে পোলের নিচেকার পথের বাঁকে নজরুলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটা অমন নাটকীয় নিশ্চয় হত না।

নৈহাটিতে সুবোধদার বাবার ডিসপেনসারীতে সেই একবার নয় তার পরও বেশ কয়েকবার গিয়েছি। সুবোধদারই নিমন্ত্রণে গেলেও প্রৌঢ় বয়সে বিনামূল্যে চিকিৎসা করবার জন্যে সপ্তাহের ক'টি দিন যিনি চুঁচড়ো থেকে গঙ্গা পাব হয়ে নৈহাটি এসে খাকার দায নিতেন সেই মানুষটির আকর্ষণ বড কম ছিল না।

সুবোধদার বাবা কি রকম মানুষ ছিলেন তার একটি জীবন্ত ছবি শৈলজানন্দের সে যুগের একটি উপন্যাসে পাওয়া যাবে। আমার 'পাঁক' যেখানে প্রকাশিত হয়, সেই সংহতি পত্রিকাতেই 'বাঙালী ভেইয়া' নামে সেটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পাটকলের দীন দরিদ্র নানা ভিন্ন প্রদেশাগত কুলি মজুরদের জগৎ নিয়ে লেখা সে বিশিষ্ট উপন্যাসটি বর্তমানে একেবারে লুপ্ত বলেই মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সম্পদ হিসাবেই সেটি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়।

সুবোধদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু মাত্র অবশ্য জেনেছিলাম, কিন্তু তাঁর সদা উদ্বেল প্রাণবন্ততার স্পর্শ তাতেই অনুভব না করে

পারিনি। ঢাকায় বয়েজ হোমে অনিলদের বাড়িতে থাকবার সময় সেই সুবোধদার কয়েকটা চিঠিই কলকাতায় টানবার একটা বড় চুম্বক হয়ে উঠেছে।

সুবোধদার চিঠিগুলো খুব দীর্ঘ ছিল না। লেখা চেয়ে পাঠানোই তার মূল কথা। কিন্তু সেই লেখা চেয়ে পাঠানোটাই তিনি কেমন করে যেন উত্তেজনায় ভরে দিতে পারতেন মনে হয়।

ঢাকায় তিনি আমার কাছে লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন 'বিজলী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্যে। বিজলী পত্রিকাটি প্রথম বার করেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি সে কাগজ ছেড়ে দেবার পর তার সম্পাদনার ভার পেয়েছেন কবি সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে আছেন সুবোধদা।

বিজলী কাগজটার এই হস্তান্তর সুবোধদার চিঠির গুণে আমার কাছে যেন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে উঠেছে এ রকম ঘটনার শরিক হওয়ার লোভটা নিঃশব্দে গোপনে আমার ডাক্তার হবার সঙ্কল্পের ভিত একটু একটু করে কখন যে ক্ষইয়ে দিয়েছে তা ঠিক বুঝতেই পারিনি।

এরপর কলকাতা যাবার জন্যে মন টেনেছে। তবে ঢাকা যে খারাপ লেগেছে তা একেবারেই নয়। প্রথম বছর কলেজে পড়বার সময় ঢাকা থেকে কয়েকবার নারায়ণগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছি। একবার পুজোর ছুটির সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে গহনার নৌকোয় এগারো নম্বর কাগজিটোলার বাড়ির পরিবারের সঙ্গে এক রাত দু'দিনের পাড়ি ব্রহ্মপুত্রের তীরে পুরানো খাতের ধারে বাৎসরিক মেলার জন্যে বিখ্যাত লাঙলবন্ধের কাছের বীরপাড়া বলে একটি গ্রামেও এক হপ্তা কাটিয়ে এসেছি। বড় ভাল লেগেছিল নারায়ণগঞ্জ আর শীতলক্ষ্যা। নামটি যেমন মিষ্টি নদীটিও তেমনি। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম ডাক্তারী পাশ করবার পর আর কোথাও নয় শীতলক্ষ্যার ধারে ওই নারায়ণগঞ্জেই কোথাও চিকিৎসার আস্তানা পাতব। ডাক্তারীর সঙ্গে সাহিত্যের দোটানায় পড়বার পরও সে সঙ্কল্প বদল করিনি। ডাক্তারী আর পড়ি না পড়ি কলকাতায় সাহিত্যের জগতের হাওয়া একটু গায়ে লাগিয়েই আবার এখানেই ফিরব এই তখন ঠিক করে রেখেছি।

ফেরা কিন্তু আর হয়নি। নারায়ণগঞ্জে তো নয়ই, ঢাকাতেও না। ঢাকা শুধু মনের মধ্যে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখা কিন্তু অম্লান স্মৃতি হয়েই আছে। জানি আমার প্রথম যৌবনের সেই সূত্রাপুর লক্ষ্মীবাজার আর্মানীটোলা গ্যাণ্ডেরিয়া উয়াড়ী ঠিকাটুলি রমনা বাস্তবে কোথাও আর নেই। নামগুলো থাকলেও সব কিছুই সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে নিশ্চয়। ঢাকা শহরই আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সে বদলের হদিশ

পেতে চাই না। পাছে আমার মনের সে স্মৃতির সঞ্চয় বর্তমানের আলোয় বিবর্ণ মলিন হয়ে যায় তাই নতুন বাংলাদেশ হবার পর কয়েকবার সাদর আহ্বান পেয়েও আমি সেখানে যেতে রাজী হইনি।

আমি এখনো মনে মনে সুত্রাপুরের পোল দিয়ে গ্যাণ্ডেরিয়া চলে যাই, বুড়িগঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই নতুন বজরা কোথায় বেঁধেছে দেখবার জন্যে, শুধু শুধুই ঢাকা স্টেশনে যাই কুটি গাড়োয়ানদের অননুকরণীয় গলায় অতুলনীয় সব রসের টিপ্পনী শুনতে। যেখানে যা দেখেছি শুনেছি করেছি তার সব ছবি এখনো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে স্পষ্ট। আমি কাগজিটোলার বাড়িটা চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। দেখতে পাই, লক্ষ্মীবাজারে আমাদের অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল আর তার সামনের রাস্তাটা। যেখানে বন্ধু ও সহপাঠী সুধীশ ঘটকের বাবা ঢাকার তখনকার সাবডিভিশন্যাল অফিসার সুরেশ ঘটকের কাছে বসে বহু সন্ধ্যা তাঁর ইংরেজীতে লেখা বৈষ্ণব কবিতা শুনে ও গল্সওয়ার্দি ইয়েট্স প্রমুখ বিলেতের স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর পত্রালাপে সহযোগিতা করে কাটাতে হয়েছে। উয়ারীর সেই সেকেলে বিরাট বাড়িটা শুধু চোখে দেখতে পাই না। সন্ধ্যার পর শুধু হাততালি দিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে যাদের মারা যায় উয়ারীর সেই বিখ্যাত মশক বাহিনীর গুঞ্জনও যেন শুনতে পাই।

সবচেয়ে স্পষ্ট ও মধুর হয়ে আছে টিকাটুলির সেই পঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়িটা। উয়ারী থেকে শর্টকাটে আসবার জন্য রেললাইনগুলো পার হবার সময়ই পাড়াটা যে আলাদা ধরনের তা যেন টের পেতাম। রেললাইনের উয়ারীর দিকের বিরাট কয়েকটা বাড়ির বিস্তীর্ণ দেওয়ালে অম্লান্তক গজসিংহ গোছের অদ্ভুত ভাষায় বিজ্ঞাপনগুলোর অক্ষরগুলো এখনো যেন চোখে ভেসে ওঠে।

লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌছলেই নির্জন রাস্তা আর ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর-গুলো যেন অন্য শহরের। রাস্তার লাল মাটি, প্রত্যেকেরই সামনে কিছুটা বেড়ায় ঘেরা বাগান নিয়ে বাড়িগুলোর হাত-পা ছড়ানো চেহারা দেখে মধুপুরের কথাই মনে পড়ত। এরই মধ্যে একটি বাড়ির ছবি মনের মধ্যে একেবারে গাঁথা। ঠিকানাটাও আজো ভুলিনি, পঁয়ত্রিশ নম্বর টিকাটুলি।

॥ চব্বিশ ॥

একদিন সেই টিকাটুলি আর ঢাকার মায়া ছেড়ে চলে এলাম। সত্যিই চিরকালের জন্য ছেড়ে আসব বলে চলে আসিনি। কিছুদিন বাদেই আবার ফিরে যাব এই ছিল মনের ইচ্ছা, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে যাওয়া ক্রমেই পিছিয়ে যেতে লাগল। এক মাস এক মাস করে, ছ'মাস ন'মাস এক বছর দু'বছর। তারপর যাওয়ার কথা যেন মনেই রইল না।

কলকাতায় বাঁধা পড়ার কারণ একটা নয়, অনেকগুলো। তার মধ্যে সাহিত্যের জগতের টানটাই একমাত্র, এমন কি প্রধানও নয়। কলকাতায় তখন আমি অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে একটা হল স্কুলের একটা চাকরি।

স্কুলটা এক রকম নিজেদের পাড়ারই বলা যায়। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়বার বড় হাই নয়, মাইনর স্কুল তখন যাকে বলে তাই। সে ইস্কুলের আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার। ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ভূগোল ইত্যাদি সব রকম বিষয় তো পড়াই-ই, তার ওপর ছেলেদের হপ্তায় দু'দিন ড্রিল করাবার ভারটাও আমার ওপর।

আজটা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারের। মাইনে কত?

মাইনে নেবার সময় যাতে স্ট্যাম্পের ওপর সই করতে না হয় তাই বোধ হয় উনিশ টাকা মাত্র।

স্কুলের মাইনে উনিশ টাকা হলেও ওইটুকুই আমার তখন রোজগার নয়। স্কুলে যা পাই তার চেয়ে এক টাকা বেশি তখন আমি পাই টিউশনি করে। সুতরাং উনিশ আর কুড়ি নিয়ে উনচল্লিশ টাকা আমার তখন আয়। সে যুগের পক্ষে খুব কিছু কম বোধহয় বলা যায় না।

মাস্টারি আর টিউশনি এ দুটো কাজ আমার খুব চেষ্টা চরিত্র করে জোগাড় করতে হয়নি। সত্যি বলতে গেলে যেন কতকটা আপনা থেকেই কাজগুলো আমার কাছে এসে গেছে।

মাস্টারিটা পাড়ার এক সঙ্গীই জুটিয়ে দিয়েছে নিজে থেকে। তার বাবা ওই মাইনর স্কুলটির পরিচালনা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। স্কুলের সব কিছু তাঁর নির্দেশেই হয়।

কিছুদিন আগে স্কুলের অ্যাসিন্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার পদটি খালি হয়েছিল। ছেলের কথায় তিনি কাজটি আমাকেই দিয়েছেন।

চাকরিটা যার জন্যে পাওয়া আমারই পাড়ার এমন হিতৈষী সমবয়সীকে বন্ধু না বলে শুধু সঙ্গী বলছি কেন? বলছি এই সূত্রে একটু মজার ইতিহাস জানাবার জন্যে। সঙ্গী যাকে বলছি তার ডাক নামটাই ভাল করে মনে আছে। বেঁটে বলেই সবাই তাকে ডাকে। নাম বেঁটে হলেও খুব বেঁটে সে নয়। আমার চেয়ে অন্তত ইঞ্চিখানেক লম্বা। আমরা এক পাড়ারই ছেলে,একই ক্লাবে ব্যায়াম করি, ফুটবল ক্রিকেট খেলিএকই টিমে।

এমনিতেই আমাদের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে পাড়ায় মারামারি আমার যা কিছু হয়েছে তা ওই একজনের সঙ্গেই।

ছেলেবেলায় কেন ম্যাট্রিক পাশ করবার পরও রাস্তার ধারে ক'জনে মিলে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঝাপটা ঝাপটি করে দুজনে ফুটপাথের ওপর গড়াগড়ি খাবার কথা এখনও মনে আছে।

এ মারামারি কিন্তু ওইখানেই শেষ। তার দু'দিন বাদেই আমাদের বাড়ির পাশের আদি গঙ্গার ঘাটে নেমে সাঁতরে কালিঘাটের মন্দিরের ঘাট পর্যন্ত যাবার জন্যে দল বেঁধে সে-ই আমাকে ডাকতে এসেছে।

আসলে তার মেজাজটা ছিল একেবারে খড়ের আগুন, একটা কিছু তার বেয়াড়া লাগলেই দপ্ করে উঠে একেবারে দাউদাউ। সে মেজাজ আমি আবার পারতাম না মোটেই বরদাস্ত করতে। তাই তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি মানেই ছিল এক প্রস্থ হাতাহাতি। ওই হাতাহাতিতেই ফুরিয়ে গিয়ে সে ঝগড়ার রেশ কেউ কিছু পুষে রাখতাম না বলেই বন্ধু বা সঙ্গী যে নামই দিই পরস্পরের প্রতি টানটা নিখাদ ছিল শেষ পর্যন্ত। বেঁটে আর নেই কিন্তু পাড়ার সঙ্গী ও বন্ধুদের কথা ভাবতে গেলে তার কথাই আগে মনে পড়ে।

এই বেঁটেই মাস্টারীটা নিজে থেকে যোগাড় না করে দিলে খোঁজখবর নিয়ে চেষ্টা চরিত্র করে আমার তা পাওয়া সত্যিই সম্ভব ছিল না, সেদিক দিয়ে নিজের জীবনের এই দিকটার কথা ভেবে মাঝে মাঝে একটু কৌতুক মেশানো বিস্ময়ই আমার অনুভব করার কথা। এ পর্যন্ত কাজ-কর্ম চাকরি বাকরি আমি অনেক রকমই করেছি। তার মধ্যে একটি চাকরিই শুধু নিজের চেষ্টায় আদায় করেছি এক রকম নাছোড়বান্দা হয়ে। বাকি সব কাজ আমার কেমন করে যেন আপনা থেকেই অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত ভাবে জুটে গিয়েছে।

কিন্তু ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে চাকরি করা আমার ধাতে নেই। আমার বরাতেই

নিশ্চিত স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই বোধহয়। স্কুলের চাকরি আর টিউশনী, তুই-ই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেড়ে দিলাম।

শরীর খারাপ মনে করবার একটা বাতিক তখন পেয়ে বসেছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির যত কাছাকাছি সম্ভব সুদূর নির্জন বাসের একটা খেয়াল।

মুরলীদা ও শৈলজানন্দের সঙ্গে কল্লোলের সহযোগী আর এক রকম সম্পূরক হিসাবে কালিকলম পত্রিকাটির পরিকল্পনা তখন বাস্তব রূপ নিয়েছে। আমার ও অচিন্ত্যের 'বাঁকা লেখা' ও আমার 'পাঁক' উপন্যাসটি সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাদের ওপরকার সেই 'বরদা এজেন্সী'র স্বত্বাধিকারী শিশির নিয়োগী ভার নিয়েছেন কাগজটিব আর্থিক দিকটি সামলাবার। কল্লোল-এর মত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাদে কালিকলম-এর আড্ডাও তখন জমে উঠেছে। সেখানে যারা আসেন তাঁদের মধ্যে জাপান যাত্রার কাহিনী লিখে বিখ্যাত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্মরণীয় মানুষ। আসর জমাবার চুম্বক স্বরূপ এ রকম আরও বেশ কয়েকজন সেখানে সন্ধ্যায় জড়ো হন। আসেন শিল্পী চারু রায়। তখনও তিনি সেই আদিযুগের বাংলা ফিল্মের রাজ্যে পা বাড়ান নি। কালিকলম-এর মলাটের ছবি তাঁরই আঁকা। প্রমথ চৌধুরী মশাইও এক আধদিন সে আসরে এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের বিস্মিত কৃতার্থ করে দেন। রাজশেখর বসু সে আসরে কোনদিন আসেননি। নিজের বাড়িটি ছাড়া আর কোথাও কোন সাহিত্যের আড্ডাতেই তিনি কখনও যেতেন বলে আমার শোনা নেই। কিন্তু কালিকলম তখন তাঁরও অনুমোদন পেয়েছে। ও পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প 'পোনা ঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন বলে মুরলীদার মুখে শুনেছি তা তখন আমার কাছে আশাতীত।

কল্লোল-এর সঙ্গে কালিকলম তখন সত্যিই জমজমাট। নজরুল ইসলাম তো বটেই মোহিতলাল মজুমদারও তখন নিয়মিত কবিতা লিখছেন আমাদের কাগজে। কাশির মহেন্দ্র রায় সাহিত্য সমালোচনায় এক গভীর ও ব্যাপক বৈদগ্ধের সরসতা এনেছেন। জীবনানন্দ দাশ তখনও 'বনলতা সেন'-এর ঠিকানা পাননি। কিন্তু তাঁর তখনকার প্রায় সব লেখা 'কালিকলম'-এই ছাপা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নগ্নপদ পরনের ধুতির ওপর শুধু উত্তরীয় জড়ানো দেশ সেবাব্রতী সৌম্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর শুধু কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার সে আসরে মাঝে মাঝে হাজিরা দেন না, দু-একটি লেখাও সেখানে ছাপাতে দেন। কালি কলম-এর রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখেন নলিনী কিশোর গুহ। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ,

শ্রীঅরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ তখনকার সাহিত্য-মহারথী ও মনীষীদের সে রকম কোন লেখা কোথাও পেলে তা কালিকলম-এ সঙ্কলিত হত।

কালিকলমের আসরের তখনকার গণ্যমান্তেরা শুধু নয়, সে তুলনায় যাঁরা কিছুটা অজানা তাদের আকর্ষণও বড কম ছিল না। এঁদের মধ্যে একজন শশাঙ্ক চৌধুরী। শশাঙ্ক চৌধুরী পরে বাঙলার কথা দৈনিকের সাংবাদিক হয়ে আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিল, কিন্তু সেই কালিকলম-এর সূচনার দিনেও বরদা এজেন্সীর পাশের দোকান আর্য-পাবলিশিং হাউসের কর্মী হিসাবে কালিকলমের সান্ধ্য আসরে তাঁর স্বাভাবিক ও প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক উপস্থিতিটি তাঁর বিরল অথচ অমুপেক্ষণীয় দু চারটি তীক্ষ্ণ মন্তব্যের কৌতুক সরসতায় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ছিল।

উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবার ও টেনে বেঁধে রাখবার মত আরো অনেক কিছুই তখন কলকাতায় ছিল সত্যই। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ তখন সবে তৈরি হচ্ছে। তারই কেটে খুঁড়ে ছড়ানো ইট পাথর খোয়া পাথরকুচির বিশৃঙ্খলা পার হয়ে রহস্যময় চাঁনেপাড়ার ব্ল্যাকবার্ন লেন বা ছাতাওয়ালা গলির একটি রেস্তোরাঁ তখন আমরা কল্লোল কালিকলমের দল মিলে আবিষ্কার করেছি। সেখানে একটু ভয়, ভয়ের মৃদু উত্তেজনা নিয়ে যেতে হয় সন্ধ্যের পরে, তারপর চাবিধারে যেন এক অন্য অজানা জগতে পা দেওয়ার বিস্ময় নিয়ে একতলা একটা লম্বা ফালির মত দালান কোঠার কাঠের পার্টিশান দেওয়া কামরায় বসে যেন হঠাৎ রূপকথার রাজ্যের কোন হেঁসেলে পৌঁছানো যায়।

রূপকথার দেশের হেঁসেল আর যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণার নেমন্তন্ন বাড়ি। যেমন অপূর্ব রান্না তেমনি সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও ওখানে যেন প্রায় মিনিমাগ্না সব খাবার মেলে, মাত্র দশ আনায় এক পরাস্ত চূড করে বোঝাই ফ্রায়েড রাইস। আমাদের মত তিনজনে মিলে গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েও যা শেষ করা যায় না। আট আনায় মানে এখনকার পঞ্চাশ পয়সায় এক প্লেট চিকেন কারি, মাছের কারির প্লেট ছ' আনা, চিকেন কাটলেট এক প্লেটে দুটো আট আনা, চিংড়ির কাটলেট তিনটে আবার ছ' আনা। কোন রকমে গোটা পাঁচেক টাকা যোগাড করলে তিন-চারজনে মিলে বেশ পরমানন্দে একটা উপাদেয় ভোজ সেরে আসা যায়।

একা কখনো নয়, কল্লোল কালিকলমের এমনি তিন-চারজন মিলেই আমরা মাঝে মাঝে ছাতাওয়ালা গলির ভয়ের ছিটে-দেওয়া আধা রহস্যের পোঁচ বোলানো এলাকায় জিভের সাধ মেটাবার সঙ্গে স্থূলতম ভোজ্য-শিকারে যাই। বেশীর ভাগ

এ দলে থাকি অচিন্ত্য, আমি আর নৃপেন চ্যাটার্জি। তাছাড়া শৈলজানন্দ তো বটেই কল্লোল সম্পাদক দীনেশদা, বন্ধু ভূপতি চৌধুরী বা সোমনাথ সাহাও প্রায়ই সঙ্গী হয় আমাদের।

ব্ল্যাকবার্ন লেনের চীনেপাড়াব যে কোন হোটেল আমাদের এমন ভোজের স্বর্গ ছিল? না, এখন যে চীনে রেস্তোরার নাম সবাই-এর মুখে মুখে সে সব তো নয়ই, আদি কালের সেই ন্যানকিং চাঙ্গোযাও নয়। ন্যানকিং তখনও তৈরি হওয়াই শুরু হয়নি আর চাঙ্গোয়া তখন ওই ছাতাওয়ালা গলিরই খোলার চালের একটা পুরোপুরি চীনে রেস্তোরাঁ, যেখানে ঢোকবার কথা কখনো ভাবতে পারলেও সাহস আমাদের হত না।

আমাদের ভোজের স্বর্গের নাম ছিল ক্যান্‌টন রেস্তোরা। নতুন রাস্তা সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ খোলা হবার পর চাঙ্গোয়া প্রথম তার ধারে এসে রেস্তোরাঁ খোলার পর ছাতাওয়ালা গলির ক্যাণ্টন রেস্তোবা কি করে ক্রমশ কানা হয়ে গেল আর তার পরে চাঙ্গোয়ার দেখাদেখি সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এব ওপরই কাছাকাছি বেস্তোরাঁ তুলে নিয়ে এসেও সুবিধে কবতে না পেরে একদিন উঠে গেল, সে সব কথা লিখতে গেলে কলকাতাব চীনে হোটেলেব ইতিহাসই ঘাঁটতে হয়।

তার দরকার নেই। আমাদের সেই প্রথম যৌবনের দিনে কল্লোল কালিকলমের সাহিত্যের রাখী বাঁধা দলে নতুন আবিষ্কাব করা চীনে রেস্তোরাঁরও যে একটা বড আকর্ষণ ছিল সেইটুকুই শুধু জানাবার।

আব এক বড আকর্ষণ তখন হয়ে উঠেছিল দল বেধে খেলার মাঠে যাওয়া। ফুটবল খেলার মাঠে আমি আব অচিন্ত্য অবশ্য সাহিত্যের খাতায় নাম ওঠবার আগে থাকতে সেই স্কুলের দিন থেকেই যেতাম। আজকালকার মত একদিন দু'দিন আগে থাকতে না হোক বিকেলেব খেলার জন্যে সকালবেলা থেকে 'মা ফলেষু কদাচন' ভাবের মনটা তৈরি করবার চেষ্টা করে পদাতিক পুলিশের লাঠি আর সওয়াব পুলিশের ঘোড়ায় ক্ষুরে জখম হবার ঝক্কি নিযে লাইন দিয়েছি।

তখন আবার ঘেরা মাঠেব গেটে ঢোকবার সময় 'কিউ' দেবার কোন নিয়ম ছিল না। যেমন করে হোক গেটের কাছে পৌছে নিজেব ক্ষমতা আর ভাগ্যের জোরে গেটের কাঠেব দেওয়াল তোলা গলিতে ঢুকে টিকিট কাটা খোলা মাঠের গ্যালারিতে পৌছোবার।

ডারহ্যাম্‌স বলে এক নামজাদা দুর্ধর্ষ মিলিটারী গোরা টীমের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলার জন্যে সকাল থেকে হতাশ চেষ্টা করে শেযে শুধু ডিডের চাপেই শূন্যে হাত-

পা-ছাড়া অবস্থায় মাঠের গেটের সরু গলি দিয়ে ভেতরে ছিটকে ঢুকে যাওয়ার কথা মনে আছে। চোখ থেকে চশমাটা খুলে গিয়েছিল, কিন্তু মাটিতে পড়বার সুবিধে পায়নি, সামনে পিছনে আর দুপাশের গায়ে গায়ে চেপে থাকা জম্পেশ ভিড়ের নিরেট দেহ-পুঞ্জের ওপরেই পড়ে থেকেছে। সেখান থেকে শুধু তুলে নিয়ে চোখে পরে মাঠের ভেতর ঢুকতে পেরে দেখেছি চশমা জোড়া খোয়া না গেলেও একটি পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কোথায় কাঠের দেওয়ালের কোন পেরেকে বা ইসক্রুপে লেগে কেটে ওড়ান হয়ে গেছে। মাঠের নোংরা কাদামাখা পায়ে কি না কি পেরেকের চেরা ঘা। ভয়-ভাবনা হলেও করবার তো কিছু নেই, সেপটিক টিটেনাস বাঁচাতে আয়োডিনের জন্যে মাঠ থেকে এত কষ্টের সীট ছেড়ে তো উঠে যেতে পারি না। বুদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত সোডাওয়ালার কাছ থেকে এক বোতল লেমনেড কিনে তাই দিয়ে পা-টা কোন রকমে ধুয়ে খেলার জন্যে বসে থেকেছি সেই বেলা একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে অবধি। তা খেলা সকাল থেকে ভিড়ের গুঁতোগুঁতি খাওয়া আর পা কাটার দুঃখ ভোলাবার মতই হয়েছিল। মোহনবাগান ডারহ্যামস্‌কে দু দু গোলে হারিয়েছিল বলেই যেন মনে পড়ছে।

কল্লোল কালকলমের সময়ে খেলা দেখতে যাওয়ার আকর্ষণ আরো বেড়েছে দল বেঁধে যাওয়ার আনন্দে আর উৎসাহে। তখন মাঠের নিয়মকানুন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সময়মত যেতে পারলে কিউ এ দাঁড়িয়ে মাঠে ঢুকতে পাওয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ছেড়ে রাখতে হয় না। একসঙ্গে দল বেঁধে আমরা তাই সময় মত যাই। আমি আর অচিন্ত্য তো থাকিই। তাছাড়া নৃপেন চট্টোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্তী আর স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক রসের অফুরন্ত ফোয়ারা বিশুদা মানে বিশ্বপতি চৌধুরী। বয়সে আমাদের চেয়ে বেশ বড় হলেও প্রাণোচ্ছলতায় তিনি আমাদের সকলের ওপরে। মাঠে গ্যালারির যেখানে গিয়ে আমরা দল বেঁধে দাঁড়াই সে জায়গাটা সরগরম হয়ে ওঠে সরস টীকা-টিপ্পনী আর রসালো মন্তব্যের ফুলঝুরিতে। সে কৌতুক রসের পাল্লায় শিবরামও বড় কম যায় না। তার ঠিক জায়গামাফিক জুৎসই এক একটি কথার চিম্‌টি কাঁদুনের বদলে হাসানে গ্যাসের বোমা।

এ সব কিছুর আকর্ষণও কিন্তু হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল। কলকাতা আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারল না মনটাকে।

মন চায় সুদূর কোন নির্জনতার মধ্যে হারিয়ে থাকা।

কোথায় আর সে রকম নির্জনতা? ভাগ্যক্রমে তার সন্ধান মিলে গেল।

পাড়ার চণ্ডীদা, সীতারামদা আমাদের সকলেরই গুরুজনস্থানীয় শ্রদ্ধার পাত্র। শুনলাম রেলপথে সাঁওতাল পরগণার শেষ স্টেশন সুদূর ঝাঁঝায় তাঁদের বেশ কিছু জমি জায়গা আর বাড়ি আছে। একটি বড় বাড়ি আর সেই সঙ্গে বিস্তীর্ণ বাগান-ঘেরা এলাকার মধ্যে একটু বিচ্ছিন্ন ভাবে আর একটি ছোট দু-কামরার দালান বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছিল। তখন ও অঞ্চলে মাইকা অর্থাৎ অভ্রের খনি কিনে সে ব্যবসায় বাংলাদেশের অনেকে খুব উৎসাহী হয়েছিলেন। মাইকার ব্যবসায় কিন্তু প্রায় সবাই ফেল মেরে সেখানে থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। চণ্ডীদাদের পরিবারের ব্যবসারও সেই গতি হলেও জায়গাটার সঙ্গে তাঁরা সব সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়ে আসতে পারেননি। তাঁদের এক কালের বিফল উদ্যমের সাক্ষীস্বরূপ ওই বাগান-ঘেরা বাড়িটি তখনও টিকে আছে। বাজার অতি মন্দা। ও অঞ্চলে তখন ও রকম একটা সম্পত্তি কেনবার মত খরিদ্দারই কেউ নেই। সেই জন্যেই অবশ্য বাড়িটা তাঁদের হাতছাড়া হয়নি। তাঁরা সেটা রেখেছেন ছুটিছাটায় চেঞ্জে যাবার একটা আস্তানা হিসাবে। সারা বছর বাড়ি জমি ও বাগান একজন চৌকিদারের হেফাজতে থাকে।

আমি যা খুঁজছিলাম বাড়িটা সেদিক দিয়ে আমার আশারও অতিরিক্ত। নির্জনবাস নয়, বাড়িটার যা ঠিকানা তাতে সেখানে সত্যিকার স্বেচ্ছা নির্বাসনেই থাকতে হবে। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের ঝাঁঝা স্টেশনে নেমে প্রায় মাইল দুয়েক রাস্তায় শহরের গণ্ডি ছাড়ালে একটি বড় নদী সামনে পড়ে। সে নদী পার হয়ে আরো মাইল তিনেক এগোবার পর আর একটি ছোট পাহাড়ী নদী পথ আটকায়। সে নদীও পার হয়ে কিছুটা গেলেই সামনের উঁচু জমির ওপর চারদিকে নিচু দেয়াল ঘেরা বাগানের জমির মাঝখানে ছোট দু' কামরার একটি দালান আর বড় বাড়িটি দেখা যায়। বাড়ি দুটি একেবারে নিঃসঙ্গ ; যে দিকেই তাকাও একটা গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

চোখে না দেখলেও শুধু বর্ণনা শুনেই বড় বাড়িটি নয় তার লাগাও ছোট দালানটি আমি সামান্য ভাড়ায় এক বছরের জন্যে লীজ নিয়েছিলাম। একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে ঝাঁঝার টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসলাম। তল্পি-তল্পা বলতে মালপত্রের এমন কিছু লটবহর নয়। একটি শুধু টিনের তোরঙ্গই, তার মধ্যে ওজনে যেমন ভারী আমার কাছে তেমনি চোখে চোখে রাখবার মত সাত রাজার ধন। সে তোরঙ্গটি শুধু বইএ ঠাসা। ঝাঁঝার নির্জন বাসে যাবার জন্যে তখনকার দিনের পুরো একশোটি টাকার বই কিনে তার মধ্যে ভরেছি।

কোন্ ট্রেনে মনে নেই, ঝাঁঝা স্টেশনে দুপুরের দিকেই নেমেছিলাম। সেখান থেকে গরুর গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে ঢিকোতে ঢিকোতে দুটি নদী পেরিয়ে আমার ঠিকানায় যখন পৌঁছেছিলাম তখন সন্ধ্যা নামতে আর দেরী নেই। আমায় অভ্যর্থনা করে ঘর দোর খুলে দেখিয়ে দেবার জন্যে ও বাড়ির চৌকিদার একটি কেরাসিনের লণ্ঠন নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। শক্ত সমর্থ মাঝবয়সী মানুষ। নাম তার ক্ষীরু মিঞা। ক্ষীরু মিঞা আরো মাইল চারেক দূরের শালবনের ওপারের একটি গ্রামে থাকে। গ্রামের নাম বকব্রহ্মনিয়া। ক্ষীরু মিঞা যখন ঘর দোর খুলে আমার জিনিসপত্র গরুর গাড়ি থেকে তুলছে আমি তখন ছোট বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছি। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। যেদিকে চাই আকাশের ক'টি তারা ছাড়া দূরে দরান্তরে কোথাও একটা আলোর বিন্দুও নেই।

॥ পঁচিশ ॥

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাঁঝার নতুন ভাড়া করা বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আভাসে যা অনুভব করেছিলাম পরের দিন ভোর হবার পর সেই দিগন্তবিস্তৃত নির্জনতার পরিপূর্ণ ভাবে পরিচয় পেলাম।

যেদিকে চাই সত্যিই যেন জনমানব কোথাও নেই। যে উঁচু ডাঙা জমিটার ওপর বাড়ির মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের ও আমার সদ্য ভাড়া করা বাড়ি দুটি দাঁড়িয়ে একদিকে তা ছোট একটি পাহাড়ী নদীতে নেমে গেছে। নদী মানে অবশ্য দুদিকের পাথুরে পাড়ের মাঝে বড় জোর কুড়ি পঁচিশ হাত চওড়া বালির বিছানার ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা ক্ষীণ একটি রূপোলী জলের ধারা। এ জলের ধারা কাছাকাছি অঞ্চলে বৃষ্টি নামবার পর কিছুক্ষণের জন্যে অবশ্য ফুলে ফেঁপে বেশ প্রবল গিরিমাটি রঙের ঘোলাটে জলের স্রোত হয়ে ওঠে। কিন্তু সময়টা বর্ষার শেষ হলেও আগের দিন এ বাড়িতে আসার পথে যখন পার হয়েছি তখন কোথাও হাঁটু জলও পাইনি।

এ নদী পার হয়ে রাঙামাটির পথটা মাইল তিনেক পরে শহরে যাবার পথে পার হবার বড় নদীতে পড়েছে। আমার বাসাটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে রকম কোন হদিশ কিন্তু পাওয়া যায় না। বিরল গাছপালা ছড়ানো রাঙা মাটির পার্বত্য প্রান্তরের মধ্যে পথটা যেন নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেছে।

পথটা শহরের দিকে গেলেও এক হাটবারে ছাড়া সারা দিনে রাতে এক-আধটা গরুর গাড়ি কি দু-চারটে মানুষও তাতে দেখা যেত না। আমাদের বাড়িটা ছাড়িয়ে পথটা পশ্চিম দিকে একটা শালের জঙ্গলের ভেতর গিয়ে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। পরে জেনেছিলাম যে সেই জঙ্গলের ওপারেই ক্ষীরু মিঞাদের রকত্রহনিয়া গ্রাম। খবরটা জানা না থাকলে জঙ্গলটা যেন অশেষ বলেই মনে হয়।

উত্তর দিকে চাইলে দূরে এক সার গাঢ় ধোঁয়াটে রঙের পাহাড় দেখা যায়। তখনকার দিনেই যা বিরল হয়ে এসেছে সেই সত্যিকার বন্য এক সাঁওতাল দল সেখানে থাকে বলে পরে জেনেছিলাম। একবার সেই সাঁওতালদের দলকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্যও হয়েছিল। সেদিন তারা তাদের বাৎসরিক শিকার উৎসবে বেরিয়ে আমার বাসার আশেপাশের অরণ্য প্রান্তরেই সারাদিন শিকার ও বনভোজনে কাটিয়েছিল।

পূর্ব পশ্চিম উত্তরের মত দক্ষিণ দিকও শুধু জনমানবহীন পার্বত্য প্রকৃতির রাজ্য

লতে গিয়ে একটু থামতে হচ্ছে। আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকের ছোট নদীটি দক্ষিণ মুখেই আঁকাবাঁকা খাতে বয়ে গিয়ে দূরের ছোট জংলা টিলার মাঝে যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার বারান্দা থেকে সোজা দক্ষিণে চাইলে মাইল খানেক দূরে নদীর খাতটির ওপরে একটা লম্বা বাঁশের ডগার ওপরে নীল একটা তেকোণা পতাকা চোখের জোর থাকলে দেখা যায়। সেই পতাকাটিতেই ওদিকের নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা ক্ষুণ্ণ।

পরে জেনেছি সেই পতাকাটির নীচে ঝাড়-ফুঁক গোছের মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ এক গুণীন ওঝা কুটির বেঁধে থাকে। ঝাঝায় থাকবার সময়ে মাত্র একবারই তাকে চোখে দেখেছি, কিন্তু সেখানকার বিশাল নির্জনতার মধ্যে সেই আমার একমাত্র প্রতিবেশী না হলে আর মাত্র একবারের জন্যেই পরস্পরের কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎ না পেলে আমার ঝাঝা-প্রবাসের স্মৃতি কি তিক্ত করুণ যে হতে পারত তা ভাবলে ওই গুণীন ওঝার সঙ্গে কয়েক মিনিটের যোগাযোগ প্রায় অলৌকিক দৈব ঘটনাই বলতে ইচ্ছে করে। সে সাক্ষাতের কথা যথাস্থানে বলছি।

ঝাঝায় সেই প্রথম দিন ভোরের আলোয় চারিদিকে যে বিশাল নির্জনতা দেখেছিলাম এখনকার দিন হলে তাতে বোধহয় একটু অস্বস্তিই অনুভব করতাম। কিন্তু সময় ছিল তখন আলাদা, সে বয়সের মনটাও ছিল তখন অন্য রকম। অস্বস্তির বদলে একটা গভীর পরিতৃপ্তিতেই মনটা ভরে গেছে। সেই সঙ্গে এমন নির্জনতার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখার সম্ভাবনায় একটা উত্তেজনা মেশানো ঔৎসুক্যও অনুভব করেছি।

এই নির্জনতার মধ্যে ছ'মাস কাটাব বলে গিয়েছিলাম। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুরো ছ' মাস অবশ্য থাকিনি। মাঝে একবারের জন্যে সেখান থেকে কিছুদিনের মত বাইরে গিয়েছিলাম। তবে কলকাতায় ফিরে যাইনি, গিয়েছিলাম বারাণসীতে। দীর্ঘ ছ' মাসের বাকি সমস্ত দিনগুলোই ওই নির্জন বাড়িতেই কাটিয়েছি।

তখনকার সে দিনগুলোর কথা ভাবতে ভালও যেমন লাগে, তেমনি অবাকও হই। একেবারে সম্পূর্ণ একা অবশ্য ওখানে ছিলাম না। নাতির এ খামখেয়ালে সায় না থাকলেও দিদিমা আমায় একলা ছেড়ে দিতে পারেননি। কাশীবাস করব বলে কয়েকবার শাসিয়েও শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই এসে উঠেছিলেন।

সারাদিন সারারাত কি করতাম সেই নিঃসঙ্গ নির্জনতায়? কথা বলবার মানুষ তো শুধু দিদিমা আর সারাদিন যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ ক্ষীরু মিঞা। আর সময় কাটাবার সম্বল আমার বাক্স ভরা বই। শুধু তাই নিয়েই অনেকদিন অবশ্য কাটিয়েছি।

বই পড়েছি, ক্ষীরু মিঞার সঙ্গে গল্প করে তাদেব গ্রাম আর ও অঞ্চল সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব জানবার চেষ্টা করেছি, একা এদিক ওদিক জঙ্গলে প্রান্তরে ঘুরে গাছপালা পাখি দেখেছি। কিন্তু দিনেব পর দিন ঠিক এইভাবে কাটছিল। প্রথমে বেশ কিছুদিন বাইবের জগতেব খববাখবর বাখাব কেন আগ্রহই জাগেনি। তারপর খববেব কাগজের অভাব মনটাকে চঞ্চল করেছে কিন্তু খববের কাগজ কোথায় পাব সেই নির্বাসনের রাজ্যে? সেখানে দিনেব দরকারী বাজাবেব জিনিসই কাছেপিঠে পাওয়া যায় না। হাটবাবে দূর গ্রামেব হাটুবেদেব কারুর কারুর কাছে দু-একটা তরিতবকারি ছাড়া মাছ মাংস আনাজ তো বটেই চাল তেল নুনেব জন্যেও সেই পাঁচ মাইল দবের শহরে নিজেকে যেতে বা ক্ষীরু মিঞাকে পাঠাতে হয। খবরের কাগজ পেতে সেখ নেই যেতে হবে।

কিছুকাল বাদে দুটো নদী পেরিযে পাঁচ মাইল হেটে তাই গিয়েছি একদিন। একদিনটা ক্রমশ প্রায় দিনের পর দিন হযে উঠেছে। যেতে আসতে দশ মাইল হাঁটাটা গাযেই লাগেনি। সে বযসে সেইটেই নেশা হয়ে দাড়িয়েছে।

দিনেব পর দিন যেতে যেতে স্টেশনেব কাছে যে স্টেশনারী দোকান থেকে খবরেব কাগজ নিতাম তাব লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে। কোথায় থাকি আর কোথা থেকে কাগজ নিতে আসি জেনে তাঁরা অবাক। অবাক যাওযায আসায পাঁচ মাইল করে হাটাব জন্য নয়, জনমানবহীন ওই সুদূব নির্বাসনেব রাজ্যে অমন একলা থাকার সাহসে।

আপনাব ভয় করে না মশাই? জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁরা।

ভয়? না ভয় কববে কেন। একটু বাহাদুবীব স্বরে কথাটা বললেও ভয় না পাবার কাবণটাও তাদের জানিয়েছি।

বলেছি, ভয তো চোর ডাকাতেব? তা উদোম তেপান্তবের মাঝখানে যা ধন-দৌলত নিয়ে আমি থাকি দূর গাঁ কি শহর থেকে অমন পাঁচ দশ ক্রোশ রাস্তা ভেঙে তা নিতে আসাব মজুবি পোষাবে কি। তা ছাড়া এ অঞ্চলে মানুষেব কি ভূতের ভয় তা তো জানেন। চুরি কবতে বেরুবে কি, সন্ধ্যে হতে না হতেই তো ভূতের ভয়ে ঘরে ঢুকে দরজা জানলায় হুড়কো দিয়ে থাকে।

এ অঞ্চলের মানুষের ভূতের ভয়ের কথা ক্ষীরু মিঞার কাছে আমার শোনা। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ স্বরূপ সূয ডোবার পব আমার বাড়িব সামনের রাস্তায় একলা একটা মানুষকে যেতে আমিও কখনও দেখিনি। হাটবারের দিন সন্ধ্যের পরে কিছু মানুষজনের সাড়া সে রাস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হাটের জন্য

দেরী হওয়ার দরুন নিরুপায় হয়ে যারা তখন সে পথে যায়, দল বেঁধে ছাড়া এক পা তারা কখনো বাড়ায় না।

আমার কথা শুনে দোকানের সবাই সায় দিয়ে হেসেছেন ঠিকই, কিন্তু একটা যে খবর দিয়েছেন তা বেশ একটু বিচলিত করবার মতই। তাঁরা জানিয়েছেন যে কিছুদিন থেকে শহরের নানা জায়গায় খুব বিশ্রী ধরনের চুরি হচ্ছে। গৃহস্থের অসাবধানতার সুবিধে নিয়ে দু-একটা জিনিস তুলে নিয়ে যাওয়ার ছিচকে চুরি টুরি নয়, রীতিমত সিঁধ কেটে চুরি। এ অঞ্চলের লোকজন ভীতু হতে পারে, কিন্তু বাইরে থেকে চোর আমদানির বাধাটা কোথায় এই যুক্তি দিয়ে তাঁরা বললেন, শহরের মধ্যে পুলিশের নাকের ডগায় যারা সিঁধ কেটে চুরি করছে, আমার ওই নির্জন বাসার খবর পেলে তাদের একবার হানা দিয়ে দেখা স্বাভাবিক নয় কি? আমার ধনদৌলত কিছু আছে কি নেই তা জানবার জন্যেও অমন সোজা শিকারের সুযোগ কি তারা ছেড়ে দেবে।

শহরের স্টেশনারি দোকান থেকে সাবধান-বাণী আর ও নিজন বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ কোথাও গিয়ে থাকার পরামর্শ শুনে, সেদিন বেশ একটু দুশ্চিন্তা নিয়েই বাসায় ফিরেছিলাম। সত্যিই আমার এই তেপান্তরের নিজন বাস কোন দিক দিয়েই নিরাপদ তো নয়। ক্ষীক মিএা তো সন্ধ্যে হবার আগেই জঙ্গলের ওপারে তার গ্রামে চলে যায়। হাজার বখশিস্ দিলেও সে আমায় পাহারা দেবার জন্যে রাত্রে যে এখানে থাকবে না ত তার কথায় আমি আগেই জেনেছি। চুরি করার মজুরি পোষাবার মত কিছু সম্বল আমার নেই চোর না আসার পক্ষে এ যুক্তিও আমার অচল। শহরে যারা চুরি করছে তারা তাদের গোপন টহলদারিতে আমার এ নির্জন বাসার খবর ইতিমধ্যেই নিশ্চয় পেয়েছে। কি পায় না পায় দেখবার জন্যেই তাদের একবার হানা দিয়ে দেখতে বাধাটা কি!

সিঁধ কাটবারও দরকার নেই। সোজাসুজি জন দুই দুশমন আমার দরজায় এসে ধাক্কা দিয়ে খোলাতে চাইলে আমি কি একলা তাদের ঠেকাতে পারব! উঠোনের খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রতিবেশী কাউকে যে ডাকব তারও উপায় নেই। আমার প্রতিবেশী বলতে তো দূরে নদীর ওপারের নীল পতাকা ওড়ানো আস্তানার সেই গুণীন ওঝা। নিশুতি রাতে আমার ডাক যদি বা তার কুঁড়ে পর্যন্ত পৌঁছায় কি দায় পড়েছে তার আমার সাহায্যে আসার!

এর মধ্যে একদিন সে অবশ্য তার বাসা থেকে ছুটতে ছুটতে আমার কাছেই এসেছিল। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর শীতের রোদে একটা ব্যাংভাসের

ডেকচেয়ারে বসে আমি একটা ইতিহাসের বইই যেন পড়ছিলাম বলে মনে আছে। হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি ছোট নদীটা পার হয়ে মাথায় অদ্ভুত ধরনের ফেট্টি বাঁধা লম্বা পাকানো চেহারার একটি লোক 'বাবু!' 'বাবু!' বলে চিৎকার করতে করতে আমার বাসার দিকেই ছুটে আসছে।

অবাক হয়ে আমি তখন ডেকচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। লোকটা রাস্তার দিকের বাগানের গেটটা খুলে অপ্রকৃতিস্থের মত ছুটে এসে মাটিতে বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, আমি গুণীন ওঝা বাবু, নদীর ওপারে ওই নিশানওয়ালা ঝোপড়িতে থাকি। আমায় বিচ্ছুতে কেটেছে বাবু, আমাকে বাঁচান।

বিচ্ছুতে কেটেছে মানে তো কাঁকড়াবিছেতে কামড়েছে। এখানকার পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে সাংঘাতিক বলেই শুনেছি। কিন্তু তার কামড়ের আমি কি প্রতিকার করব?

খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ অনেক দিন আগের একটা শোনা কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় কাশীতে থাকবার সময় কথাটা শুনেছিলাম। আর কিছু না থাকলে শুধু কেরোসিন তেল লাগিয়ে কামড়ের জায়গায় ঘষলে নাকি কাঁকড়াবিছের বিষের যন্ত্রণা চলে যায়। শোনা কথাটা ঠিক না বেঠিক তার যাচাই অবশ্য আমার অভিজ্ঞতায় হয়নি, কিন্তু ঠিক বেঠিক যা-ই হোক তখন ওই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ বাড়ির ভেতর থেকে কেরোসিনের বোতলটা এনে ছিপি খুলে তার পায়ের কামড়ের জায়গাটার ওপর ঢেলে সেখানে বসে পড়ে হাত দিয়ে ঘষতে শুরু করলাম।

ওষুধ হিসেবে কেরোসিন তেল ঢালায় কি তার পায়ে আমার হাত লাগানোতে জানি না, প্রথমে একবার সে সঙ্কুচিত হয়ে পা টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও পরে নিরুপায় হয়েই বোধহয় আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে।

বিচ্ছু বা বিছের কামড়ে কেরোসিন তেলের সত্যি কোন উপকার আছে কি না আজও নিশ্চিত করে জানি না। সেদিন খানিকটা মালিশের পরই কিন্তু গুণীন ওঝা যেন কৃতার্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিল যে, তার পায়ের যন্ত্রণা প্রায় সেরে গেছে, এরপর উপযুক্ত কাউকে দিয়ে একটু ঝাড়ফুঁক করিয়ে নিলেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবে।

নিজের টোটকা দাওয়াইয়ের আশাতীত সাফল্যে আমি নিজেই তখন একটু বিহ্বল। সে অবস্থাতেও গুণীন ওঝার আর কাউকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হবার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি নিজেই তো গুণীন ওঝা, তুমি আর কাউকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করাবে কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে গুণীন আমায বুঝিয়ে দিযেছিল যে যত বড গুণীনই হোক নিজের বেলায নিজের ঝাড়ফুঁক খাটে না। অন্য কাউকে দিয়ে তাই সে কাজ করাতে হয।

ঝাড়ফুঁকের এ রহস্য তত্ত্ব জানাবার পর বারকয়েক আমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সামান্য একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গুণীন নদী পার হযে তার আস্তানার দিকে চলে গিযেছিল।

এ ঘটনার পর সে আর কখনও আমার কাছে আসেনি, অন্য কোথাও তার দেখাও কোন দিন পাইনি।

বাকড়াবিছের কামড়ের ওই ঘটনায় আমার কেরোসিন তেল লাগানোর জন্যে সত্যিকার কোন কৃতজ্ঞতা যদি তার থাকেও চোরের উৎপাত ঠেকাতে তার কাছে সাহায্য পাওয়ার আশা নেহাত দুরাশা বলে বুঝলেও কোন নিরাপদতর বাসার সন্ধান কিন্তু তারপর করিনি। ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোর ডাকাতের পক্ষে লোভনীয় ওই বাসাতেই থেকেছি।

আশ্চর্যের কথা শহরে পর পর আরও বহু বাড়িতে সিঁধ-কাটা চুরির ঘটনা ঘটলেও আমি সম্পূর্ণ নিরাপদেই থেকেছি।

তারপর একদিন অবাক হয়েছি আমার সেই নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার রাজ্যে দলে দলে পুলিশের আবির্ভাব দেখে। চারিদিকের নদী মাঠ বনে ছড়িয়ে গিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত গুণীন ওঝার আস্তানাটাই ঘেরাও করেছে।

ক্ষীরু মিঞার কাছে তারপর এ ব্যাপারের পাকা খবর জানতে পেরেছি। শহরে এ পর্যন্ত যে সব চুরি হয়েছে সে সবের সিঁদেল সর্দার নাকি ওই গুণীন ওঝা। গুণীন ওঝা হিসাবে তার নদীর ধারের এই নির্জন আস্তানাটিই নাকি সব চোরাই মাল মজুতের ঘাঁটি।

গুণীন ওঝাই যদি শহরের সমস্ত চুরির নায়ক হয়, তাহলে হাতের কাছে আমার মত অসহায় মানুষকে সে রেহাই দিয়েছে কেন? এ কি সেদিনের সেই কেরোসিন তেল দিয়ে তার বিছে কাটার যন্ত্রণা সারাবার চেষ্টার প্রতিদান?

তা ছাড়া গুণীনের আশাতীত উদারতার আর কোন ব্যাখ্যা তো পাই না।

ঝাঁঝার চোরের সর্দার হিসেবে গুণীন ওঝা ধরা পড়বার পর আগের চেয়ে নিশ্চিন্তেই সেখানে আরও বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি। পড়াশুনা আর প্রকৃতির অখণ্ড নির্জনতা উপভোগ ছাড়া আর কিছু যে তখন করিনি এমন নয়।

'কালিকলম' পত্রিকাটি তখন সগৌরবেই মুরলীদা, শৈলজানন্দ আর আমার নাম সম্পাদক হিসেবে নিয়ে বার হচ্ছে। সম্পাদনার কোন দায়িত্ব পালন না

করলেও প্রায় নিয়মিত ভাবেই কবিতা গল্প আলোচনা ইত্যাদি সব রকম লেখা তাতে পাঠিয়েছি। মনে পড়ছে যে কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে 'অসংলগ্ন' নামে নানা বিষয় নিয়ে চুটকি আলোচনা কালি কলম-এই প্রথম আরম্ভ করি। পোনাঘাট পেরিয়ে, ভবিষ্যতেব ভাব, পুন্নাম ইত্যাদি গল্পও কালি কলম-এই বার হয়। অত্যন্ত অসাবধান অগোছাল স্বভাব বলে তখনকার চিঠিপত্র কিছু জমিয়ে রাখতে পারিনি। সে সব চিঠিপত্রের কিছু থাকলে আর কারুর না হোক মুবলীদা অর্থাৎ কালি কলমের অন্যতম সম্পাদক মুবলীধব বসুর গভীর সাহিত্যবোধ আর জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কিছু পবিচয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পারতাম।

প্রায বনবাসেব স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে আমার স্বভাবগত দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও কালি কলম-এ যে প্রায মাসে মাসেই লেখা পাঠাতে পেরেছি সে শুধু মুরলীদারই তাগিদে। কালি কলম শেষ পর্যন্ত যে চলেছে তা শুধু ববদা এজেন্সিব মালিক স্বর্গত শিশির নিযোগী আব মুবলীদাব সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত চেষ্টায়। আমিও প্রথম কিছুদিন বাদেই বৎসরাধিক কাল কলকাতার বাইরের দূর প্রবাসে কাটিয়েছি। কালি কলম-এ ওই ক'টি লেখা দিযে সে কারণে প্রায় পুরো একটি বছব কল্লোল-এ কোন লেখা পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমার মত প্রবাসী না হলেও শৈলজানন্দও কালি কলম-এব সম্পাদনাব ভার এমন কিছু নিযেছে বলে জানি না। লাভ লোকসানের হিসাব না করে পত্রিকাটি চালাবার সম্পূর্ণ রসদ যুগিযেছেন শিশির নিযোগী আর একান্ত নিষ্ঠায সেটিকে সার্থক একটি সাহিত্য পত্রিকা কবে তুলবাব সাধনা করে গেছেন মুরলীদা।

মুরলীধর বসুর মত মানুষের নাম সাহিত্যের ইতিহাসের কোন পাতার কোণে কোথাও থাকবে কিনা জানি না কিন্তু সামনের দৃষ্টি-কেড়ে রাখা সমারোহের নেপথ্যে এদের নীরব সমর্পিত সেবার কোন স্বীকৃতি না দেওয়াও অক্ষমণীয় অকৃতজ্ঞতা বলে মনে হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী আরো আশ্চয একজনের সঙ্গে যে পরিচিত হব তা তখন ভাবতেও পারিনি।

ঝাঝায় মাস তিনেক তখন কেটে গেছে। ছ'মাসের বাকি তিন মাস ওই ভাবেই হয়তো কাটিয়ে দিতাম কিন্তু হঠাৎ বারাণসী থেকে প্রফুল্ল আর কেদারেব একসঙ্গে লেখা একটা চিঠি পেলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি—'কালি কলম অফিস থেকে তোমার ঠিকানা জোগাড করেছি। পত্রপাঠ চলে এসো। আনন্দ সুন্দর ঠাকুরের দেখা পাবে। তিনি এখানে আছেন।'

আজকের দিনে আনন্দ সুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে প্রফুল্ল আর কেদারের একটু পরিচয় আগে দিতে হবে। 'আনন্দ সুন্দর ঠাকুর' নামটা এখনকার সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকও বেশী কেউ জানেন বলে মনে হয় না। নামটা ছদ্মনাম। ওই নামে তখনকার দিনে কিছু সাহিত্যের বিষয় নিয়ে লেখা বিদগ্ধ আলোচনা চিন্তার মৌলিকতা আর ভাষার একটা বিরল পরিচ্ছন্ন মাধুর্যের জন্যে আমাদের বয়সী অনেকেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আনন্দ ঠাকুর যে ছদ্মনাম তা তখনও ঠিক জানি না। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার উৎসাহেই কিছু দিনের জন্যে কাশী ঘুরে আসব বলে ঠিক করে ফেললাম।

ওই আনন্দ সুন্দর ঠাকুরের যেমন, প্রফুল্ল আর কেদারের পরিচয়গুলোও তেমনি দরকার। প্রফুল্ল মানে প্রফুল্ল চক্রবর্তী আর কেদার হল কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় —দুজনেই কাশীর ছেলে। কলম চালানো লেখক বলতে যা বোঝায় তা তারা কেউ নয়, কোথাও কোন কিছু তারা লেখে না কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যই তাদের ধ্যান-জ্ঞান আর নেশা বলা চলে।

আমার সঙ্গে তাদের আলাপও অদ্ভুত ভাবে প্রথমে শুধু চিঠির মাধ্যমেই হয়েছিল। সংহতির পর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নব পর্যায়ের বিজলীতে আমার পাঁক উপন্যাসটি বার হবার পর যে ক'টি চিঠি পেয়েছিলাম তার মধ্যে দুটি চিঠি বিশেষ ভাবে মনে লেগেছিল। তার একটি তখনকার দিনেই বেশ খ্যাতিমান —শিবরাম চক্রবর্তীর।

শিবরামকে তখনও আমি চোখে দেখিনি। সাহিত্য মহলের অনেকের মুখে তার খ্যাতি অখ্যাতি দুইই শুনেছি। মানুষ ও চুম্বন নামে তার দুটি কবিতার বই লেখার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নামের অভিনবত্বেও তখন বেশ কিছুটা চমক লাগিয়েছে। শিবরামের পোস্টকার্ডে লেখা চিঠিটি তারই উপযুক্ত একেবারে মার্কামারা শিবরামীয়। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও, সেই চিঠির ভেতরই লেখকের অনেকটা আদল যেন আমি পেয়েছি। শিবরাম চিঠিতে পাঁক-এর লেখক হিসেবে আমায় আকাশে তুলে আমার সম্বন্ধে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যার আতিশয্যে পরিহাস ভেবে রাগ করার বদলে কৌতুকই বোধ করেছি।

দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিল কাশী থেকে সম্পূর্ণ অজানা দুজন। সে চিঠিও কেদার আর প্রফুল্ল, দুজনের একসঙ্গে লেখা। পাঠকের প্রশংসা ভরা চিঠি সেই সময়েই দু-একটা পাইনি এমন নয়, কিন্তু কাশীর এ চিঠিটির জাতই যে আলাদা তা একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা গেছল।

গদগদ উচ্ছ্বাস তো নয়ই সে চিঠিতে কোন সাহিত্যিকপনার চেষ্টাও ছিল না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত চিঠির সংযত ভাষার মধ্যে এমন একটু আন্তরিকতা ছিল যা এ ধরনের চিঠিতে সম্পূর্ণ বিরল। পত্রদাতারা কাশীনিবাসী জেনে বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার কাশীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা তাদেরও জানা দেখেছিলাম। 'কাশীই আপনার জন্মস্থান বলে শুনেছি,' তারা লিখেছিল, 'কাশীতে যদি ইতিমধ্যে কখনো আসেন আমাদের জানালে আমরা খুশি হয়ে দেখা করতে পারি।' দুজনের কোন একজনের যে ঠিকানা ওপরে দেওয়া ছিল তা থেকে বুঝেছিলাম কাশীতে সে বাড়ি আমার বাড়ি থেকে খুব দূর নয়।

কাশীতে যাবার আগে কলকাতাতেই তারপর আলাপ হয়েছিল প্রথমে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সঙ্গে, তারপর কাশীতে একবার বেড়াতে গিয়ে কেদারের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। সমবয়সী আর সেই সঙ্গে মনের দিক দিয়ে অনেক মিল থাকার জন্যে দুজনের সঙ্গেই এমন একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল যা লেখক পাঠকের সম্বন্ধের চেয়ে অনেক গভীর ও অকৃত্রিম।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী আর সেই কেদার এখনো কাশীতেই থাকে। দুজনের কেউই কলম চালিয়ে লেখক হবার চেষ্টা কখনও করেনি, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত ব্যাপক পড়াশোনার সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে শুধু নয় জীবনবোধের এমন গভীরতা আমি খুব কমজনের ভেতরই দেখেছি।

অন্য কারুর কাছ থেকে নয়, এই প্রফুল্ল আর কেদারের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে দিদিমাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজী করিয়ে একদিন কাশী রওনা হয়ে গেলাম।

কাশীতে থাকবার জায়গার আমার তখন অভাব নেই। পাঁচের বারো আউধগরবি বাড়িটার বেশীর ভাগ ভাড়া দিলেও একতলায় একটা আর তেতলার একটা ঘর তখন নিজেদের জন্যে বন্ধ রাখা থাকত।

সেই বাড়িতে গিয়ে তেতলার ছোট ঘরটি খুলিয়ে সেখানে উঠে বিকেল বেলাতেই কেদার আর প্রফুল্লর নির্দেশমত দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। কেদার আর প্রফুল্ল দুজনেই সেখানে তখন উপস্থিত। শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। তখনও ঘাটগুলির ওপর জোরালো ইলেকট্রিক আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটা আবছা অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে থাকত। সেই অন্ধকারে রীতিমত কৌতূহল নিয়ে প্রফুল্ল আর কেদারের সঙ্গে ঘাটের ধারের নির্দিষ্ট একটি বুরুজে গিয়ে অপেক্ষা করলাম। আনন্দ সুন্দর ঠাকুর সেখানেই প্রতিদিন আসেন। সেদিনও আসবেন।

যথাসময়ে আনন্দ সুন্দর ঠাকুর এলেন। একলা নয় সঙ্গে তাঁর আর একজন। আনন্দ সুন্দর ঠাকুর যাঁর ছদ্মনাম সেই প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই-এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ভারী চমৎকার মানুষ। যেমন তাঁর লেখা, মানুষটিও তিনি তেমনি। সুগৌর নাতিদীর্ঘ ছিমছাম একটু কোমল গোছের চেহারা। কথাবার্তা সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত। প্রায় এক ঘণ্টা বুরুজের ওপর আমাদের আড্ডায় যে সব আলাপ আলোচনা হল তাতে আনন্দ সুন্দর ঠাকুরকে ভালই লাগল।

কিন্তু তাঁকে যদি খুব ভাল লেগে থাকে, তাঁর সঙ্গীটিকে দেখে আর তাঁর কথাবার্তা শুনে আমি তখন রীতিমত বিস্মিত, বিহ্বল। মাথায় লম্বা বাবরি চুল, একটা হাতকাটা ফতুয়া, মোটা ধুতি আর পায়ে চপ্পল পরা বাঙালীর পোশাকে ছ'ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে সবল পাঠান চেহারায় প্রকাণ্ড একটি নস্যির টিন হাতে এই আশ্চর্য মানুষটি কে?

॥ ছাব্বিশ ॥

আনন্দ সুন্দর ঠাকুরের নামের টানে কাশীতে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেও সম্পূর্ণ অজানা। আর যে মানুষটি সামান্য কিছুক্ষণের পরিচয়ে আমায় গভীর ভাবে বিস্মিত বিহ্বল করেছিলেন সেই আশ্চর্য মানুষটির সাহচর্য সেই রাত্রেই আর একটু পাওয়ার সুবিধা হল।

আমার বন্ধুরা ও প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় দশাশ্বমেধের কাছাকাছি থাকেন। আমায় যেতে হবে আরো বেশ একটু দূরে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে। সেখানে একলা কিন্তু যেতে হল না। খানিক পথে দেখি সেই আশ্চর্য মানুষটিই আমার সঙ্গ হয়েছেন। আমার যেখানে বাড়ি তিনিও সেখানে থাকেন। আমার বাড়িটা হরিশ্চন্দ্র ঘাট রোডের দক্ষিণে প্রায় তার গায়েই, আর তার বাড়িটা উত্তরের মহল্লার একটু ভেতরে— এই যা তফাত।

গঙ্গার ঘাটের বুরুজের ওপরকার স্বল্পক্ষণের আড্ডায় মানুষটি সম্বন্ধে যে বিস্ময়, মুগ্ধতা আর কৌতূহল জেগেছিল দশাশ্বমেধ থেকে বাড়িতে ফেরার সময়টুকুতেই তা আরো গভীর হয়েই উঠল।

বুরুজের আড্ডায় সকলকে সুধাদা বলে তাকে সম্বোধন করতে শুনেছিলাম। ওই সুধাদা সম্বোধনটুকু ছাড়া তার ব্যক্তিগত আর কোন পরিচয় তখনও পাইনি কিন্তু সুধাদার সঙ্গে কাশীর সর্পিল সঙ্কীর্ণ গলিপথে শুধু তাঁর আলাপ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতে যেতে যেন অবান্তর তথ্য হিসেবে সে সব বিবরণের কথা মনেও হয়নি একবার। এমন একটি উজ্জ্বল প্রসন্ন মধুর তার ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিটি কথায় তো বটেই তা বলার ভঙ্গিতে পর্যন্ত এমন একটি সমৃদ্ধ সবল মন ও বর্ণাঢ্য চরিত্রের ঝিলিক ফুটে ওঠে যে তাইতেই চমৎকৃত অভিভূত হয়ে থাকতে হয়।

ব্যক্তিত্ব যাঁর এমন অসাধারণ সেই মানুষটির ব্যক্তিগত বাইরের পরিচয়ও কম বিশিষ্ট ও বিচিত্র নয়। সুধাদার পুরো নাম হল সুধাংশু মুখোপাধ্যায় বাংলার এক যথার্থ অভিজাত সংস্কৃতিবান, সমৃদ্ধ বংশের সন্তান। বিদ্যা বুদ্ধি সঙ্গতি কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, তিনি নিজের নির্বাচিত বৃত্তিতে সাফল্যের চূড়ায় যে উঠবেনই এ বিষয়ে আত্মীয় বন্ধু কারুরই সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু তার বদলে প্রথম

যৌবনেই পরাধীন ভারতের সেই বিপ্লব সাধনার যুগে বৃটিশ রাজের বিচারে তাঁকে কারাবাস বরণ করতে হল।

নিজেব অস্ত্রশস্ত্র কি ব্যবহার করেছিলেন তা সঠিক জানি না কিন্তু এইটুকু জানি যে তিনিই অর্থসাহায্য করে সেদিনের বেশ কয়েকজন তরুণকে সাগর পারে বিপ্লবদীক্ষা নিতে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাব সুন্দরবন উপকূলে জার্মানী থেকে একটি অস্ত্রের জাহাজ এনে ভেড়াবার পরম দুঃসাহসী যে গোপন উদ্যোগ শেষমুহূর্তে বিফল হওয়ার দরুন বহু স্বনামধন্য বিপ্লবীকে ধরা পড়তে হয়, সে উদ্যোগের সঙ্গে তাব কিছু সংশ্রব ছিল। তার জন্যেই শুধু কারারুদ্ধ নয় তখনকাব দিনের তার মত মানুষের পক্ষে যা চরম শাস্তি ছিল সেই সলিটারি সেল, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ কারাবাসে দিবারাত্রি যাপনের যন্ত্রণা তাঁকে বহুদিন সহ্য করতে হয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর বাদে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর আর নতুন কোন অর্থোপাজনের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে তিনি যুক্ত করেননি। পারিবারিক ও স্বোপার্জিত সম্পদ থেকে যা অর্থ সংস্থান তাঁর তখন ছিল তা সাধারণ প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্তই বলতে হয়। বিদ্যা ও শিল্পচর্চায় বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্য ও নাট্যশিল্প বিষয়ে একাগ্র হয়ে কিছুকাল তিনি শৌখীন নির্দায় ধনী যুবকের জীবনই যাপন করেন। তারপর হঠাৎ একদিন অপর্যাপ্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত অতিরিক্ত সুবিধা বর্জন করে একেবারে সাধারণ মানুষেব প্রয়োজনের সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে নিয়ে জীবনের এক নতুন অধ্যায় তিনি শুরু করেন।

আমার সঙ্গে কাশীতে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হল তখন তাঁর এই অধ্যায়ই চলছে।

আগের ও পরের সব অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে জীবনের একটি দিক কিন্তু তাঁর অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। সে তাঁর সাহিত্য ও নাট্যশিল্প চর্চা। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর তিনি আজীবন অচ্ছেদ্য বন্ধু। অধ্যাপনা ছেড়ে শিশির ভাদুড়ী মশাই যখন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নিজের একটি দল গড়ে ইডেন গার্ডেনের ক্যালকাটা একজিবিশনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকটি নিয়ে প্রথম স্বাধীন ভাবে মঞ্চাভিনয় শুরু করেন তখন সর্বোচ্চ শ্রেণীর আসন সেখানে কোনদিন একটি খালি থাকত না। শিশির ভাদুড়ীর সম্পূর্ণ নতুন ধারায় অভিনয়ের আকর্ষণই এ অসামান্য মঞ্চ-সাফল্যের মূল কারণ সন্দেহ নেই। এ ছাড়া কোন দিন একটি মাত্র আসন অবিক্রীত না থাকার মধ্যে সামান্য আর একটু নেপথ্য রহস্যও নাকি ছিল। শুনেছি, সে-মূল্যের যত কটি আসনই অবিক্রীত থাক তা সমস্তই প্রত্যেক অভিনয়ে নির্বিচারে কিনে নেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা সুধাদা করে রাখতেন।

একজিবিশনের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে শিশির ভাতুড়ী মশাই যখন নাট্য নিকেতনের স্থায়ী মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন তখনও সর্বোচ্চ মূল্যের সমস্ত বাক্সগুলিও নাকি সুধাদা অবিক্রীত থাকতে দিতেন না।

সে রাজকীয় বন্ধু-প্রীতি দেখাবার মত সঙ্গতির প্রাচুর্য স্বেচ্ছায় সীমিত করে দেওয়ার পরও পরিবারবর্গকে যেখানে রেখেছিলেন সেই কাশীতে না হলেও তাঁকে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন শিশির ভাতুড়ীর থিয়েটারেও দেখা যেত। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মধ্যে অবশ্য নয়। মঞ্চের পিছনে ভাতুড়ী মশাইয়ের তখনকার থাকবার আস্তানার আসরে।

সে আসর কলকাতা শহরের বিদগ্ধ শিল্পরসিক মহলে তখন বিখ্যাত। সেখানে শিশির ভাতুড়ীর সুহৃদ শুভানুধ্যায়ী পরামর্শদাতা হিসেবে যেতেন পণ্ডিত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যকার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিল্পী যামিনী রায় এবং এই দরের মানুষ আরো অনেকে। সে সমাবেশে অখ্যাত অজ্ঞাত এক সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের মত মানুষের নেহাত শিশির ভাতুড়ীর একজন পূর্বতন বন্ধু হিসেবে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহের পাত্র হয়েই তো থাকবার কথা। কিন্তু তা যে তিনি ছিলেন না, শিশিরবাবুর থিয়েটারের আসরে জ্ঞানীগুণী খ্যাতিমান যাঁরা আসতেন তাঁদের সকলের কাছে সুধাদার যে একটি অনন্য মর্যাদার আসন ছিল সে আসরে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে এমন জীবিত জন মাত্রেই তার সাক্ষ্য দেবেন।

আর কিছুতে না হোক স্বয়ং শরৎচন্দ্রই কাগজে কলমে ছাপার অক্ষরে সে প্রমাণ মুদ্রিত করে গিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র শিশির ভাতুড়ীর অনুরোধে তাঁর 'দেনা পাওনা' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে নাট্য নিকেতন থিয়েটারের আসরে যখন যাওয়া আসা শুরু করেন তখন সে আসরের একটি মানুষ সম্বন্ধে তিনি নাকি প্রথমে বেশ বিরূপই হয়ে ওঠেন। এ বিরূপতা খুব অস্বাভাবিক বোধহয় নয়। তাঁর মত সাহিত্য-সম্রাটের সঙ্গে শিশির ভাতুড়ীর মত মানুষের আলাপ আলোচনার মধ্যে নেহাত শিশির ভাতুড়ীর বন্ধু বলে অজানা অচেনা সাধারণ কোন এক বাইরের লোকের উপস্থিত থাকাই তো অশোভন ও অনুচিত। শুধু উপস্থিত থাকা নয় তার ওপর এই সামান্য নগণ্য মানুষটা বড় বড় কথা বলে কত সব মতামত দেওয়ার স্পর্ধাও রাখে।

শরৎচন্দ্র নিতান্ত শিশির ভাতুড়ীর খাতিরে অতি কষ্টেই এ উপদ্রব প্রথমে বোধহয় সহ্য করেছেন। তারপর দেখতে দেখতে সেই উপদ্রবই যে বিশেষ বাঞ্ছিত ও

উপাদেয় সঙ্গ হয়ে উঠবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি নিশ্চয়। তাই কিন্তু হয়েছে। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটিকে নাটকের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আলাপে আলোচনায় অজানা অচেনা প্রথম পরিচয়ের সময়ের সেই উপদ্রবের কাছে এমন সব নতুন দিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিচারের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'ষোড়শী' বইটি সুধাদাকেই উৎসর্গ করে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকটির প্রথম কয়েকটি পাতা ওল্টালেই সে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শুধু শরৎচন্দ্রই নয়, সুধাদার প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা আরো অনেকেই লিখিত ভাবে জানিয়ে গেছেন। যতদূর মনে পড়ছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিচারণে কোথায় যেন শিশির ভাদুড়ীর নাট্য মজলিশের উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখেছি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও যেন কি একটি বই তাঁর নামে উৎসর্গ করে গেছেন।

ছাপার অক্ষরে এক বর্ণ যাঁর কোথাও কিছু কখনো প্রকাশিত হয়নি, এক সময়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামের আত্ম-নিবেদিত সৈনিকের ব্রত নিলেও যিনি না ছিলেন কোন দলের নেতা, না সভাসমিতির বিখ্যাত বক্তা, নিজে থেকে কোথাও কোন রকম খ্যাতি প্রতিপত্তির অনুসরণে এক পা যিনি কখনও বাড়ান নি, নিতান্ত দৈবাৎ কাছে এসে পড়া মানুষের ওপরে বিরল একটি ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় এমন একটি গভীর ও দূরপ্রসারী ছাপ রেখে যাওয়ার তাঁর মত দৃষ্টান্ত খুঁজলে খুব বেশী পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

সুধাদা সম্বন্ধে এত সব কথা অনেক পরে একটু একটু করে জেনেছি। আমি কিছুক্ষণের সান্নিধ্যে তাঁর যেটুকু পরিচয় তখন পেয়েছি তাতে আমার মনের স্বাভাবিক অস্থিরতার বেগ নিজের আগোচরেই একটা নতুন মোড় নিতে শুরু করেছে।

সে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সুধাদার বাড়িটা দেখেই এসেছিলাম। পরের দিন তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে সন্ধ্যায় বুরুজের আসরের জন্যে যে অপেক্ষা করিনি তা বলাই নিশ্চয় বাহুল্য। বলতে গেলে সকাল হতেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি আর তার পর যে ক'টি দিন কাশীতে থাকবার কথা তা আর তখনকার অবস্থায় বাড়ানো সম্ভব না হলেও স্নানাহার নিদ্রা আদির অপরিহার্য সময়টুকু ছাড়া যতক্ষণ সম্ভব তাঁর সঙ্গেই কাটিয়েছি। শুধু আমিই নয়, দেখেছি তাঁর সঙ্গলোভী মুগ্ধ অনুরাগীর সংখ্যা বড় কম নয়।

উত্তরা সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীকে তার পরের দিন সকালেই সেখানে হাজির হতে দেখেছি, আমার বন্ধু কেদার আর প্রফুল্লও বাদ যায়নি। এ ছাড়া চেনা ও

অচেনা কাশীর অনেককেই সকাল সন্ধ্যায় তাঁব কাছে আসতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গ লোভে যাবা এসে জড়ো হয় তাবা সকলেই বয়সে তরুণ এটাও একটা লক্ষ্য করার বিষয়।

তাঁর কাছে যারা আসে বিশেষ করে বয়সে নবীনদের ওপর তাঁর এ চৌম্বক আকর্ষণের মূল কোথায়? শুধু কি সাহিত্য থেকে জীবনের নানা বিষয় সম্বন্ধে তিনি যা বলেন সে সব কথার চমক দেওয়া নতুনত্ব? তাঁর চিন্তার গভীরতা আর বলার অনন্য ভঙ্গির সরসতাই কি আমাদেব অভিভূত করেছে? আমরা কি মুগ্ধ হযেছি তাঁব মুখের অসামান্য বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত আবৃত্তি শুনে, অবাক হযেছি নানা বিষয়ে বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে তাঁব পড়াশোনার ব্যাপকতা আর গভীরতায়?

তা হযেছি নিশ্চয, কিন্তু সেইটুকু বললেই সব বলা হয় না। সুধাদার মধ্যে শুধু আশ্চর্য এক বিদগ্ধ রসিক বোদ্ধা সাহিত্যপ্রেমী মানুষই তো আমরা পাইনি, পেয়েছি নিজস্ব সহজ অকৃত্রিম বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের সাধক এমন এক সমগ্রভাবে জীবন্ত মানুষকে যিনি আমাকে অন্তত বিশেষ ভাবে নাড়া দিযে জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবার কিছু খেই ধরিয়েছেন সত্যই।

বোহেমিয়ান কথাটার তখন খুব চল হযেছে। ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে বেপরোয়া একরকম আখখুটে হিসেবে ও আখ্যাটায় তখন একটা প্রচ্ছন্ন গৌরবের ঝঙ্কারই যেন বাজত। সাহিত্যিক শিল্পী জীবন রসিক হতে গেলে বোহেমিয়ান হতে হবে এমন একটা ধারণাকেই তখন সস্তা ভাবালুতার হাওয়া দিয়ে ফোলানো ফাঁপানো হয়েছে। আসলের বদলে নকল বোহেমিযানেরই ছড়াছড়ি তখন দেখা গিযেছে তাইতে।

সুধাদা বোহেমিযান ছিলেন না, কিন্তু জীবনযাত্রার সব কিছুতে তাঁর এমন একটা অকৃত্রিম অকপট, সব মিথ্যা অহমিকার রীতি-পদ্ধতি-অগ্রাহ্য করা নিজস্ব ধারা ছিল নকল বোহেমিয়ানদের পক্ষে যা অনুকরণের অসাধ্য।

সুধাদা আমাদের সঙ্গে সকালে দশাশ্বমেধে বেড়াতে গিয়ে সঙ্কীর্ণ কাশীর গলির কোন বাঁকে ইট পেতে বসা নাপিতের কাছে ক্ষৌরি হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে পথের ধারে পাতা ভাঙ্গা তক্তার বেঞ্চিতে বসে শালপাতার ঠোঙায় তেঁতুল জল ডোবানো ফুচকা খেয়েছেন, আবার স্বনামধন্য মনীষী পণ্ডিত বিনয় সরকার কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে ক'দিনের জন্যে অতিথি হয়েছেন শুনে, ওই প্রতিদিনের ব্যবহারের চপ্পল পায়ে দিয়েই, গাযের হাতকাটা ফতুয়ার ওপর শুধু একটা মোটা মার্কিনের ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী চড়িয়ে আমাদের ক'জনকে নিয়ে দেখা ও আলাপ করতে গেছেন। বিনয় সরকারের সঙ্গে সেদিন যা কিছু আলাপ হয়েছে তার বেশীর ভাগই সবিনয়ে চালিয়েছেন একলা সুধাদা। সে আলাপে

আমরা যেমন সুধাদার নতুন একটি দিক দেখে বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছি, বিনয় সরকার মশাইও তেমনি এই সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষটি সম্বন্ধে একটু সপ্রশংস কৌতূহল অন্তত অনুভব করেছেন বলেই আমার ধারণা।

সে যাত্রায় কাশীতে থাকার মেয়াদ কিছুতেই বাড়ানো সম্ভব নয় বলে হপ্তাখানেক বাদে বাধ্য হয়ে আবার ঝাঁঝায় ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সে ফিরে যাওয়া শুধু ফিরে আসার আয়োজনের জন্যে। কারণ মনে মনে তখন কাশীতে এসেই এবার বাস করব সঙ্কল্প করে ফেলেছি।

কাশী চিরকালই আমার ভাল লাগে। জন্মস্থান বলে কি না জানি না, তার অলি গলি থেকে রাস্তা ঘাট চৌক বাজার মন্দির মঠ আর বিশেষ করে তার বুক জুড়ে থাকা গঙ্গার নানা ঋতু নানা পূজা-পার্বণের নানা বিচিত্র রূপ আমার মনের মধ্যে অস্পষ্ট যেন বহু জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি জাগায়।

কাশীর এ সব আকর্ষণ তো মনের মধ্যে ছিলই, তার ওপর ক দিন সুধাদার সঙ্গে কাটিয়ে তার দৃষ্টিতে কাশীর মাধুর্য মহিমা যেন নতুন করে দেখতে শিখেছি। কাশীতে সুতরাং আমায় আসতেই হবে।

ঝাঁঝায় ফিরে গিয়ে সেখানকার সামান্য সংসারযাত্রার ব্যবস্থা গুটিয়ে নিয়ে কাশীতে ফিরে আসতে বিশেষ দেরী হল না। দিন পনেরোর মধ্যেই একদিন সবের লটবহর নিয়ে বেনারস ক্যান্টনমেন্টে এসে নামলাম। এবার দিদিমা সানন্দে যে আমার সঙ্গে এসেছেন তা বলাই বাহুল্য।

কেদার আর প্রফুল্লর মধ্যে প্রফুল্লই আমার চিঠি পেয়ে সেদিন স্টেশনে উপস্থিত ছিল আমায় সাহায্য করতে। দিদিমাকে একটি টাঙ্গায় মালপত্র সমেত তুলে দিয়ে অন্য একটা টাঙ্গায় প্রফুল্লকে নিয়ে আউধগরবিতে যেতে যেতে তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, সুধাদা আছেন তো? না, তিনি কলকাতায় গেছেন। জানালে প্রফুল্ল। মনটা প্রথমে একটু খারাপই হয়ে গেল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র। সুধাদার পরিবার তো এই কাশীতেই আছেন। আজ না হোক ক'দিন বাদে তাঁকে ফিরতেই হবে এখানে। নিজের নতুন সঙ্কল্পের কথা সানন্দেই প্রফুল্লকে এবার জানালাম—কলকাতায় নয় আমি কিন্তু পাকাপাকি ভাবেই এখন থেকে কাশীতেই থাকব।

নিয়তির অদৃশ্যভাবে হাসার মামুলী কথাটা এখানে ব্যবহার না করে উপায় নেই।

কি করে তখন আমি জানব যে আমার জীবনে বিনয় সেন বলে অমন একটি দুর্লভ মানুষ বন্ধু হয়ে আসছেন কিছুদিন বাদেই।

॥ সাতাশ ॥

কাশী শহরে আমার পাঁচের বারোর আউধঘরবির বাড়িতে কায়েমী হয়ে আস্তান পাতবার ব্যবস্থাই করলাম। ছোটখাট সেকেলে পাথরের তৈরি মোকান হলে কি হয় যেমন মজবুত তেমনি নিরাপদ আরামের। তেতলা ক্ষুদে বাড়িটা কাশীর জন্যেই যেন বিশেষ করে তৈরি। কাশীতে যেমন প্রচণ্ড শীত পৌষ মাঘে, তেমনি দুঃসহ গরম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে। তবে তাতে ভাবনার কি আছে, কাশীর সেকেলে বাড়ি ঘর এই দুই চরম অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করে অনায়াসে। যেমন, দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর, রাস্তা ঘাটে যেন আগুন জ্বলছে, বাইরের দেয়ালে কোথাও ছোঁয়া লাগলে যেন গায়ে ছ্যাকা দেয়, চলে যাও নিচের তলার উত্তর মুখো ঘরে। উত্তরের গলির ধারের দরজা জানালা বন্ধ করা পাথরের ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একালের কামরাকে হার মানায়। দিনের বেলার জন্যে নিচের তলার এই ঘর আর রাত্রের জন্যে তেতলার খোলা ছাদ। সেখানে মুক্ত আকাশের নীচে খাটিয়া পেতে শোযার সুখের কোন তুলনা নেই।

গ্রীষ্মকালের রাত্রের আরামের এই খোলা ছাদ শীতকালের সারা দিনের স্বর্গ দক্ষিণে হেলা রোদ সকাল থেকে প্রায় বিকেল পযন্ত অবাধে উপভোগ করা যায় সারা দিন। প্রায় বিকেল বলতে হল এই জন্যে যে বাড়ির ঠিক পশ্চিমে আমাদের ছাদের একেবারে গায়ে লাগানো এক খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে পাশের বাড়ির। পশ্চিমের সূয সেই নিরেট নিশ্ছিদ্র দেয়ালেই যায় আড়াল হয়ে। গ্রীষ্মকালে সেই আড়াল হওয়াটা তো পরম সৌভাগ্য, শীতকালেও সূয দক্ষিণে হেলে থাকার দরুন সেটা এমন কিছু অসুবিধার নয়, কারণ ওই খাড়া পশ্চিমটুকু বাদে পূব দক্ষিণ উত্তর সব দিকই আমাদের আউধঘরবির বাড়ির ছাদ থেকে খোলা।

একটা নেহাত নগণ্য গলির ওই তো পুঁচকে একটা পাথুরে বাড়ি। তার আবার অমন আদিখ্যেতার বর্ণনা কিসের ? এ কথা ভাবতে পারেন অনেকেই।

জবাব দেবার মত শুধু একটা কথাই আমার আছে। সেটা আমার নিজের একটা ধারণার কথা। ধারণাটার মূলে যুক্তি-টুক্তি বিশেষ কিছুই অবশ্য নেই। নেহাত অবাস্তব কাল্পিক ধারণাই বলা যায়। তবু সে ধারণাটা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হযে আছে বহুদিন থেকেই।

ধারণাটা আর কিছু নয়। শুধু এই যে বাড়ি ঘর রাস্তাঘাটের পরিবেশ, এ সব কিছু

নেহাত জড় অবাস্তর বাইরের জিনিস নয় আমাদের অন্তর সত্তার সঙ্গেই সে সব জড়ানো। আমরা যা করি, ভাবি হই তার মধ্যে অলক্ষ্যেও আমাদের এই পরিবেশের বেষ্টনীও মিশে থাকে।

এ রকম ধারণার পিছনে বাড়ি ঘরেরও আত্মা আছে বলে সুস্পষ্ট একটা অনুভূতিও থাকে। আমার অন্তত আউধঘরবির সেই পাথুরে বাড়িটি সম্বন্ধে এখনো তাই যে আছে তা অকপটে স্বীকার করছি। কত বছর কেটে গেছে ভেতরে ঢোকা দূরে থাক সে বাড়ির মহল্লাতেই পা দিইনি অমন বিশ বছর, তবু মনের মধ্যে সে বাড়িটার জীবন্ত উপস্থিতি যেন মাঝে মাঝে টের পাই। স্মৃতির পাতায় সেই পুরানো দিন আর সেই বাড়িটির সঙ্গে জড়ানো জীবন আজকের দিনের অনেক কিছুর মতই যেন অম্লান বাস্তবতা নিয়ে জেগে আছে।

হরিশ্চন্দ্র ঘাট থেকে সোজা পশ্চিমমুখো রাস্তায় এসে বড় রাস্তায় পড়বার আগেই বাঁয়ের সরু পাথর বাঁধানো গলিটায় ঢুকে একটা বাঁক নিয়েই আউধঘরবির সে বাড়ির সেকেলে মজবুত কাঠের দরজার বাইরের কড়া আমি যেন নাড়তে পারি। দু'বার নাড়লেই দোতলার বারান্দা থেকে এ দরজার ছিটকিনিতে বাঁধা দড়িটা টেনে কেউ দরজাটা খুলে দেবে। নিচে পর্যন্ত না নেমে ওপর থেকেই দরজা খুলে দেওয়ার এ অতি সরল সাবেকী ব্যবস্থা।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে চারিদিক ঘেরা মাঝের চৌকো উঠোনটুকু পার হয়ে সঙ্কীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলা ছাড়িয়ে তেতলার ছাদে এবার উঠে যান না কেন?

ছাদ খুব বড় নয়, কিন্তু পূব-দক্ষিণ কোণে চিলকোঠার ছোট্ট একটি ঘর বাদে সমস্তটা একেবারে ফাঁকা। চারিধারের নিচু আলসের ওপর দিয়ে তাকালে বহুদূর পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি কোন বাধাই পায় না। উত্তর দিকে তবু শহরের বাড়ির জটলায় কিছু দূরে দৃষ্টি হারিয়ে যায়। উত্তর-পূব দিকেও কতকটা তাই। কিন্তু পূব আর দক্ষিণ দিকে যেন আমার নিজের নাটমহল। সেখানে যা কিছু হয় সব যেন একা আমার জন্যে সাজানো। তার ভাগীদার কেউ নেই।

দক্ষিণে বাড়ির একেবারে লাগাও একটা কাঠের আড়ত। বড় গুদাম নয়, কাঠ বেচাকেনার ছোটখাট কারবার সেখানে চলে। তেতলার কোণের ছোট্ট কুঠরিটিই যে আমার আস্তানা তা বোধহয় বলবার দরকার নেই। নিচু ছাদের ছোট্ট ঘরটিতে পূবে আর দক্ষিণে দুটি সত্যিকার গবাক্ষ নামের উপযুক্ত জানালা। সেই জানালা দিয়েই দু'দিকের যা কিছু দেখার আমি দেখতে পাই।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে নিচের কাঠের আড়তের যা দেখেছি তা কি মনে আছে কিছু? তা আছে বই কি: নতুন আনা মোটা গাছের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে কাটার তালমাফিক শব্দ শুধু নয়, সেই কাঁচা কাঠের ঈষৎ কটু গন্ধটা পর্যন্ত যেন এখনো মন লাগালেই পাই। রাত্রে কাজ কারবার শেষ হবার পর আড়তের টিনের গেট বন্ধ করে আড়তের জিম্মাদার মজুর কানা উঁচু বাঁসিতে আটা মেখে হাত দিয়ে চাপড়ে মোটা মোটা রুটি যখন কাঠের উনুনের ওপর পরিপাটি করে তাওয়ায় উল্টেপাল্টে সেঁকে তখন মাঝে মাঝে ফুল্‌কি তোলা কাঠের আগুনের আঁচটা যেমন চোখের ওপর নাচে, পোড়া কাঠের সঙ্গে ঈষৎ পোড়া মোটা চাপাটির সোঁদ। গন্ধটাও তেমনি যেন নাকে আসে।

কাঠের আড়তের পরেই বড় রাস্তা। সেখানে এক্কা টাঙ্গার নানা পদার ঠুনঠুনের সঙ্গে কদাচিৎ একটা দুটো মোটরের ভেঁপু তখন শোনা যেত। সাইকেল রিক্‌শার আবিভাবই তখনো ঘটেনি।

দক্ষিণের জানালার চেয়ে দক্ষিণ-পূবের জানালার আকার্ষণই অনেক বেশী। পূবের সরু গলিটার ওপারে আমাদের বাড়ির মতই আর একটি পাথুরে মোকামের তেতলার চিলকোঠা। আমার মুখোমুখি সে চিলকোঠা নয়, তা ছাড়িয়ে যে বিরাট একটা গোডাউনের বহুদূর ছড়ানো টিনের চাল দেখা যায় সেইটেই আমার বহু দীর্ঘ অলস অবসর সরস সজীব করে রেখেছে।

টিনের চালাটা ছোটখাট একটা মাঠের মতই বিশাল। তার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই অশথ গাছ আর তার চারিধারের ছড়ানো টিনের চালটা এমনিতেই চোখের দৃষ্টি মেলে রেখে বেলা কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর সেটা কাশীর আরেক বাসিন্দাদের তখন রাজত্ব। তখনও কাশীতে বিদ্যুৎশক্তি আসেনি। ইলেকট্রিসিটির পোস্ট আর তারে রাস্তা ঘাট বাড়ির ছাদ তখনও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি কাশীর সেই ঊর্ধ্বস্তরের নাগরিকদের পক্ষে। গাছে গাছে ছাদ থেকে ছাদে তারা অবাধে দল বেঁধে বিচরণ করে বেড়ায়। কাশীর মানুষদের পক্ষে তারা একদিকে যেমন উপদ্রব আর একদিকে তেমনি কৌতুক উপভোগের উপাদানও বটে।

আমার পুব দিকের টিনের চাল আর তা ভেদ করে ওঠা অশথ গাছটি ছিল কাশীর সেই দ্বিতীয় নাগরিক অর্থাৎ বানরকুলের অতি প্রিয় লীলাভূমি। তাদের প্রেম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মিলন, কলহ, দলের সঙ্গে দলের সাক্ষাতে ছক বাঁধা আস্ফালনের রীতি সব কিছু মিলে একটা উপভোগ্য নাটকের অভিনয়ই দিনের পর দিন দেখার সুযোগ

পেয়েছি ; মানুষের সঙ্গে বানর সমাজের তুলনামূলক একটা গবেষণার বই লেখবার মত অনেক উপাদানই পেয়েছিলাম।

সবশুদ্ধ মিলিয়ে কাশীতে জীবনের স্বাদটাই ছিল বেশ একটু আলাদা। পাথুরে ছোট বাড়িটার মধ্যে নিজেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে রাখার একটা তৃপ্তি ছিল তেমনি সুখ ছিল অকারণেই কাশীর গোলকধাঁধার মত গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানোতে কি কোন একটা ঘাটের ওপর বিনা কাজে গিয়ে বসে থাকায়।

এর মধ্যে নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল বিকেলে কি সকালে একবার অন্তত দশাশ্বমেধের বাজারের উল্টো দিকে ছোট একটি বইয়ের দোকানে গিয়ে জমায়েত হওয়া। সে বইয়ের দোকান আর নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের মত নতুন লেখকেরা তো বটেই পরিণত প্রবীণ বিদ্বজ্জন সাহিত্যিকেরাও কেউ কাশী গিয়ে ওই বইয়ের দোকানের আসরে একবার অন্তত পায়ের ধুলো দেন নি এমন তো মনে হয় না।

বইয়ের দোকানের নামটা ভুলে গেছি। কিন্তু সেখানে যাঁদের দেখা পেয়ে চমৎকৃত কৃতার্থ হয়েছি তারা ভোলবার নন। ওই দোকানেই অনন্য পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে কি রকম ধন্য বোধ করেছিলাম সে কথা ভাল করেই মনে আছে। ওই দোকানে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যেই দেখেছিলাম কিন্তু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অচিরেই আমাদের কেদারদা হয়ে উঠতে দেরী লাগেনি। পরে বাংলা সাহিত্য জগতের দাদামশাই বলেই পরিচিত হলেও আমাদের কয়েকজনের কাছে তিনি কেদার-দাই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়টা আমার দিক থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি আর তাঁর দিক থেকে আশাতীত অকৃত্রিম স্নেহ প্রীতির দীর্ঘ সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছিল। কেদারদা কাশী ছেড়ে শেষ পর্যন্ত উত্তর বিহারে তাঁর কন্যার বাড়িতেই বসবাস করতে যান। তার আগে বেশ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কাশীতে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। আর সে সঙ্গ বার্ধক্যভার পীড়িত কোন প্রবীণের নয়, চিরসজীব সরস সদানন্দ অকৃত্রিম ও অশেষ স্নেহের আধার এক আশ্চর্য মানুষের।

কেদারদা তাঁর নিজস্ব অনুপম সহজ ভঙ্গিতে তাঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল ঈর্ষা করবার মত। আমি যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি ষাট পেরিয়ে সত্তরের দিকে এগিয়েছেন, কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে যে কোন তরুণের মতই শক্তসমর্থ জোয়ান। লম্বা চওড়া নন, মাঝারি গড়নের মানুষ

ছিলেন কিন্তু দেহের কাঠামোটা ছিল একেবারে লোহার মত মজবুত। কব্জির হাড় ছিল জাপানীদের মত চওড়া।

তাঁর এই স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে একদিন বড় মজার গল্প বলেছিলেন। আদিবাড়ি তাঁর দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে ১৮৬৩তে যখন তাঁর জন্ম হয় তখন সে অঞ্চল সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার ডিপো। তার ওপর জলের দোষে পেটের রোগও আছে।

পনেরো ষোল বছর বয়সে কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে কেদারদা তখন সেখানে প্রায় শেষের দিনই গুণছিলেন বলা যায়। একে ম্যালেরিয়া তার ওপর এমন পেটের রোগ যে জল বার্লিও নাকি পেটে হজম হয় না।

কেদারদার কোন এক আত্মীয় তখন সুদূর মধ্যপ্রদেশের সাগর-এ কি কাজ করতেন। ছেলেটার আর কোন আশা নেই বলে বাড়ির লোকেরা শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে একবার সেই সুদূর প্রবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল। তার শরীরের যা অবস্থা তাতে এই দীর্ঘ রেলপথের ধকল সয়ে সে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছোতে পারবে কি না সেই বিষয়েই সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।

কেদারদা সেই ট্রেন যাত্রার গল্পটা বড় মজা করে বলেছিলেন। আঠারোশো সাতাত্তর আটাত্তর সালের ট্রেন ভ্রমণ। বর্ধমানই তখন যথেষ্ট দূর আর আসানসোলই তো বিদেশ। কেদারদা বলেছিলেন ট্রেনের কামরায় উঠে বেঞ্চিতে সোজা হয়ে বসে থাকতেই তাঁর কষ্ট হচ্ছিল এমন তাঁর শরীরের অবস্থা। কিছুই পেটে সয় না আর হজম হয় না বলে বাড়ি থেকে বোতলে করে বুঝি সাবু করে সঙ্গে দিয়েছিল যতদূর সম্ভব তাই দিয়ে চালাবার জন্যে, সে সাবু কেদারদা খাননি, খেতে ইচ্ছেও করেনি। বর্ধমানে ট্রেন যখন পৌঁছোয় তখন বসে থাকতে না পেরে তিনি শুয়েই পড়েছেন। বড় তেষ্টা পেয়েছিল বলে স্টেশনের পানিপাঁড়ের কাছ থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে খেয়েছিলেন।

সেই অবস্থায় বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে যখন আসানসোলে পৌঁছেছিলেন তখন ট্রেনের অবিরাম ঝাঁকুনি আর এতক্ষণের উপবাসে কেমন একটু খিদে পাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু খাবেন কি? বোতলে বয়ে আনা সাবু মুখে দেওয়া দূরে থাক দেখলেই তখন তার যেন বমি আসছে। এ যাত্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি যে পৌঁছাবেন না তা তখন তিনি নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছেন। আসানসোল স্টেশনে গাড়ি থামবার পর তাই তিনি মরিয়া হয়ে শেষ খাওয়া খাওয়ার মত স্টেশনের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কচুরি মিঠাই কিনে খেয়েছেন। কচুরি মিঠাই-এর সঙ্গে পানিপাঁড়ের কাছ থেকে জলও খেয়েছেন এক লোটা।

ব্যস, কেদারদা বলেছিলেন, কি ভেল্‌কি যে হয়ে গেল সে বলতে পারি না—

কচুরি মিঠাই তো বেমালুম হজম হয়েছে বটেই তারপর স্টেশনে স্টেশনে যেখানে গাড়ি থেমেছে ফেরিওয়ালাদের কাছে যা পেয়েছি কিনে খেয়েছি।

কেদারদা সেইভাবেই নীরোগ নিরাময় অবস্থায় তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছিলেন। জীবনে তারপর তিনি আর অসুস্থ হননি বললেই হয়। প্রবাসেই প্রায় সারাজীবন তাঁর কেটেছে। ছিয়াশী বছর বয়সে পুণ্যিবায় যখন মারা যান তখনও তিনি জরাজীর্ণ হননি। কৌতুক রসের লেখায় বাংলা সাহিত্যকে মুগ্ধ চমৎকৃত করেছেন তিনি পরিণত বয়সে। তার আগে তিনি চাকরির সুবাদে চীন ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে সেখানকার যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে গেছেন আজকের দিনে ভ্রমণ সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে তা খুঁজে পড়ার যোগ্য বলে আমার অন্তত মনে হয়।

একদিকে কেদারদা'র মত মানুষ আর একদিক দিয়ে আমার বন্ধু কেদার প্রফুল্ল কালীমাস্টার উত্তরা সম্পাদক সুরেশ এবং আরো অনেক প্রায় এক বয়সের সঙ্গীদের নিয়ে কাশীর জীবন তখন যেন একটা একটানা মধুর উত্তেজনা। খবরের কাগজে শিরোনামা দিয়ে ছাপাবার মত কিছুই হয় না। তবু প্রত্যেকটা দিনের যেন অনুভূতির গাঢ় মাধুর্যে মেশানো আলাদা স্বাদ। সব কিছুই সেখানে সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করবার মত। হঠাৎ মাঝে মাঝে দশাশ্বমেধ পার হয়ে বিশ্বেশ্বর মন্দির এলাকার গলিও ছাড়িয়ে চৌকের গা ছুঁয়ে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে গিয়ে হাজির হওয়া। সেখানে বই কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেশ রাত হয়ে গিয়ে লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যাবার পর তখনকার দিনের বিজলী বাতিহীন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার গলি পথ চিনে চিনে বেশ একটু অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরা। কখনো বা গলিঘুঁজির গোলোকধাঁধায় হঠাৎ কোন নগণ্য অথচ সরেস মিঠাইয়ের দোকানে দল বেঁধে খেতে বসা। কখনো গঙ্গার ধারের ধান ঘাটে আমাদের জমায়েতের উপযুক্ত নতুন কোন বুরুজের সন্ধান পাওয়া—এ সব কিছুই প্রতিদিনের মিছিল বাগত বিচিত্র করে।

এক দিক দিয়ে এ যে একরকম গায়ে ফুঁ দিয়ে দিন কাটানো তা অবশ্য অস্বীকার করবার নয়। এ রকম জীবনে রুজি রোজগারের ভাবনাও এক আধবার খোঁচা দেবার কথা। কলকাতার বাড়ি ভাড়ার একটা আয় আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে আমার নিজের কিছু উপার্জনের চেষ্টার কি প্রয়োজন নেই?

সত্যি কথা বলতে গেলে সময়টাই ছিল এমন যে সে প্রয়োজনের কথাটা অগ্রাহ্য করেও অনায়াসে তখন দিন কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

আজকের দিনের তুলনায় সমস্ত দেশেই তখন সব কিছু অনেক অনেক সুলভ। কাশী আবার সেদিক দিয়ে স্বর্গ বললেই হয়। মাছ দুধ চাল ডাল তরিতরকারি তো

বটেই বাড়ি ভাড়াও এত সস্তা যে মাসিক তিনটাকা দিয়ে বেশ আরামের ভদ্র আস্তানা পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য বিলাসের মোহ না থাকলে মাসিক পঁচিশ টাকায় কাশীতে তখন একরকম সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটানো যায়।

এই সুলভতার খবর জানিয়েই শৈলজানন্দকে তখন কাশীতে আনিয়েছিলাম। আমার বাড়ির পাশেই একটি বাড়িতে তিন টাকা ভাড়ায় সে বেশ ভাল দুটি ঘর পেয়েছিল থাকবার মত। সাহিত্য থেকে যথেষ্ট উপার্জনের যুগ তখনো আসেনি। তবু সামান্য যা কিছু তা থেকে হয় তাইতেই কাশীতে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে মনে করেই শৈলজানন্দ তখন কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে কাশীতে এসে উঠেছে।

উপার্জনের ভাবনাটাকে একেবারে বাতিল করবার জন্যে আমিও হয়তো এই কাশীতেই কায়েমী হয়ে থাকতাম কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ প্রফুল্ল এসে খবর দিলে যে প্রখ্যাত দীনেশ সেন মহাশয়ের এক ছেলে সম্প্রতি কাশীতে এসেছেন। তিনি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ উৎসুক। প্রফুল্ল আর কেদারের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁর আলাপ হওয়ার পর তাদের কাছে সে কথা জানিয়েছেন।

স্বনামধন্য দীনেশ সেন অজানা কেউ নন। কিন্তু তাঁর কোন ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়! আমি তো তাঁর এক ছেলে অরুণ সেনকেই জানি। স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি আমার ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই কি আমার খোঁজ করছেন?

॥ আটাশ ॥

কাশী থেকে ক'দিনের জন্যে কলকাতায় আসার দরকারে অকাতরে কল্লোল অফিসেই এসে উঠলাম।

কিন্তু কল্লোল অফিস মানে তো আট ফুট দশ ফুট মাপের ছোট একটা ঘর। একটা তক্তপোশ আর ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে ক'টা চেয়ার টুল রাখতেই জায়গায় কুলোয় না।

পটুয়াটোলা লেনের কল্লোল অফিসের সে বাড়িটা এখনো উধাও হয়ে যায়নি। বাড়িটা এখন কাদের অধিকারে জানি না। যাঁদের অধিকারেই থাক তাঁরা কৌতূহলীদের সে বাড়ির ভেতর দেখতে চাওয়ার আবদার নিশ্চয়ই সহ্য করবেন না। তবু বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে যেতে কোন বাধা নেই।

বাইরে থেকে এক নজরে একটু দেখলেই বোঝা যাবে বাড়িটা ছোটখাট একটা দোতলা। ওপর নিচে মিলিয়ে ব্যবহারযোগ্য ক্ষুদে ক্ষুদে ঘর গুটি তিনেকের বেশী নয়। তার মধ্যে নিচের তলায় গলির ধারের ঘরটিই কল্লোল অফিস।

কিন্তু কল্লোল অফিস মানে যে পটুয়াটোলা লেন নামে একটি গলির একটি বিশেষ নম্বরের একটি ছোট দোতলার ক্ষুদে একটি ঘর মাত্র নয়, কোথায় আর কেন আমাদের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু, আলাদা কিছু, সেই কথাটা ঠিকমত কাউকে আজ বোঝাতে পারব কি না তাই ভাবছি।

কল্লোল কি সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে খুব অসামান্য অসাধারণ কোন কাগজ।

কেউ যদি তা অস্বীকার করবার যুক্তি খাড়া করতে চায় তার সঙ্গে আমি তর্কে নামতে যাব না। কারণ আমার কাছে কল্লোল যেখানে অদ্বিতীয় সেখানে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই আছে বলে আমি জানি না।

বাঙলা ভাষায় অনেক পত্র-পত্রিকাই তো বার হয়েছে আর হচ্ছে কিন্তু এক দিক দিয়ে কল্লোল-এর সঙ্গে এক নিশ্বাসে নাম করার মত তাদের একটিও নয় এটুকু বোধহয় জোর করে বলা যায়।

পটুয়াটোলা লেনে ওই ছোট্ট দোতলার নিচের তলায় ছোট্ট একটি ঘর তো শুধু কল্লোল নামে একটা মাসিক পত্রিকার অফিস নয়, একটু উচ্ছ্বাসের মত শোনালেও বলতে হয় তা সত্যি সত্যিই ছিল যেন একটি স্নেহের নীড়।

কাদের জন্যে? কার জন্যে নয়! যা কিছু হোক লেখার সূত্রে কল্লোলের সঙ্গে যার এতটুকু সম্পর্ক হয়েছে তার জন্যেই সে স্নেহের নীড মুক্তদ্বার হয়ে আছে।

ভাল মন্দ বড ছোটর বিচার তো কল্লোলের নয়। তোমার হাতে লেখার সুডসুডি আছে? লেখার নেশা আছে তোমার? কল্লোলে যা হোক দু'ছত্র তোমার ছাপা হয়েছে কখনো? তাহলেই তুমি কল্লোলের একজন।

বেশী কিছু ক্ষমতা তো কল্লোলের নেই তবে বিকেল বেলা এসে ওই ছোট্ট ঘরটিতে জুটতে পারলে এক কাপ করে চা পাবেই।

আর তোমাদের অনেকের অবস্থাই তো জিজ্ঞেস করে জানবার দরকার নেই। কলেজের শেষ ক্লাশ করে বেরিয়ে বাডি যাবার ট্রামের পয়সাটা বড জোর কাছে আছে। সে পয়সা থেকে সামান্য দু-একটা পয়সাও এক ঠোঙা চিনেবাদাম কি ছোলা ভাজায় খরচ করলে হেঁটেই বাডি ফিরতে হবে।

সকলের অবস্থাই ঠিক ওরমকটা না হলেও তেমন একটা সচ্ছলতা কারুরই বিশেষ নেই। সবাই কাছে-পিঠেরও নয়। নৃপেন চাটুজ্যের মত কেউ কেউ অমন দু চার মাইল হেঁটেও আসে এই ঘরটুকুর টানে।

তাদের কথাও কল্লোল ভোলে না। সাধ যতই থাক সাধ্য কিন্তু নিতান্তই সামান্য। তবু তাইতেই যেমন করে হোক বাডির ভেতর থেকে একটি থালায় বেশ বড একতাড়া হাতে গড়া রুটি আর সেই সঙ্গে এক জামবাটি আলু বা তার সঙ্গে অন্য কিছুর একটা তরকারি নিত্যই আসে অফিস ঘরে।

সবাই মিলে সেই রুটির তাড়া ভাগ করে একটা দুটো যা ভাগে পড়ে জামবাটি থেকে তরকারি নিয়ে খাও। নিজেদের সামান্য ভাগ থেকেও যার দরকার বেশী তাকে যতটা পারো দাও। তুচ্ছ রুটি তুরকারিও খাওয়ার শেষে তাই অমৃত হয়ে ওঠে ওই খাবারের সঙ্গে মেশানো গভীর অকৃত্রিম স্নেহেই।

সে স্নেহ কার? কল্লোল-এর সম্পাদক দীনেশদার নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু তাঁর বললে মস্ত বড ভুল আর অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়।

পটুয়াটোলা লেনের ওই বাডিটিতেই দীনেশদা থাকেন ঠিকই, কিন্তু তিনি থাকেন তাঁর দাদা বৌদির সঙ্গে তাঁদেরই সংসারে।

সুতরাং কল্লোল-এর ছোট্ট ঘরটিতে জড়ো হওয়া বিচিত্র দঙ্গলের ওপর যে স্নেহ ও বাডিতে বর্ষিত হত তার প্রধান উৎস তাঁরাই।

কি তাঁদের স্বার্থ? যতদূর জানি দীনেশদার দাদা বৌদির কোন রকম লেখাটেখার ঝোঁক ছিল না। থাকলে আমাদের কল্লোলে তার একটু ছিটেফোঁটার দেখা পাওয়া যেতই।

সে রকম কিছুই কখনো দেখা যায়নি। তাঁদের সত্যিকার নিঃস্বার্থ নিষ্কাম স্নেহ ভালবাসাই ছিল কল্লোল-এর তখনকার দলটির ওপর। নিজেদের সম্পূর্ণ নেপথ্যে রেখে তাই তাদের জন্যে অকাতরে তাঁরা অনেক কিছু করে গেছেন।

কল্লোলের নেপথ্যচারী দীনেশদার এই দাদা বৌদির অকৃত্রিম আন্তরিকতার জন্যেই সে বাড়িতে সম্পূর্ণ অনাদৃত ভাবে গিয়ে উঠে যে ক'দিন ছিলাম এতটুকু সঙ্কোচ কখনো অনুভব করিনি। করবার উপায় ছিল না।

সে যুগের সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে কল্লোলের ইতিহাসে এ দুজনের নাম অলিখিতই থাকবে নিশ্চয় কিন্তু আমার মত কয়েকজনের মনে তাঁদের স্মৃতি কল্লোলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত হয়ে আছে।

কল্লোল অফিসেই যে গিয়ে উঠছি বিনয় সেনকে কাশী থেকে আসবার আগে শেষ চিঠিতে তা জানিয়ে দিয়েছিলাম। খোঁজ করে তার বাড়িতে আর আমায় যেতে হল না। কলকাতায় আসার পরের দিনই সকালে কল্লোল অফিসে এসে সে হাজির।

কল্লোল অফিস ঘরটাই তখন আমার দখলে। রাত্রে সে ঘরের তক্তপোশেই বিছানা পেতে শুয়েছি। বিকেলে অফিসের কাজ আর কল্লোলের বন্ধুদের আড্ডা আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত আমিই ঘরের মালিক।

ভেবেছিলাম বিনয় সেন বই প্রকাশ করা নিয়ে কথাবার্তা বলবে। তাই তাকে অফিস ঘরে বসতে ডাকলাম। কিন্তু সে বসতে চাইল না। বললে, না, এখানে বসব না। তুমিই চল আমাদের বাড়ি। বাবার সঙ্গে দেখা করবে না?

বিনয় সেনের বাবা মানে অবশ্য স্বনামধন্য দীনেশ সেন, যাঁর নামের আগে রায় বাহাদুর ডক্টর ইত্যাদি ক'টা ফালতু খাতিরের পালক গোঁজা থাকত। কিন্তু সমস্ত বাঙলা দেশ তো বটেই তার বাইরের বহু দেশের পণ্ডিত মহলেই শুধু নিরাভরণ দীনেশচন্দ্র সেনই তখন সগৌরবে একডাকে চেনবার নাম। বলতে গেলে ও রকম একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা সত্যি ভাবিনি। বিনয় সেনের আহ্বানে একটু দুরু দুরু বুক নিয়েই গেলাম তাদের বাড়ি।

দীনেশ সেন তখন থাকেন বাগবাজারের সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে। সে বাড়িতে প্রথম তাঁকে দেখে যেমন অবাক তেমনি একটু হতাশই যে হয়েছিলাম তা অস্বীকার করব না।

সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেনের বাড়ির ভেতর ঢোকবার পর সামনে পড়ে সেকেলে বাড়ির রীতিমত বিস্তৃত এক চাতাল। যতদূর মনে পড়ছে চাতালটা মার্বেল পাথরেই বাঁধানো।

সেই চাতালের ওপর একরাশ এলোমেলো ভাবে ছড়ানো বই কাগজ-পত্রের মাঝে শুধু কোঁচার খুঁট গায়ে দেওয়া শীর্ণকায় যে প্রৌঢ় মানুষটি বসে কাজ করছেন ইনিই দীনেশ সেন!

প্রথম দেখায় বেশ একটু অবাক আর হতাশ যেমন হয়েছি তেমনি মনে হয়েছে দীনেশ সেনের মত মানুষ এই রকম ছাড়া আর কোন রকম হতেই পারেন না। তিনি তো মামুলী পণ্ডিত অধ্যাপক গোছের কেউ নন। তিনি সম্পূর্ণ অন্য জাতের আত্মভোলা জ্ঞান পাগল নতুন-পথ-কাটা মানুষ। তিনি শুধু জ্ঞান তপস্বীই নন, তাঁর মধ্যে স্বপ্ন দেখা কবিও আছে। তা না হলে নিজেদের সোনা ফেলে সাহিত্যচর্চার রাজ্যে সবাই যখন আঁচলে গেরো দিয়েই খুশি থেকেছে সেখানে তিনিই প্রথম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে দুঃসাহসী হলেন কি করে? তাঁর সেই প্রথম পথ দেখানো বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে বা বৃহৎবঙ্গের বিরাট ইতিকথায় তথ্য ও সত্যের সঙ্গে কিছু স্বপ্ন হয়তো মিশে আছে, কিন্তু সেই স্বল্পটুকুর জন্যেও দেশের মানুষের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সে স্বপ্নটুকু না থাকলে সত্যকে যথার্থ স্বরূপে দেখবার উৎসাহ আসত কোথা থেকে!

বিশ্বকোষ লেনের সেই প্রথম পরিচয়ের সময়ে এত সব কথা ভাবিনি তবে তাঁকে তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আর বেহুলা ফুল্লরা ইত্যাদি অতুলনীয় কয়েকটি গদ্যগাথা যা পড়েছি তা থেকে গড়ে ওঠা ধারণার সঙ্গে তাঁর সত্যিকার চেহারার মিলটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে। চেহারা শীর্ণ দুর্বল হোক শান্ত অথচ কেমন ঈষৎ কৌতুক মেশানো তাঁর চোখের দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য আর উজ্জ্বলতাটুকুই তাঁর ব্যক্তিত্বের রহস্যটুকু আমায় যেন ধরিয়ে দিয়েছে।

বিনয় সেন তখন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সেই চাতালের ওপরেই বই-পত্র কিছু সরিয়ে আমায় বসতে দিয়ে তখনকার সাহিত্য, বিশেষ করে কল্লোল-এর লোকদের সম্বন্ধে তিনি যে দু-চারটি কথা বলেছেন তাতে কল্লোল যে তাঁর কাছে শোনা একটা নাম মাত্র নয়, তিনি যে সত্যিই সে কাগজ নেড়েচেড়ে দেখার সঙ্গে মন দিয়ে পড়েও থাকেন তা ভাল করেই বুঝেছি।

এই সব আলাপের মধ্যে হঠাৎ তিনি এমন একটি প্রশ্ন আমায় করেছেন যাতে আমি সত্যি সত্যিই একেবারে বিমূঢ় বিহ্বল। প্রশ্নটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আশাতীত। সাহিত্যের সঙ্গে আমার অন্য দু-একটা খোঁজ খবর নিতে নিতে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, চাকরি করবেন একটা?

বিস্ময় বিহ্বলতাটা 'আপনি' বলে সম্বোধনে অবশ্য নয়। কারণ দীনেশ সেনের

ছোট বড় সকলকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করা যে স্বভাব প্রথম আলাপের সময়ই তা জেনে তার বিস্ময়টুকু এর মধ্যে সরে গেছে।

কিন্তু চাকরি করব কিনা এ কথা হঠাৎ এমন করে জানতে চাওয়ার মানে কি? আর জানতে চাইছেন যিনি তিনি আর কেউ নন, দীনেশ সেনের মত একজন মানুষ।

বিস্ময় বিহ্বল অবস্থায় থতমত খেয়ে কি বলব ঠিক করতে না পেরে একটু আমতা আমতা করেছিলাম নিশ্চয়। বিনয় সেনই তখন আমার সাহায্যে এসে তার বাবার প্রশ্নটা আমায় একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা নিয়ে গবেষণা বিভাগের একটা কাজের পদ খালি আছে। কাজটা দেওয়ার ব্যাপারে দীনেশ সেনের মতামত ও অনুমোদনের দাম সবচেয়ে বেশী। সে কাজ পেলে আমি কি করতে রাজি, এই হল দীনেশ সেনের প্রশ্ন।

আমার তো তখন পাগলা ভাত খাবি? না আঁচাব কোথায়?'—এর অবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু অমন আশাতীত অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো সোজাসুজি উত্তর দিতে কেমন একটু বাধো বাধো লেগেছে।

দীনেশ সেন আমার অবস্থাটা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝেই ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে তার পরদিন এসে সিদ্ধান্তটা জানাতে বলেছেন।

কি স্বস্তি যে তাঁর এই সময়টুকু দেওয়ার অনুগ্রহে পেয়েছি তা বলতে পারি না। চাকরির কথা যতটা শুনেছি তাতে আমার পক্ষে তা যথেষ্ট লোভনীয় সন্দেহ নেই। আমি তো এর আগে উনিশ টাকা মাইনের মাস্টারী আর কুড়ি টাকা বেতনের টিউশনীর বেশী কিছু করিনি। তার জায়গায় এ চাকরি তো রাজার কাজ বললেই হয়। ইউনিভারসিটির রামতনু লাহিড়ী রিসার্চের কাজে সহকারী হওয়া। সহকারী আর কারুর নয়—দীনেশ সেনের। বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দীনেশ সেনের বাড়িতে তাঁর কাছে এসেই তাঁর কাজে সাহায্য করতে হবে। তাও রোজ নয়, গ্রীষ্মের আর পূজোর ছুটি নিয়ে একেবারে কলেজের অধ্যাপকদের মতই সব ছুটির বরাদ্দ।

আর মাইনে তখনকার দিনের হিসেবে যথেষ্টরও বেশী। মাইনে মাসে পঁচাত্তর টাকা। আমার বাড়ি ভাড়া লাগে না, সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় না। টাকা পয়সা গলে যাবার মত কোন বদ নেশা নেই।

নেশার মধ্যে আট আনার টিকিটে পরমানন্দে পিকচার প্যালেস, ম্যাডান থিয়েটার, মেট্রোয় বিলেতী সিনেমা দেখা আর বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে এক আধ দিন

হোটেলে চর্ব্য-চোষ্য খেলেও বিল দশ টাকায় পৌঁছয় না। আর আছে বই-পত্র কেনার নেশা। তাতেও মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ করে উঠতে পারব কি?

এ সব কথা ভেবে অবশ্য সোজাসুজি সম্মতি জানিয়ে আসতে দ্বিধা করিনি। এ সব ভাবনা আসেই নি তখন মাথায়। যা ভেবেছিলাম তা সম্পূর্ণ অন্য কিছু। অস্পষ্ট ভাবে মনে এই কথাটাই উঠেছিল যে চাকরি নিলে কাশীর বাস তুলে দিয়ে আসতে হবে আবার।

শুধু বাস তুলে দিয়ে আসা তো নয়, কাশী থেকে আবার কলকাতায় চাকরি করতে আসা মানে একটা পর্বে দাঁড়ি টেনে জীবনটাই যেন অন্য ছাঁচে ঢালতে যাওয়া। সে পালা বদলটা আমার স্বভাবে কতটা সইবে আর কেমন লাগবে তারই অনিশ্চয়তায় মনটায় একটু অস্বস্তি জেগেছিল।

এ সব অস্বস্তি কাটিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্তটাই স্থির আর পাকা করে দিয়েছিল বিনয় সেন। এগিয়ে দেবার জন্যে সে সঙ্গে এসেছিল বিশ্বকোষ লেন থেকে হেঁটে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। সঙ্গে আসতে আসতে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল আমার পক্ষে এ রকম একটা চাকরি কত দিক দিয়ে কত সুবিধের।

যুক্তি যা দিয়েছিল তা অকাট্য। আমার যা দরকার এ চাকরি মানে তো সেই যতটুকু হোক কিছু সংস্থানের সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতা আর অগাধ অবসর। তার বাবাকে তো দেখলাম। তাঁর কাছে তাঁর সঙ্গে কাজ করাটায় চাকরির কোন রং যে নেই তা দু'দিন এলেই আমি বুঝতে পারব। এমন কাজের সুযোগ দৈবাৎ কখনো মেলে। এমনটা ছেড়ে দিতে সে আমায় দেবে না।

বিনয় সেনের ওকালতি শুনতে শুনতে একটা সন্দেহ মনের মধ্যে গভীর হয়ে উঠেছে। বিনয় সেন কি এ কাজটার কথা আগেই জানতে পেরেছিল? আর এ কাজটা আমায় পাওয়াবার উদ্দেশ্যেই কি সে বই ছাপতে চাওয়ার ছুতো করে আমায় কাশী থেকে আনিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়েছে?

বিনয় সেনকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন অবশ্য করিনি। তবে কাজটা নিতে রাজী হওয়ার পর আমার বই প্রকাশ করবার প্রসঙ্গটা সে যে আর একেবারেই তোলেনি তা লক্ষ্য করেছি ভাল করেই।

চাকরিটা নেব বলেই তো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সত্যি সত্যিই ছাপ্পর ফুঁড়ে যাকে বলে সেইভাবে তা পাওয়ার ব্যাপারে আরও একটা মজার কথা বলার মত।

বিনয় সেনের পরামর্শে আমার চাকরি নিতে রাজী হওয়ার কথাটা নিজের মুখে জানাবার জন্যে তার পরদিন তার বাবার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম

সকালবেলায়। ভেতরের চাতালের ওপর সেই বই-কাগজের রাশ ছড়ানো আর তার মাঝে আগের দিনের মতই তন্ময় হয়ে কাজ করছেন দীনেশ সেন।

আমার সিদ্ধান্ত শুনে খুশি হয়ে বলেছিলেন একটা দরখাস্ত তাঁকে লিখে দিতে।

দরখাস্ত শুনেই আমি তো ফাঁপরে। দরখাস্ত-টরখাস্ত তো এ পর্যন্ত কখনো লিখিনি। লেখার দরকারই হয়নি অবশ্য। আমার মুখ দেখে অবস্থাটা বুঝে দীনেশ সেন তখুনি দরখাস্ত লেখা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, শুধু বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একবার একটু দেখা করে আসতে।

সেটাও খুব সহজ কাজ মনে হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ মানে স্বনামধন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তখন সেই উনিশশো পঁচিশ ছাব্বিশে তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতির সূচনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙলার বাঘ আশুতোষের যোগ্য পুত্র হিসেবেই শিক্ষা ও রাজনীতির জগতে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর কিছু নয়, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করাটা তো আর এড়িয়ে যেতে পারি না। কিন্তু দেখা করব কোথায়? তাঁর ছোট ভাই উমাপ্রসাদ পরে আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন হলেও তখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মুখের আলাপের বেশী কিছু ছিল না। তার কারণ প্রায় আমারই বয়সী হিসেবে সম্ভবত একই বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেও আমরা এক স্কুলে পড়িনি। আমি পাশ করেছি সাউথ সাবার্বান থেকে আর উমাপ্রসাদের স্কুল ছিল মিত্র ইনস্টিটিউশন। বাড়িতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে তাই বেশ একটু দ্বিধা বোধ করেছি সেটা আসলে বাঙলার বাঘেরই আস্তানা বলে হয়তো।

বিনয় সেনই তখন পরামর্শ দিয়েছে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখা করবার। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী খুব একটা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ঘুরে আসবার জায়গা নয়। তবু আর কোন উপায় যখন নেই, পরের দিন বেপরোয়া হয়ে সেই বার লাইব্রেরীই খুঁজে নিয়ে যতদূর মনে পড়ছে ওখানকার ধড়াচূড়া পরা একজন অ্যাডভোকেটের কাছেই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে পারব জিজ্ঞেস করেছিলাম।

শ্যামাপ্রসাদ বললে তখন একজনকেই শুধু বোঝায়। আমায় আর কোন বিস্তারিত পরিচয় তাই দিতে হয়নি।

আমার ভাগ্যও সেদিন ভাল। যাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে কে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন।

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শেষ হবার জন্যে

অপেক্ষা করেছি। মনের মধ্যে তখন সপ্রশংস একটা বিস্ময়ই জাগছে শ্যামাপ্রসাদকে দেখে।

কতই বা তখন তাঁর বয়স। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার হিসেব থেকে জানতাম আমাদের চেয়ে খুব বড় তিনি নন। কিন্তু ওই বয়সেই কি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর চেহারা চরিত্র আর চালচলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কথা বলতে বলতে আমায় লক্ষ্য করে শ্যামাপ্রসাদ একটু থেমে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু ভাবে একবার চেয়েছেন। সুযোগ পেয়ে নিজের নামটা জানিয়ে বলেছি, দীনেশবাবু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলেছেন, তাই···

আমার অসমাপ্ত কথাটার ওপরই শ্যামাপ্রসাদ প্রসন্ন গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছেন, ও বুঝেছি, আচ্ছা ঠিক আছে।

ব্যস্। আর সেখানে দাঁড়াতে হয়নি আমাকে। করতেও হয়নি আর কিছু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ আমি পেয়ে গেছি পরের দিন থেকেই।

ক'দিনের জন্যে কাশীতে গিয়ে সেখানকার পাট তুলে দিয়ে আসতে হয়েছে শুধু। তারপর আর এক নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা। নামে চাকরি, কিন্তু আসলে সাহিত্যের এক অজানা নতুন জগৎ আর জ্ঞান বিদ্যা পাণ্ডিত্যের রাজ্যের এক তদ্গতপ্রাণ আত্মভোলা আশ্চর্য মানুষকে কাছে থেকে দিনের পর দিন দেখা আর জানার আনন্দ উত্তেজনা।

ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে ট্রামে কি তখন নতুন-চালু হওয়া বাসে বাগবাজারে সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেনে আসি। তারপর দশটা সাড়ে দশটার পরই ছুটি।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেক দিন আগেই লিখলেও দীনেশ সেন তখন সবে মৈমনসিং গীতিকার আশ্চয লোককাব্য সম্পদ আবিষ্কার করেছেন। মৈমনসিং গীতিকার বাঙলা প্রথম খণ্ড মাত্র তখন প্রকাশিত হয়েছে। কাজ চলছে দ্বিতীয় খণ্ডের উপাদান সংগ্রহ সম্পাদনা আর প্রথম খণ্ডের সঙ্গে তার ইংরেজী অনুবাদের।

এই কাজে দীনেশ সেনের সহকারিতা করাই আমার চাকরি। মাঝে মাঝে ফাঁক থাকলেও তাঁর কাছে এ কাজ অনেক বছর ধরেই করেছি। তার মধ্যে মৈমনসিং গীতিকার অন্যান্য খণ্ড বার হয়েছে, আবিষ্কৃত আর সংগৃহীত হয়ে বার হয়েছে চট্টগ্রামের কয়েকটি অপরূপ লোক-গাথা। দীনেশ সেন তারই মধ্যে তাঁর অসামান্য ইতিহাস-বীক্ষণ বৃহৎবঙ্গ রচনা করেছেন। বাঙলাদেশের লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প

উদ্ধারের ব্রতে নানা অঞ্চল থেকে পুরনো কাঁথার কাজ যেমন সংগ্রহ করেছেন, তেমনি এই শিলা-বিরল পলিমাটির দেশে পোড়ামাটির কাজের আশ্চর্য সব নমুনা সংগ্রহের জন্যে তাঁর একমাত্র বাহন একটি বেতো বুড়ো ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়িতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেহালা ছাড়িয়ে সরষে ইত্যাদি তখনকার দূর দূর সব গ্রামের প্রাচীন ধ্বংসপ্রায় মন্দির খুঁজে বার করে তার ভাঙা ইঁটের স্তূপ ঘেঁটে বেড়িয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে আমি পুরানো কালিঘাটের পট আর শিল্পীদের খুঁজে বার করবার সঙ্গীও হয়েছি তাঁর সেই অদ্বিতীয় ছ্যাকড়া গাড়িতে।

বিশ্বকোষ লেন ছেড়ে তখন তিনি বেহালায় তাঁর নিজের বাড়িতে উঠে এসেছেন। বাগবাজারের চেয়ে এখানে আমার বাড়ি থেকে যাওয়া অনেক সহজ। কাছেও বটে। কিন্তু তাতেও নিয়মিত ভাবে ঠিক সময়ে যেতে পেরেছি কি প্রতিদিন? স্বভাবের দোষে বেশীর ভাগ দিনই সময় মত গিয়ে পৌঁছইনি। কারণে অকারণে কামাই তো তার ওপর আছেই।

কি করেছেন তাতে দীনেশ সেন? কি বলেছেন? যা বলেছেন তা মনে করলে তাঁর কাছে পাওয়া আমার সে স্নেহের স্মৃতিতে চোখে এখনো জল আসে।

রাগ বিরক্তি নয়, একটু ব্যথিত স্বরে শুধু বলেছেন, আমার কাছেই আপনি এ রকম করছেন, আপনি অন্য কোথাও চাকরি করবেন কি করে?

এটা যে শুধু ক্ষোভের মৃদু প্রকাশ নয়, আমার জন্যে ভাবনা যে তাঁর সত্যিই ছিল তার প্রমাণেরও অভাব নেই। রামতনু লাহিড়ী রিসার্চের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমার মত অকর্মণ্যের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই তো তাঁর রাখবার কথা নয়। কিন্তু নিজে থেকেই তা রেখে আমায় অভিভূত বিহ্বল করে দিয়েছেন। সেই তাঁর মার্কামারা ছ্যাকড়া গাড়িটিতে করে বেহালা থেকে আমার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছেন আমার জন্যে বোম্বের একটা চাকরি যোগাড় করে দেবার চেষ্টায়।

সে চাকরি আমার হয়নি, কিন্তু তাঁর দিক দিয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

শুধু চাকরি তো নয়, নিজে উদ্যোগী হয়ে গিরিডিতে আমার বিয়ের সম্বন্ধর ব্যবস্থাও তিনিই করেছিলেন।

কেন এ সব করেছেন আমার মত নানা দিক দিয়েই অযোগ্যের জন্যে? করেছেন শুধু নিজের মস্ত বড় হৃদয়ের স্বাভাবিক গভীর স্নেহার্দ্রতায়, যার প্রকাশ থেকে আমার মত আরো অনেকেই বঞ্চিত হয়নি।

তাঁর কথা বলতে গিয়ে বিনয় সেনের কথাই বা না বলে থাকি কি করে?

অমন নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব পাবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়! বিনয় সেন সত্যিকার প্রথম সারির ইতিহাসবিদ্। নিজের বিষয় বাদে গল্প কবিতা গোছের কোন কিছুতে কলম চালাবার কণ্ডুয়ন তার এখনো নেই তখনও ছিল না। আমাকে নিজের স্বার্থে বাধিত করার কোন প্রশ্নই তার বেলা তাই ওঠে না।

তবু মাত্র কিছুদিন আগে কাশীর ঘাটের ওপর যে বন্ধুত্বের সূচনা, তারই অকৃত্রিম গভীরতায় সে আমার জন্যে তার বাবার কাছে চাকরি পাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে শুধু আমার যতটুকু হোক সচ্ছলতায় আমার সাহিত্যের পথ কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে। শুধু কি তার বাবার কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ব্যবস্থা করে সে থেমে থেকেছে, সাংবাদিকতার জগতেও আমার প্রথম প্রবেশের মূলে সে-ই ছিল।

ভারতের প্রথম বোমার মামলায় দণ্ডিত নির্বাসিত বন্দীরা তখন মুক্তি পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরেছেন। বিনয় সেনের উৎসাহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। সঙ্গী অবশ্য আমি।

বারীন ঘোষের সঙ্গে তখন দেখা হয়েছে, তারপর আমায় নিয়ে গেছে উপেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করাতে তাঁর তখনকার টালার বাড়িতে।

দীনেশ সেনের যেমন সকলকে আপনি সম্বোধন, উপেনদার তেমনি সকলকে প্রথম দেখাতেই 'তুই'। পাঁচ দশ মিনিট এটা সেটা নিয়ে কথার পর উপেনদা বলেছেন, এই প্রেমেন! খবরের কাগজে চাকরি করবি?

খবরের কাগজে! আমি অবাক্ হওয়ার সঙ্গে কৌতুকও অনুভব করে বলেছি, খবরের কাগজে কাজ করব কি? আমি পলিটিক্সের কিছু জানি না।

তাহলে তুই বেস্ট ম্যান! বলে উপেনদা পরের দিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের একুশ না বাইশ নম্বরে যেতে বলেছেন। মনে মনে যতই দ্বিধা থাক বিনয় সেনের পেড়াপিড়িতে না গিয়ে পারিনি।

তখনকার প্রথম জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'বাংলার কথায়' সহকারী সম্পাদকের পদ পেয়েছি সেই দিনই।

স্মৃতির একটা পাতা এখানেই উল্টে গেছে। জীবন যেন এতকালের চেনা-অচেনা জগতের সিংহদ্বার এক ধাপে গেছে পেরিয়ে।

শেষ